জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

নিরীক্ষা

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী

২১৭ তম সংখ্যা

ই-লার্নিং ও সাংবাদিকতা শিক্ষা

মুক্তিযুদ্ধে দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রের ভূমিকা

নিরীক্ষা

২১৭তম সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

নতুন নতুন প্রযুক্তি মানুষের নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। মানুষের জ্ঞান কিংবা শিক্ষা দুটোর ক্ষেত্রেই নতুন প্রযুক্তি আজ বহুমাত্রিক সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এমনই একটি সম্ভাবনা ই-লার্নিং। অনলাইনে শিক্ষাদান পদ্ধতি বাইরের দেশে শুরু হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা হাঁটিহাঁটি পা পা করে এগোচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের আওতায় পিআইবি অনলাইনে সাংবাদিকতা শিক্ষার একটি কোর্স চালু করেছে যা অল্প সময়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এ সংখ্যায় ই-লার্নিং বিষয়ে যাবতীয় তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন রয়েছে। ভাষাআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়েও লেখা রয়েছে। এছাড়া সাইবারস্পেস ও জার্নালিজম এবং আত্মহত্যা প্রতিবেদনের ওপরও লেখা রয়েছে। আশা করি, সংখ্যাটি সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, গবেষকসহ নিরীক্ষা'র পাঠকদের কাজে আসবে।

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহযোগী সম্পাদক
বিধান চন্দ্র কর্মকার

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

প্রকাশকাল
মে ২০১৮

সূচিপত্র

ই-লার্নিং ও সাংবাদিকতা শিক্ষা ৫
নাসিমূল আহসান

বাংলাদেশে অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ ১০
মোহা. মাহামুদুল হক

সাইবারস্পেস ও সাংবাদিকতা ১৩
শুভ কর্মকার

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তিঃ পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকার ভূমিকা ১৬
অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান

সোহরাওয়ার্দী মুজিব সম্পর্ক কতিপয় খণ্ডচিত্র (১৯৩৮-১৯৪৯) ২১
প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

২৫ মার্চ গণহত্যা প্রতিবেদনের পেছনের গল্প ও সায়মন ড্রিং ২৫
মো. মিনহাজ উদ্দীন

মুক্তিযুদ্ধে দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রের ভূমিকা ২৮
বোরহান বিশ্বাস

মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পরবর্তী সময়ে গ্রন্থ সংকলনে বিভ্রান্তি ৩১
রীতা ভৌমিক

পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের ওপর চাপ ৩৭
সাইফুল সামিন

৪০ **স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সাংবাদিকতাঃ এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়**
শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

৪৩ **এক নিভৃতচারী অবাঙালি ভাষাসৈনিক জয়নুল আবেদীন**
শাহনাজ পলি

৪৫ **'মাহে-নও' পত্রিকায় নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা**
ড. শিল্পী ভদ্র দীপা

৫০ **প্রবীণ সাংবাদিকদের সামগ্রিক অবস্থাঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত**
ডা. মহসীন কবির

৫২ **মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মিত্ররা**
শামসুজ্জামান শামস

৫৫ **ভুয়া খবরের ঠিকুজি**
সাকী আহ্সান

৫৮ **আত্মহত্যার প্রতিবেদনে সামারিটানস গাইডলাইন**
জয়শ্রী জামান

৬০ **প্রসঙ্গ সংবাদমাধ্যমের মিশন ও ভিশন**
শেখর ত্রিপাঠি

৬২ **নারী সাংবাদিকতা ও প্রতিবন্ধকতা**
আফরোজা তালুকদার

৬৪ **গণমাধ্যম সংবাদ**

৭০ **পিআইবি সংবাদ**

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২১৭তম সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

সূচিপত্র

বিশ্বজুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে এই প্রযুক্তি। জ্ঞান বইয়ের পাতা থেকে এখন গুগল, ইউটিউবে। পকেটে রাখা স্মার্টফোনে পৃথিবীর বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম! হ্যাঁ, শিক্ষাকে প্রযুক্তির সঙ্গে ব্লেন্ড করে তা অনলাইনে সরবরাহের যে ধারণা একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে, সেটাকেই আমরা ই-লার্নিং বা ইন্টারনেট লার্নিং বলছি

দেখুন- পৃষ্ঠা ৫

সাইবারস্পেস হলো তথ্যসমুদ্র। এখানে প্রায় সব ধরনের তথ্যই পাওয়া যায় সহজে। ফলে সাংবাদিকের অন্যতম তথ্য-উৎস হতে পারে সাইবারস্পেস। ... এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এসডিজি ট্যাকার (http://www.sdg.gov.bd/) নামে একটি ওয়েবসাইট খুলেছে, যেখান থেকে তিনি সব ধরনের তথ্য পেতে পারেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ১৩

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি বহির্বিশ্বের সাংবাদিক বন্ধুরাও বাংলাদেশের ঘটে যাওয়া ও চলমান ঘটনাবলি বিশ্বকে জানাতে তৎপর ছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত তৈরিতে সহযোগিতা করেছিল

দেখুন- পৃষ্ঠা ২৮

জয়নুল আবেদীন আর সব উর্দুভাষী বিহারিদের মতো ছিলেন না। তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেননি। বরং ১৯৫২ সালে যেমন তারা বাংলা ভাষার জন্য গলা ফাটিয়েছেন, রাজপথ কাঁপিয়েছেন, তেমনি ১৯৭১ সালে নির্যাতিত বাঙালিদের পাশে দাঁড়িয়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ৪৩

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র প্রকাশনা

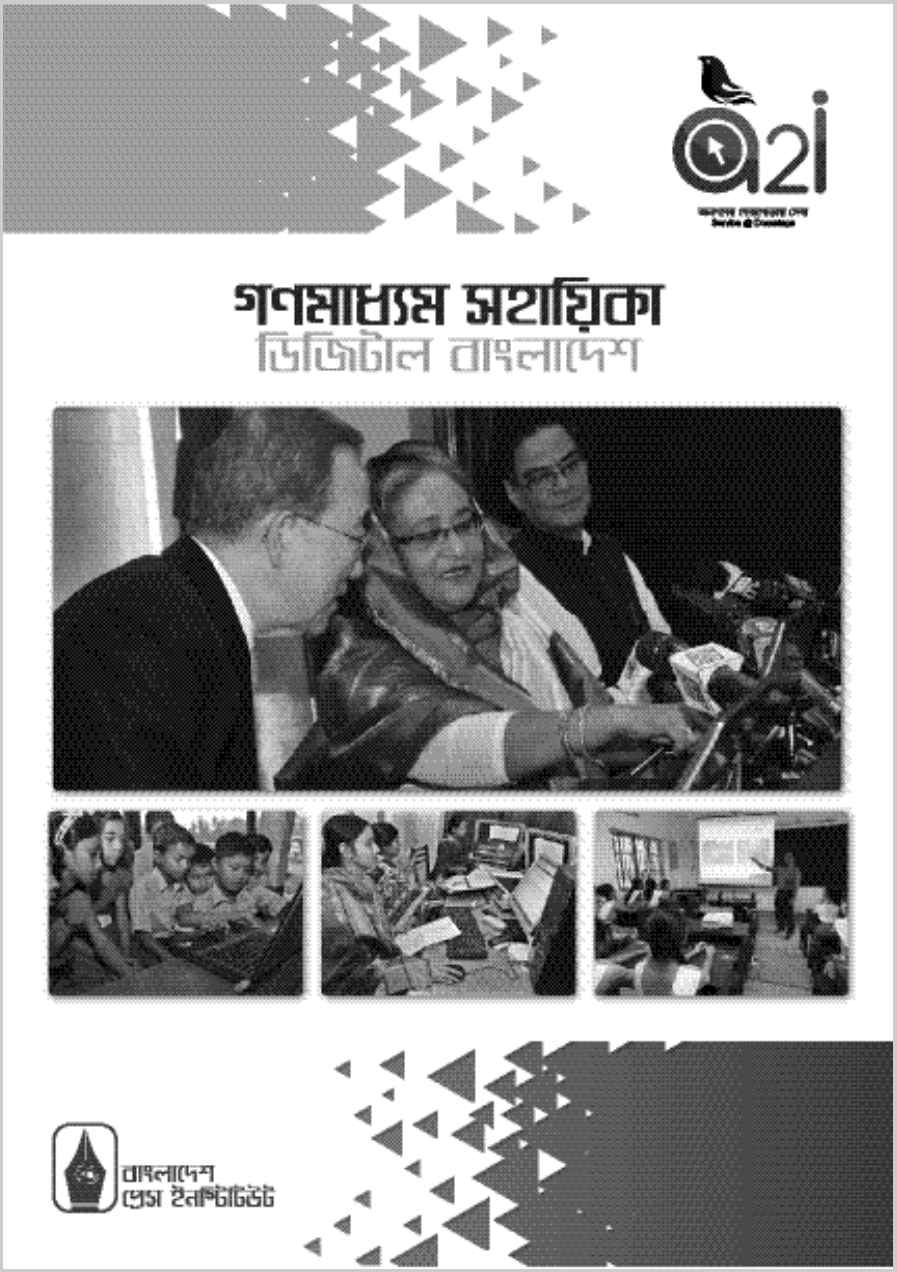

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

ই-লার্নিং ও সাংবাদিকতা শিক্ষা

নাসিমুল আহসান

ই-লার্নিং: কেন, কীভাবে

প্রযুক্তি বদলে দিচ্ছে পৃথিবী। যাপিত জীবনের নানা অভ্যাস, কাজকর্মে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের অভ্যস্ত যাপনকে বদলে দিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে এই প্রযুক্তি। জ্ঞান বইয়ের পাতা থেকে এখন গুগল, ইউটিউবে। পকেটে রাখা স্মার্টফোনে পৃথিবীর বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম! হ্যাঁ, শিক্ষাকে প্রযুক্তির সঙ্গে ব্লেন্ড করে তা অনলাইনে সরবরাহের যে ধারণা একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে, সেটাকেই আমরা ই-লার্নিং বা ইন্টারনেট লার্নিং বলছি। পকেটেই থাকছেন পৃথিবীর বিখ্যাত সব প্রশিক্ষক!

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস করা কিংবা কোনো বিষয়ের ওপর জ্ঞানার্জন করার পদ্ধতিই ই-লার্নিং নামে পরিচিত। বর্তমানে অনলাইনে ছোট ছোট কোর্স করে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির এ প্রচেষ্টা গ্লোবালি একটি জনপ্রিয় পন্থা হয়ে উঠছে

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস করা কিংবা কোনো বিষয়ের ওপর জ্ঞানার্জন করার পদ্ধতিই ই-লার্নিং নামে পরিচিত। বর্তমানে অনলাইনে ছোট ছোট কোর্স করে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির এ প্রচেষ্টা গ্লোবালি একটি জনপ্রিয় পন্থা হয়ে উঠছে। পাশাপাশি ইউরোপ-আমেরিকার তাবৎ বড়ো বড়ো করপোরেশন নিজেদের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-লার্নিং পদ্ধতির দিকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকছে। ই-লার্নিং বিষয়টিকে বোঝাতে গিয়ে 'ই-লার্নিং: কনসেপ্টস, অ্যাপ্লিকেশন, ট্রেন্ডস' শীর্ষক বইয়ে বলা হয়েছে: 'E-learning is a computer based educational tool or system that enables you to learn anywhere and at any time. Today e-learning is mostly delivered though the internet, although in the past it was delivered using a blend of computer-based methods like CD-ROM.' ইউরোপিয়ান কমিশন ২০০১ সালে ই-লার্নিংকে সঙ্গায়িত করে এভাবে: E-Learning as the use of new multimedia technologies and the Internet to increase learning quality by easing access to facilities and services as well as distant exchanges and collaboration.

ই-লার্নিং মূলত শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক *(Learner driven-Learner Centric Learning)*, অন্যদিকে প্রচলিত ক্লাসরুমভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি পুরোটাই শিক্ষককেন্দ্রিক (*Teacher Centric Learning*)। প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোয় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও বাছাই করার সুযোগ কম থাকে; কিন্তু ই-লার্নিংয়ে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে শিখবে বা শিখবে না, কোন জায়গা থেকে কোন পদ্ধতিতে শিখবে, সে বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে। অনেকেই ই-লার্নিংকে নানা ভাগে ভাগ করে থাকেন। মূলত শিক্ষাটি কীভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং গ্রহীতা কীভাবে, কী উপায়ে শিক্ষা উপকরণ গ্রহণ করছেন, সেসবের ভিত্তিতেই এই শ্রেণিবিভাগ। মধ্যপ্রাচ্যের ই-লার্নিং গবেষক আবদুল্লাহ ফাতেহ আলঘাতনি ই-লার্নিংকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো কম্পিউটারভিত্তিক ই-লার্নিং ও অপরটি ইন্টারনেটভিত্তিক ই-লার্নিং।

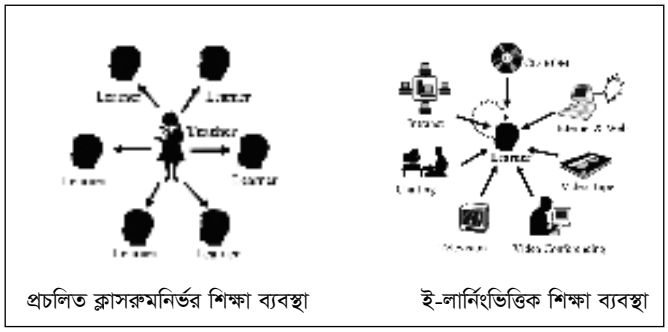

প্রচলিত ক্লাসরুমনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ই-লার্নিংভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা

কম্পিউটারভিত্তিক ই-লার্নিং সাধারণত তুলনামূলক পুরোনো অ্যাপ্রোচ, যেখানে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাসরুমের বাইরে সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একজন শিক্ষার্থী কম্পিউটারচালিত নির্দেশনা কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অপরদিকে ই-লার্নিং গবেষক আলমোসার মতে (২০০১), ইন্টারনেটভিত্তিক লার্নিং হলো কম্পিউটারভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার উন্নত সংস্করণ, যেখানে ই-লার্নিং প্রোগ্রামের কনটেন্ট সর্বদা অনলাইনে পাওয়া যায় এবং যে কোনো শিক্ষার্থী যে কোনো সময় সেই কনটেন্টগুলো পাঠ করে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারে। ই-লার্নিং তাত্ত্বিকরা আবার সম্পূর্ণ ইন্টারনেটভিত্তিক এই ই-লার্নিং পদ্ধতিকে synchronous এবং asynchronous এ দুই ভাগে ভাগ করেন। ই-লার্নিংয়ের ধরন, অনলাইনে শিক্ষা সরবরাহের পদ্ধতি বিবেচনায় আবদুল্লাহ ফাতেহ আলঘাতনি ২০১১ সালে তার প্রকাশিত একটি থিসিসে ই-লার্নিং মডেল উপস্থাপন করেন, যেটা নিম্নরূপ:

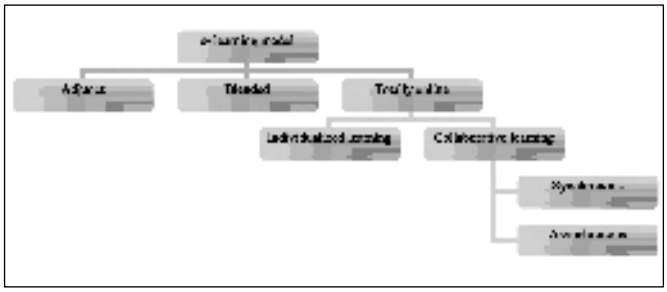

ই-লার্নিং মডেল, আলঘাতনি (২০১১)

ই-লার্নিং নানা কারণেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রধানতম কারণটি হলো এটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উভয়ের সময়, খরচ ও পরিশ্রম কমিয়ে দেয়। এছাড়া এটি স্বশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রান্তিক পর্যায়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের চাহিদা মেটাতে পারে। ই-লার্নিং পদ্ধতিতে ঘরে বসে সুবিধাজনক সময়ে পছন্দমতো বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলার সুযোগ আছে। এছাড়া এখানে ধরাবাঁধা ক্লাসের ব্যাপার না থাকায় সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজটি চালিয়ে নিতে পারেন একজন শিক্ষার্থী। ই-লার্নিং ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে, যদিও আমাদের দেশে এখন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিই চলে আসছে।

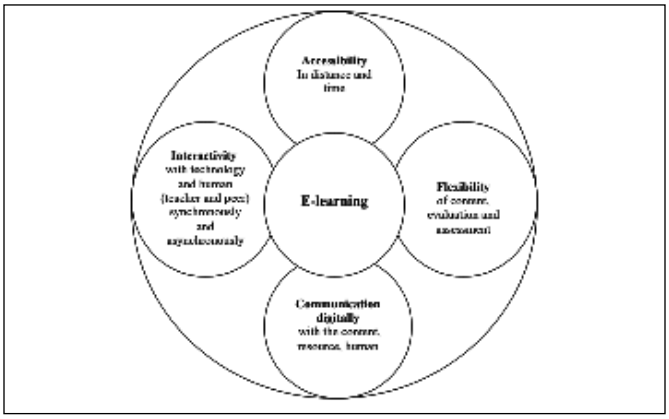

ই-লার্নিংয়ের বৈশিষ্ট্য, আলঘাতনি (২০১১)

ইতিহাসের আয়নায় ই-লার্নিং

ই-লার্নিং শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৯৯ সালে। ই-লার্নিং শব্দবন্ধের সঙ্গে যুক্ত 'অনলাইন লার্নিং' কিংবা 'ভার্চুয়াল লার্নিং' শব্দদ্বয়ও সমসাময়িক সময়ে ব্যবহার হওয়া শুরু করে। তবে দূরশিক্ষণের যে ধারণা, তা কিন্তু ইন্টারনেট প্রযুক্তি আসার আগেই শুরু হয়েছে। ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ নাগরিক স্যার আইজ্যাক পিটম্যান প্রথম তার শিক্ষার্থীদের জন্য দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেন। তিনি সে সময় শিক্ষার্থীদের শর্টহ্যান্ড রাইটিং শেখানোর জন্য পোস্টকার্ডে শর্টহ্যান্ড লিখে পাঠিয়ে দিতেন এবং শিক্ষার্থীরা শর্টহ্যান্ডগুলোকে বুঝে নিয়ে সেগুলোর অর্থ উদ্ধার করে ফিরতি খামে লিখে পাঠাতেন। এরপর ১৯২৪ সালে প্রথম 'টেস্টিং মেশিন' আবিষ্কৃত হয়, যেটা দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারতেন। এরপর ১৯৫৪ সালে হার্ভার্ডের অধ্যাপক বিএফ স্কিনার 'টিচিং মেশিন' আবিষ্কার করেন, যেটার মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশিকা আগেই তৈরি করে রাখতেন, যা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতেন। ১৯৬০ সালে পৃথিবীতে প্রথম কম্পিউটারভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যাত্রা শুরু করে। স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা সরবরাহের এ পদ্ধতিকে তখন বলা হতো প্লাটো-প্রোগ্রামড লজিক, যা প্রথমে আমেরিকার ইলিনিয়স বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হলেও পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় চালু হয়। ১৯৭০ সালের দিকে এসে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম আরও মিথস্ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সে সময় ব্রিটেনের ওপেন ইউনিভার্সিটি ইন্টারনেট ব্যবহার করে মেইলের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষা সরবরাহের সুযোগটির সর্বাধিক ব্যবহার করে। এরপর ১৯৮৪ সালে অ্যাপেলের ম্যাকোনটিশ আসার পর বদলে যায় সবকিছু। টেক্সটনির্ভর কম্পিউটার প্রযুক্তি বদলে অনেকটাই গ্রাফিকাল ও ইমেজনির্ভর হয়ে ওঠে। এর মাউসের ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ার ধরনকে আরও সক্রিয় করে তোলে। ১৯৯০ সালে আসে মাল্টিমিডিয়া পিসি, যেটিতে যুক্ত হয় সিডি রম। এ সময় মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এলে অনলাইনে শিক্ষা সরবরাহে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ভিডিও, অডিও, গ্রাফিক্স ও অ্যানিমেশন অনলাইন শিক্ষাকে আরও সহজ, আধুনিক, আনন্দদায়ক ও মিথস্ক্রিয়াশীল করে তোলে। এ সময় আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনলাইনে কোর্স চালু করে, ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে যারা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পান না, তাদের মধ্যে এ কোর্সগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে ডিসনিওয়ার্ল্ডে অনুষ্ঠিত টেকলার্ন কনফারেন্সে এলিয়ট ম্যাসাই 'ই-লার্নিং' শব্দের প্রথম ব্যবহার করেন। একুশ শতকের প্রথম দশকে আমরা টেক্সটনির্ভর ওয়েব ১.০ থেকে ওয়েব ২.০তে শিফট করি। এ পরিবর্তন ই-লার্নিংয়ের গুণগত পরিবর্তনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। একুশ শতকের একদম শুরুতে বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানকর্মীদের ইন্ডাস্ট্রি নলেজ বাড়ানো ও সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক হারে ই-লার্নিং পদ্ধতির দ্বারস্থ হতে শুরু করে।

বর্তমান বাস্তবতা

বাজার অর্থনীতির বাস্তবতায় ই-লার্নিং স্বকীয় ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। ২০১৫ সালে এটি ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের সমান এক বিশাল বাজার ছিল, ২০২৩ সালে ৫ ভাগ হারে বেড়ে সেটি ২৪০ বিলিয়ন ডলারের বাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে বিশ্বখ্যাত লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান

DOCEBO'র দাবি। এমনকি পাশের দেশ ভারতে ই-লার্নিং প্রায় ১.২৯ বিলিয়ন ডলারের মার্কেট, যা আমেরিকার পর পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার।

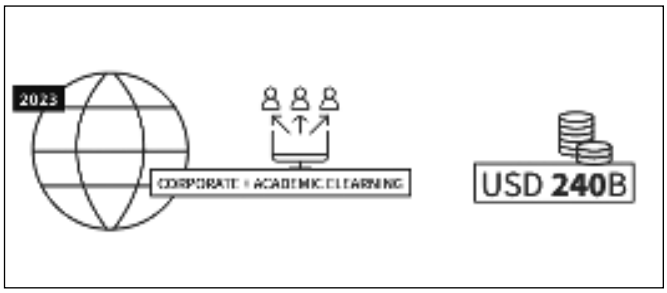

এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (LMS) বাজারও, যা এখন প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। মোবাইল প্রযুক্তি সহজলভ্য হওয়ায় ই-লার্নিং বা অনলাইনে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুঠোফোনের ব্যবহার দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে, যাকে এম লার্নিং বলে ডাকা হচ্ছে। হ্যাঁ, ওয়েবসাইট থেকে মোবাইল অ্যাপসে যাত্রা শুরু করেছে ই-লার্নিং ইন্ডাস্ট্রি। কেবল ইল্যাংন্ডে ই-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে ৭৪ ভাগ মানুষ মোবাইল বা স্মার্টফোন ব্যবহার করে। সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে করপোরেট প্রতিষ্ঠান, সবার মধ্যেই বেড়েছে ই-লার্নিংয়ের প্রতি ব্যাপক নির্ভরতা। আমরা যদি বিশ্বব্যাপী ই-লার্নিং ইন্ডাস্ট্রির ছবি আঁকতে চাই, তাহলে সেটা দেখতে মূলত নিচের ছবির মতো হবে।

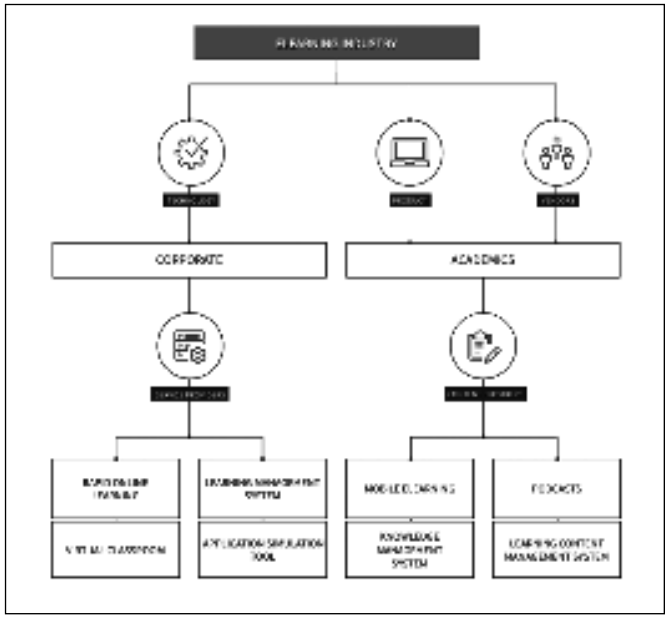

ই-লার্নিং ও বাংলাদেশ

জ্ঞান ভবিষ্যতের পুঁজি। উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ– সহজে, কম খরচে মানসম্মত জ্ঞান ও দক্ষতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ই-লার্নিং গোটা পৃথিবীতে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় ই-লার্নিং যেমন ভীষণ প্রাসঙ্গিক, তেমনি জরুরিও বটে। বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের সংখ্যা অনেকাংশে কম। আবার দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের অনেক মানুষ নানা কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন দেশ হিসেবে যে অভিযাত্রায় এগিয়ে চলছে, সেই বাস্তবতায় দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ই-লার্নিং জরুরি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এরই মধ্যে বাংলাদেশে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় ই-লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে নানা কোর্স চালু করেছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাস লেকচারের পাশাপাশি অনলাইনে শিক্ষা প্রদানের আয়োজন করেছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময় কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন রেপটোডটকম কিংবা স্টাডিডটস্কুল সাধারণের জন্য বিভিন্ন ছোট ছোট দরকারি বিষয়ে ই-লার্নিং কোর্সের ব্যবস্থা করেছে। ইদানীং বাংলাদেশে ওয়েব বেইসড লার্নিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন তরুণ ফ্রিল্যান্সিং, ইউটিউবিং, অনলাইনে আয়, উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ সংক্রান্ত নানা ভিডিও ও টেক্সট কনটেন্ট ইউটিউব, ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্লাটফর্মে শেয়ার করছে। বিষয়টি পুরো ই-লার্নিং প্রক্রিয়া না হলেও আগ্রহীরা শিখতে পারছে। এবং এই প্রচেষ্টা দেশের সম্ভবনাময় ই-লার্নিং খাতের দিকে ইশারা করছে। ২০১৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মুক্তপাঠ' নামের প্রথম জাতীয় ই-লার্নিং প্লাটফর্ম উদ্বোধন করে বাংলাদেশে ই-লার্নিং শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী এক যাত্রা শুরু করেন। আর মাত্র দুই বছরের এ মুক্তপাঠের হাত ধরে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই) টানা পঞ্চমবার তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার-২০১৮' অর্জন করে। মুক্তপাঠে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, যুবসমাজ, কর্মজীবী ব্যক্তি, বিদেশগামী কর্মী, প্রবাসী কর্মী কিংবা গৃহিণী– সবার জন্যই মুক্তপাঠ বিশেষায়িত অনলাইন কোর্স। শিক্ষকদের জন্য যেমন রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সংশ্লিষ্ট কোর্স, তেমনি বিদেশগামীদের ভাষাসহ নানা বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে ভিন্ন ভিন্ন কোর্স। কৃষকের জন্যও রয়েছে চমৎকার কোর্স। সাধারণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা– তিন বিভাগেই কোর্স রয়েছে পোর্টালটিতে। বর্তমানে 'মুক্তপাঠ'-এ রয়েছে ১৯টি ই-লার্নিং কোর্স, যেখানে রয়েছে সহস্রাধিক কনটেন্ট। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ মুক্তপাঠের ই-লার্নিং কোর্সগুলোর মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ করে তুলছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) ও সরকারের এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে মুক্তপাঠের মাধ্যমে সাংবাদিকদের জন্য চারটি অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে, যা ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে দেশে সাংবাদিকতা শিক্ষাকে সহজলভ্য করে তুলেছে।

মুক্তপাঠ একই সঙ্গে দেশের ই-লার্নিং কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে যেমন ভূমিকা রাখছে, তেমনি বাংলাদেশের ই-লার্নিং সেক্টরের একটি সম্ভাবনাময় স্বপ্নের চারা হিসেবে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে। মুক্তপাঠসহ অন্যান্য চলমান সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে এবং সাধারণ মানুষের প্রাযুক্তিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি করে ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে তাদের চলমান তথ্যসমাজের যোগ্য বাসিন্দা করে তুলতে গোটা আইসিটি ইকোসিস্টেমের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। ই-লার্নিং যেহেতু একশভাগ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এর মাধ্যমে যদি আমারা দেশের প্রান্তিক মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে চাই, তাই প্রথমেই দেশের সামগ্রিক তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোর দিকে নজর দিতে হবে। ই-লার্নিংকে কার্যকর ও জনপ্রিয় করতে চাই দেশের সর্বত্র ভালো ব্যান্ডউইথ. সহজলভ্য ও কম মূল্যে ইন্টারনেট সেবা। এটুকু নিশ্চিত করতে না পারলে ই-লার্নিংয়ের সম্ভাবনা ও শক্তিকে আমরা কিছুতেই কাজে লাগাতে পারব না। এছাড়া ই-লার্নিং বিষয়টি গ্লোবালি শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন এক সংস্কৃতি ও চর্চার জায়গা হিসেবে হাজির হয়েছে। বাংলাদেশেও ই-লার্নিংকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে একে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির অংশ করে তুলতে হবে।

ই-লার্নিং ও সাংবাদিকতা শিক্ষা

বিশ্বজুড়ে ই-লার্নিং উদ্যোগ ও পরিসরগুলোয় স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, গবেষণা, ফ্রিল্যান্সিং, কলা, সাহিত্য, নানা বিষয়ে একাডেমিক ও প্রফেশনাল কোর্স চালু আছে। আর এই স্রোতে যুক্ত হয়েছে সাংবাদিকতা শিল্পও। বিভিন্ন সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিজেদের ওয়েবসাইটে, ব্লগে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে ওয়েবভিত্তিক লার্নিং প্রক্রিয়া চালু রেখেছে। এসবের পাশাপাশি কিছু গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিষয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট কোর্স আয়োজনের পাশাপাশি সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স এমনকি স্নাতকোত্তর কোর্সও চালু আছে। পাশাপাশি বড়ো বড়ো ই-লার্নিং প্লাটফর্ম যেমন 'কোর্সেরা' কিংবা 'ইউডেমি' অন্যান্য হাজার কোর্সের পাশাপাশি সাংবাদিকতাবিষয়ক কোর্সও নিয়মিত প্রকাশ করছে গণমাধ্যম শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের জন্য। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি) বিশ্বব্যাপী তাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রতিনিধিদের জন্য www.bbc.co.uk/learning শীর্ষক একটি ই-লার্নিং পরিসর তৈরি করেছে, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচিত প্রবন্ধ, ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে যেখানে বসে বিবিসির সংবাদকর্মীরা

নানাবিধ বিষয়ে নিজেদের জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করছেন। এছাড়া সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন: মিডিয়া হেল্পিং মিডিয়া (www.mediahelpingmedia.org), পয়েন্টার নিউজ ইউনিভার্সিটি (www.newsu.org), থমসন ফাউন্ডেশন (https://thomsonfoundation.edcastcloud.com) সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী, নবিশ সাংবাদিক ও যোগাযোগকর্মীদের জন্য ওয়েবভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছে। এমনকি পৃথিবীর এক নম্বর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাইট ফেসবুকও সাংবাদিকদের জন্য ই-লার্নিং কোর্সের (www.facebook.com/business/e/courses/journalists) কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের অনলাইন শিক্ষা পরিসরগুলোয় সাংবাদিকতার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ, টিপস, ভিডিও টিউটোরিয়াল সরবরাহ করে থাকে, যা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাংবাদিকদের খুব সহজে, স্বল্পতম সময়ে নিজের ঘরে/অফিসে বসে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানার, শেখার সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়া কোর্সেরা থেকে শুরু করে পৃথিবীর বড়ো বড়ো ই-লার্নিং প্লাটফর্মে সাংবাদিকতা ও যোগাযোগ সম্পর্কিত অনেক কোর্স আছে, যেগুলো কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন।

বাংলাদেশেও শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের নানা উদ্যোগ চোখে পড়ছে। স্কুলে স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, গবেষক বিনামূল্যে যে কেউ যে কোনো সময় অনলাইনে ই-বুক দেখতে পারছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে করেন দেশের অন্যতম বাংলাভাষায় নির্মিত উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্লাটফর্ম মুক্তপাঠ। যেখানে বর্তমানে এক লাখের অধিক শিক্ষার্থী ২১টির বেশি কোর্সে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) দেশ ও দেশের বাইরে কর্মরত সাংবাদিক, গণমাধ্যমকর্মী ও শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের এটুআই প্রোগ্রামের সঙ্গে যৌথভাবে বাংলা ভাষায় বিশ্বের প্রথম সাংবাদিকতাবিষয়ক ই-লার্নিং প্লাটফর্ম চালু করেছে। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ ই-লার্নিং প্লাটফর্মের মাধ্যমে সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে নিজেদের ঘরে বসেই বিনামূল্যে সাংবাদিকতা শিখতে পারছেন।

দেশের গণমাধ্যমকর্মীদের একটি বড়ো অংশের সাংবাদিকতা বিষয়ে কোনো একাডেমিক পড়াশোনা নেই। অনেক সাংবাদিকই নিজেদের দক্ষতা ও জানাশোনা বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। কিন্তু সাংবাদিকদের এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ চাহিদার তুলনায় খুবই কম। বিশেষ করে মফস্বলে যারা কাজ করেন, তাদের সেই সুযোগ আরও কম। এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে দেশের সংবাদকর্মীদের মানোন্নয়ন, সাংবাদিকতা শিল্পকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিকতা শেখার এই ই-লার্নিং প্লাটফর্ম অভাবনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া দেশের যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতাবিষয়ক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে, সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেকেরই সিলেবাস একুশ শতকের কনভারজেন্স জার্নালিজমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পোক্ত অবস্থানে দাঁড়ায়নি। একজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট হিসেবে তৈরি করে চলমান মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রস্তুত করতে আমাদের বিদ্যায়তনিক পরিসরে অনেক ফাঁপা জায়গা রয়ে গেছে। তাই একাডেমিক পরিমণ্ডলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত নতুন নতুন জ্ঞানের মুখোমুখি করে দেয়া কিংবা মফস্বল সাংবাদিকদের জ্ঞান, দক্ষতা ও স্বপ্নের বিস্তার ঘটাতে ই-লার্নিং কাজের দারুণ একটা উপায় হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ পিআইবির অনলাইন সাংবাদিকতাবিষয়ক কোর্সের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা যেতে পারে। ই-লার্নিং সংক্রান্ত আমাদের এ অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ই-লার্নিং বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে পারে। প্রথম পর্যায় বেসিক জার্নালিজম ও টেলিভিশন জার্নালিজম শীর্ষক চার মাস মেয়াদি কোর্স দুটিতে প্রায় ছয় হাজার আগ্রহী শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক কোর্সে অংশ নেওয়ার আবেদন করেন। বাছাইয়ের পর বর্তমানে দুটি কোর্সে ২ হাজার ৬৫১ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত পড়াশোনা করেন। কোর্সে বিভিন্ন পরীক্ষা, কুইজে অংশ নেন। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুসন্ধানী ও উন্নয়ন সাংবাদিকতাবিষয়ক কোর্সে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন এবং বেশির ভাগ শিক্ষার্থী বাছাইয়ের পর কোর্সে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এর আগে প্রচলিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পিআইবি সারাবছর যে সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে প্রশিক্ষণ সেবা পৌঁছাতে পারত, ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে মাত্র ছয় মাসে তার দ্বিগুণের বেশি সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীর কাছে প্রশিক্ষণ সেবা পৌঁছানো গেছে। এতে পিআইবি'র প্রশিক্ষণের সংখ্যা বেড়েছে, তিন দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের জায়গায় তিন মাসের আরো সুসংগঠিত কোর্স আয়োজন করা গেছে, তবে প্রতিষ্ঠানের খরচ কমে গিয়েছে কয়েকগুণ। ভিজিট কমে গেছে। সাংবাদিকদের যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকায় আসতে হচ্ছে না, তেমনি পিআইবি'র কর্মকর্তাদেরও ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে যেতে হচ্ছে না। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এ কোর্স

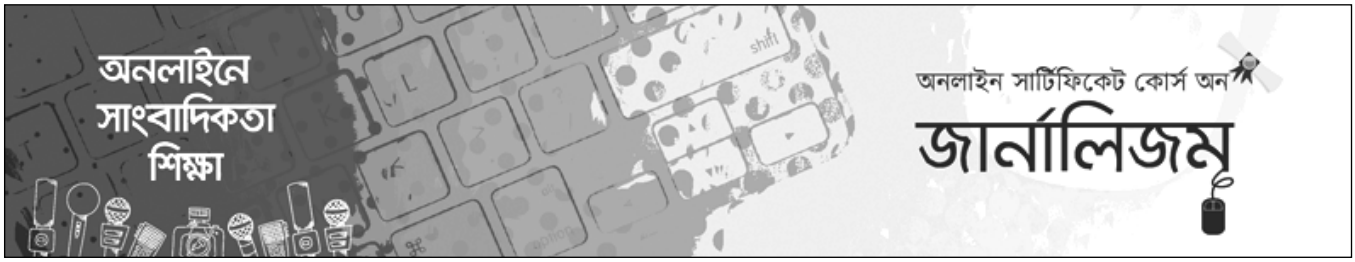

প্রাথমিকভাবে চারটি কোর্স নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে সাংবাদিকতাবিষয়ক দেশের একমাত্র ই-লার্নিং প্লাটফর্মটি। সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি কোর্স, টেলিভিশন সাংবাদিকতা কোর্স, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং উন্নয়ন সাংবাদিকতা কোর্স শীর্ষক এ চারটি কোর্সে আগ্রহীরা বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে কোর্সে অংশ নিতে পারছেন।

২০১৬ সালে সংসদে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু জানান, বর্তমানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ২ হাজার ৮৩৪টি। এছাড়া তথ্য অধিদপ্তরে ১,৭১৭টি অনলাইন পত্রিকা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে। নিবন্ধনের বাইরে অনিয়মিত প্রকাশনা, ব্লগ, ওয়েবসাইটের সংখ্যা তো অজস্র। প্রথম আলোর তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে চ্যানেলের সংখ্যা ৪১টি। এত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে বিরল। কিন্তু এসব গণমাধ্যমের টেকসই বিকাশ কি আদৌ নিশ্চিত? সব গণমাধ্যম কি যোগ্য ও দক্ষ সংবাদকর্মী দিয়ে তাদের কাজ পরিচালনা করতে পারছে?

দুটিতে প্রান্তিক পর্যায়ের অসংখ্য সংবাদকর্মী অংশ নিয়েছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা করলেও কোনো ধরনের প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাননি। এছাড়া কোর্সে একাধিক প্রবাসী শিক্ষার্থী আছেন, যারা দেশের বাইরে বিভিন্ন চ্যানেল ও পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। কোর্সে সব কনটেন্ট যেমন: সাংবাদিকতার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রবন্ধ, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও ভিডিও লেকচার সাংবাদিকরা ডাউনলোড করেও রাখতে পারছেন, যা আমাদের টেকসই শিক্ষার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা ভাষায় ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকতা শেখার পিআইবি'র নতুন এ আয়োজনে যত বেশি সংবাদকর্মীকে এর আওতায় আনা যাবে, ততই দেশের সাংবাদিকতা শিল্পে দক্ষ ও জানাশোনা মানুষের সংখ্যা বাড়বে। সামগ্রিক সাংবাদিকতা চর্চার জায়গায় আরো পরিবর্তন আসবে। এছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পিআইবি'র এই ই-লার্নিং প্রশিক্ষণের সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে।

কেবল সাংবাদিকতা শিক্ষাই নয়, দেশের যে বিশাল সংখ্যক তরুণ প্রজন্ম আছে, তাদের কর্মদক্ষতা, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ই-লার্নিং অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে পৌঁছতে হলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। আর এর জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ই-লার্নিংয়ের শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। যারা বর্তমানে দেশে ই-লার্নিং নিয়ে কাজ করছেন, তাদের সহযোগিতা দিয়ে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সম্ভব হলে ই-লার্নিংকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতিমালা করে বিভিন্ন স্তরের ও পেশার মানুষকে যুক্ত করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করতে হবে। একসময় বলা হতো, নলেজ ইজ পাওয়ার। কিন্তু এখন অনেকেই বলেন, টেকনোলজি ইজ পাওয়ার। হ্যাঁ, টেকনোলজির এই ক্ষমতাকে অনুধাবন করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

তথ্যসূত্র

শাহাদাত হোসেন, ই-লার্নিং ও ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থা, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

আমিরুল আলম খান, ই-লার্নিং: আগামী দিনের শিক্ষা, দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ জুন ২০১৪।

বিশ্বমঞ্চে মুক্তপাঠ, দৈনিক সমকাল, ১০ এপ্রিল ২০১৮

বর্তমানে ২ হাজার ৮শ'র অধিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ অক্টোবর ২০১৬ ।

নিবন্ধন চায় ১৭১৭ অনলাইন পত্রিকা, বিডিনিউজ২৪.কম, ২৬ জুন ২০১৬

আরো ১০টি টিভি চ্যানেল আসছে, পাঁচটি অনিশ্চিত, দৈনিক প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি ২০১৫

ফেসবুকে সাংবাদিকতাবিষয়ক অনলাইন কোর্স, নাসিমূল আহসান, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, দেখুন www.nasimul.com.

ALGAHTANI, ABDULLAH, FALEH (2011) Evaluating the Effectiveness of the E-learning Experience in Some Universities in Saudi Arabia from Male Student's Perceptions, Durham theses, Durham University.

Almosa, A. (2002). Use of Computer in Education, (2nd ed), Riyadh: Future Education Library. Almosa, A. & Almubarak, A. (2005). E-learning Foundations and Applications, Saudi Arabia: Riyadh

European Commission (2001). The e-Learning Action Plan: Designing tomorrow's education. http://www.elearningeuropa.info.

Khan BH. (2001). A Framework for Web-based Learning. Educational Technology Publications: Engelwood Cliffs.

Klein, D. & Ware, M. (2003). E-learning: new opportunities in continuing professional development. Learned publishing, 16 (1) 34-46

Almosa, A. (2001) E-learning: Concept, Properties, Benefits and Obstacles, Future's School Conference. Saudi Arabia 22-24/10/2001, Riyadh: King Saud University.

E-LEARNING CONCEPTS, TRENDS, APPLICATIONS, Epignosis LLC, January 2014

Pathan, A-S. K. and Islam, H. K., A study on the key factors for effective E-learning, Asian Journal of Information Technology, Volume 4, Number 1, 2005, pp. 49-52

Pathan, A-S. K. and Hassan M. M., E-LEARNING: CAN IT HELP THE EDUCATION IN BANGLADESH?, Retrive form : http://irep.iium.edu.my/591/1/EBPAT.pdf

14 Must-Know E-Learning Stats, 3 September 2015, Last retirve from: https://kzoinnovations.com/e-learning-stats

Did you know? UK e-Learning statistics, April 16, 2015, Last retirve from: https://brayleinolearning.co.uk/blog/2015/april/16/did-you-know-uk-elearning-statistics/

Walsh, Christopher (2011). E-learning in Bangladesh: the 'trainer in your pocket. In: IADIS International Conference e-Learning 2011, a part of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2011, 20-23 July 2011, Rome, Italy.

লেখক: সহকারী প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

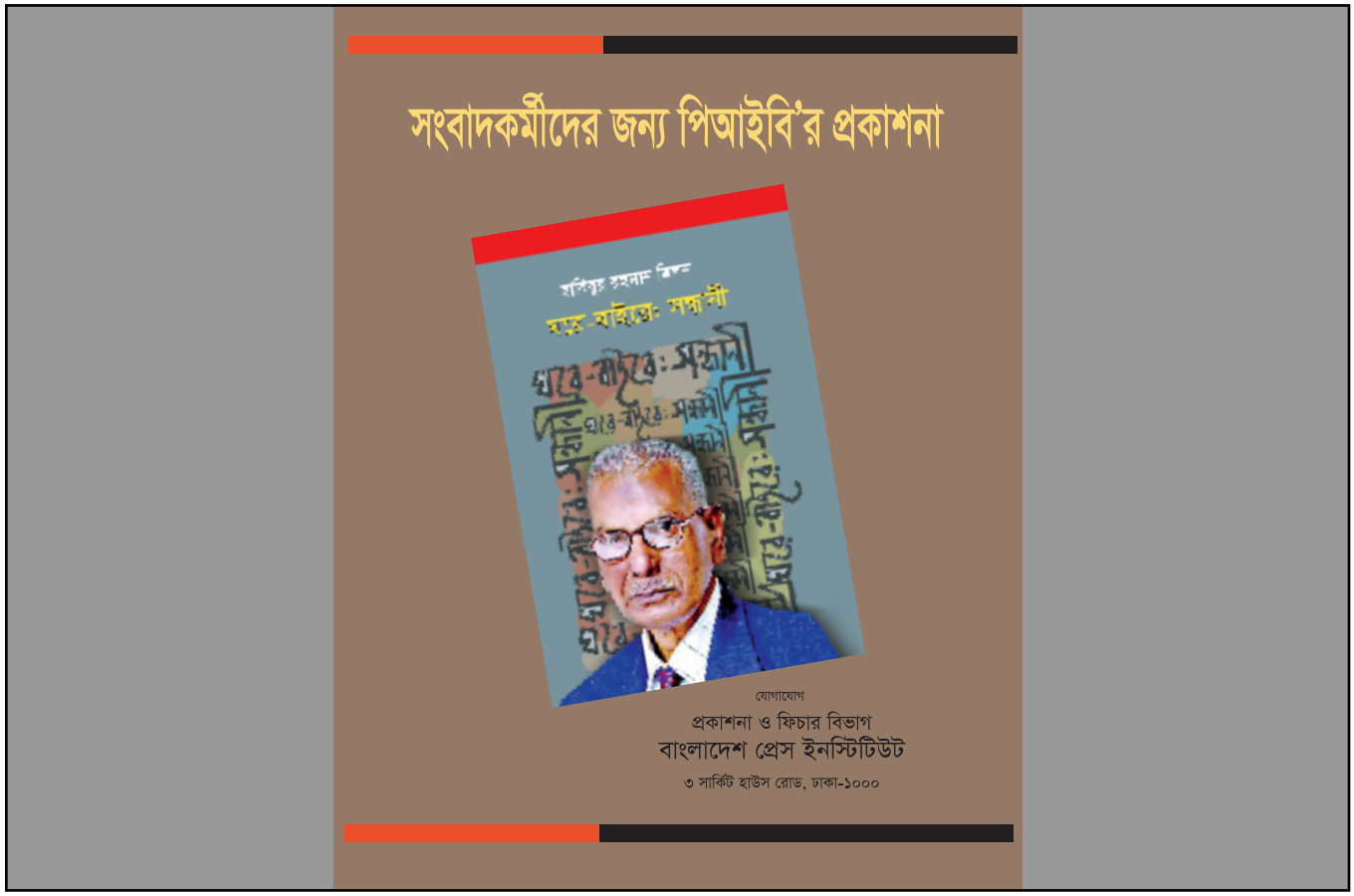

বাংলাদেশে অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

মোহা. মাহামুদুল হক

প্রশিক্ষণ কার্যকরী শিক্ষণ পদ্ধতি। অনলাইন প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দূরশিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত। অনলাইন প্রশিক্ষণ হচ্ছে শ্রেণিকক্ষের বাইরে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর দূরশিক্ষণ পদ্ধতি। অনলাইন প্রশিক্ষণ হচ্ছে– ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত নির্দেশনা বা শিক্ষণবার্তার আদান-প্রদান, যা সরাসরি রিয়েল টাইম (synchronous) অনুসারিত এবং যে কোনো সময় যে কোনো স্থান (asynchronous) থেকে ইমেইল বা অনলাইনে সংযুক্ত মিথস্ক্রিয়ামূলক পদ্ধতি। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হন। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে ইন্টারনেটের আবির্ভাব হলেও অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরু হয় অনেক পরে। আর অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ চালু হয় বেসরকারি পর্যায়ে সীমিত আকারে ২০০৬ সালে। সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) ২০১৭ সালের ২৯ আগস্ট এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সাংবাদিকতায় অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে। এ উদ্যোগ সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে। অন্যদিকে দেশে অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করবে। তাই অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক প্রেক্ষাপটসহ বাংলাদেশে এর সম্ভবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করা হয়েছে এ নিবন্ধে।

> *সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) ২০১৭ সালের ২৯ আগস্ট এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সাংবাদিকতায় অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে। এ উদ্যোগ সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে*

অনলাইন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

অনলাইন প্রশিক্ষণে দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। (ক) লাইভ চ্যাট, অডিও-ভিডিও কনফারেন্সিং, ডেটা ও অ্যাপ্লিকেশন আদান-প্রদান, ভার্চুয়াল হাত ওঠানো এবং প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীর অনলাইনে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন ও স্লাইড শো দেখার মাধ্যমে সরাসরি চলমান রিয়েল টাইম

পদ্ধতি (synchronous) এবং (খ) ইমেইল, অনলাইন ফোরাম/গ্রুপে আলোচনা বা অনলাইনে ফাইল সংযুক্তির মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে শিক্ষণ বার্তা পৌঁছানোর পদ্ধতি (asynchronous)। প্রথম পদ্ধতিতে (synchronous) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইনে উপস্থিত থাকতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (asynchronous) যে কোনো সময় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে শিক্ষণবার্তা ইমেইল করে বা অনলাইন গ্রুপে আলোচনা করে। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন অনলাইন কোর্স সফ্টওয়্যার পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষণবার্তা, আলোচনা ও ফাইল আদান-প্রদান করা যায়। অনলাইন প্রশিক্ষণের বেশকিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন–

* অনলাইন প্রশিক্ষণ এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে যে কোনো পর্যায়ের ও বয়সের প্রশিক্ষণার্থী ঘরে বসে অথবা কর্মস্থলে বসে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে থাকে। সময় ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন কোর্স করতে পারে।
* দ্বিমুখী তথ্য বিনিময় ও রিয়েল টাইম মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সংযোগ ঘটে।
* সনাতনী ব্যবস্থায় অন্তর্মুখী শিক্ষাদান ও জ্ঞানার্জনই মুখ্য। অনলাইন প্রশিক্ষণে তা অনুপস্থিত। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান ও জ্ঞানার্জনের বিষয়টিকে স্বশিক্ষণ পদ্ধতির উপযোগী করে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। স্বশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থী স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এবং ভার্চুয়াল বিশ্ব থেকে আরো জ্ঞানার্জনে পারঙ্গম হয়ে ওঠে।

> *অনলাইন প্রশিক্ষণ এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে যে কোনো পর্যায়ের ও বয়সের প্রশিক্ষণার্থী ঘরে বসে অথবা কর্মস্থলে বসে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে থাকে। সময় ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন কোর্স করতে পারে*

প্রশিক্ষণার্থীরা সহজেই বৈশ্বিক তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা সনাতনী বিদ্যা অর্জন প্রক্রিয়ার ওপর আর নির্ভর করে না।
* অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রশিক্ষণার্থীকে আরো বহুমুখী কর্মশক্তিসম্পন্ন করে তোলে। বিশেষ করে তারা প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ হয়ে ওঠে।
* দলভিত্তিক কাজ প্রশিক্ষণার্থীকে সক্রিয় করে তোলে। দলগত আলোচনা প্রশিক্ষণার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ভাষা ব্যবহারে দক্ষ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের ইতিহাস

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ যুগ যুগ ধরে বহমান। বিভিন্ন বিষয়ে দূরশিক্ষণও বহুকাল ধরে প্রচলিত। অনলাইনে শিক্ষণ বা প্রশিক্ষণও দূরশিক্ষণ পদ্ধতি। ইন্টারনেটের আবির্ভাবের পর যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তারাই প্রথমে অনলাইনে প্রশিক্ষণ/শিক্ষণ পদ্ধতি চালু করে। বিশেষ করে প্রযুক্তিতে অগ্রগামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। বাংলাদেশে অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের ইতিহাস নির্মাণ করতে গেলে অবশ্যই এ দেশের দূরশিক্ষণ চালুর ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে যারা নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে যেতে পারে না, তাদের জন্য ১৯৫৭ সালে শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন পরীক্ষামূলক দূরশিক্ষণ স্কুল (Correspondence School) স্থাপনের সুপারিশ করে। (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)। শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় এজন্য ২০০ রেডিও সেট বিতরণ করে। অডিও-ভিজুয়াল সেল স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সালে তা অডিও-ভিজুয়াল এডুকেশন সেন্টারে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৮ সালে পাইলট প্রকল্প হিসেবে বিদ্যালয় সম্প্রচার অনুষ্ঠান (School Broadcasting Pilot Project) চালু করা হয়। ১৯৮৩ সালে এ দুটি দূরশিক্ষণ শিক্ষা কেন্দ্রকে একীভূত করে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গঠন করা হয়। ১৯৮৫ সালে এ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটকে একীভূত করে স্থাপন করা হয় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন বা বাইড (BIDE)। অডিও-ভিডিও উপকরণ বিতরণ ছাড়াও বাইড দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বিএড কর্মসূচি চালু করে। আসলে বাইডের সফলতা দেখে সরকার দূরশিক্ষণভিত্তিক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে এগিয়ে আসে। ১৯৮৭ সালে যুক্তরাজ্যের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে প্রকল্প নেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাইডকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করা হয়। বাংলাদেশে দূরশিক্ষণের সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান বাউবি। বর্তমানে ৪৩টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক কর্মসূচির আওতায় তিনশ'রও বেশি কোর্স চালু করেছে বাউবি। সম্প্রতি বাউবি ই-লার্নিং সেন্টার ও ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপনের কাজ শুরু করেছে।

১৯৬২ সালে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার সূচনা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে। পরে এ বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ (১৯৯৩) বর্তমানে নয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এক ডজনেরও বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে। (হক, ২০১৬)। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন পিআইবি, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো) এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্স পড়াচ্ছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিলেবাস ও পঠনপাঠন পদ্ধতি প্রায় এক ও পুরোনো ধাঁচের। প্রতিবছর কয়েক শ' সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী বের হচ্ছেন; কিন্তু যথাযথ প্রায়োগিক শিক্ষা অর্জন না করায় তাঁরা সাংবাদিকতায় মাস্টার্স পাস করেও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার উপযোগী হচ্ছেন না। কেননা প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও সাংবাদিকতার প্রায়োগিক দিকগুলো প্রায়ই অনুপস্থিত বাংলাদেশের সাংবাদিকতা শিক্ষায়। এ দুর্বল দিকগুলো দূরীকরণে কার্যকরী শিক্ষণ নিশ্চিত করতে ২০০৬ সালে আমি 'মিডিয়া ফর মিডিয়া' নামে অনলাইন নিউজ পোর্টাল চালু করি। এর আগে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন (সিপিইউ) থেকে তিন মাসের 'বেসিক জার্নালিজম অ্যান্ড এথিকস' বিষয়ে অনলাইনে আমি একটি কোর্স করি। সিপিইউয়ের কোর্স আমাকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ চালু করতে উৎসাহিত করেছে। যদিও কোর্সটি তেমন মিথস্ক্রিয়ামূলক ছিল না। শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল শুধু ইমেইলনির্ভর। যা হোক, ওই সময় মিডিয়া ফর মিডিয়ার ওয়েবসাইটাই ছিল সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ স্কুল। মিডিয়া ফর মিডিয়ার কোনো অফিস ছিল না। অর্থাৎ ভার্চুয়াল অফিস। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোনো স্থান থেকে সংবাদ উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো। (হক, ২০১৬)। তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে সরাসরি রিপোর্টিং ও এডিটিং করতে পারে, তার সুযোগও রাখা হয়েছিল। সাংবাদিকতায় অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য মিডিয়া ফর মিডিয়াই বাংলাদেশে প্রথম স্কুল। অনিবার্যকারণবশত মিডিয়া ফর মিডিয়া ২০১০ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ২০১৪ সালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশনে (আইজেসি), তখন আবারো অনলাইনে

সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও অনলাইনের মাধ্যমে সাংবাদিকতায় তিন মাস মেয়াদি অনলাইন কোর্স অফার করা হয়। তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি বলে কোর্সটি আর চালু করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি নতুন এবং কোর্স ফি বেশি হওয়ায় এমনটি ঘটেছে। কোর্সটির ডিজাইন করা হয়েছিল মিথস্ক্রিয়ামূলক ও অনুশীলননির্ভর (৪০ শতাংশ তত্ত্ব ও ৬০ শতাংশ অনুশীলন)।

সরকারি প্রতিষ্ঠান পিআইবি ২০১৭ সালের ২৯ আগস্ট এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় সাংবাদিকতায় অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে। 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক চার মাস মেয়াদি চারটি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স হচ্ছে– সাংবাদিকতায় বেসিক কোর্স, টেলিভিশন সাংবাদিকতা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা। কোর্স ফি ছাড়া সাংবাদিকতায় অনলাইন প্রশিক্ষণের এটাই প্রথম সরকারি উদ্যোগ।

অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের চ্যালেঞ্জগুলো

অনলাইন প্রশিক্ষণ এমন একটি শিক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে দূরত্ব বিরাজ করে। এজন্য অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে–

* প্রশিক্ষককে অনলাইন পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিত হতে হয়। অনলাইন কোর্স শুরুর অনেক আগেই সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারসহ ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে জানাশোনা প্রয়োজন হয়। অনলাইন কোর্সের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং সিস্টেম ও আস্থাশীল টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা থাকতে হয়। উভয় প্রযুক্তির সঙ্গে প্রশিক্ষকের আগ্রহ ও সংযুক্তি থাকতে হয়। Feeberg (1998) বলেন, "...The best way to maintain the connection between online education and the values of traditional education is through ensuring that online learning is 'delivered' by teachers, fully qualified and interested in teaching online in a web-based environment." বাংলাদেশে অভিজ্ঞ সাংবাদিক বা সাংবাদিকতার অভিজ্ঞ শিক্ষক রয়েছেন; কিন্তু তাঁদের অনেকে প্রযুক্তির সব হাতিয়ার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানেন না। আবার প্রযুক্তিতে দক্ষ সাংবাদিক বা শিক্ষক রয়েছেন, যারা প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্য নন। তাই যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক বাছাই করা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ।
* অনলাইন মাধ্যমকে নিজস্ব সুবিধায় কাজে লাগাতে হয়। অনলাইন প্রশিক্ষণ মূলত লিখিত যোগাযোগ প্রক্রিয়া। লিখিত যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা ও সুবিধা দুই-ই রয়েছে। লিখিত যোগাযোগ সময় ক্ষেপণ করে। আবার অনেকে দ্রুত ও সঠিকভাবে লিখিত যোগাযোগ করতে পারে না। অন্যদিকে যারা শ্রেণিকক্ষে সরাসরি আলোচনায় অংশ নিতে লজ্জাবোধ করেন, তাঁরা অনলাইনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সুযোগ অনলাইন কোর্সে কাজে লাগানো অন্যতম চ্যালেঞ্জ।
* প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে অবারিত সংযুক্ত থাকতে হবে। তাদের সঙ্গে অনলাইন গ্রুপে বা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখতে হয়, প্রশিক্ষণার্থীর প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। যোগাযোগ রক্ষা করা সর্বক্ষেত্রে বড়ো চ্যালেঞ্জ। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টার বাইরে কোর্স সমন্বয়ক ও প্রশিক্ষকদের যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন।
* সাংবাদিকতা একটি প্রায়োগিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মূলত তাত্ত্বিক শিক্ষণকে বেশি গুরুত্ব দেয়, প্রায়োগিক শিক্ষা প্রায় অনুপস্থিত। সাংবাদিকতার সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো অনলাইন প্রশিক্ষণে শিক্ষা দেওয়া আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ।
* বাংলাদেশে ইন্টারনেট গতি এখনো উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নয়। দেশের সব ভৌগোলিক সীমানায় পর্যাপ্ত গতির ইন্টারনেট পাওয়া যায় না। (হক, ২০১৬)। লাইভ লেকচার, লাইভ আলোচনা বা অডিও-ভিডিও লেকচার দেখা বা শোনার জন্য গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সব প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নিশ্চিত করা সহজও নয়।

> *সরকারি প্রতিষ্ঠান পিআইবি ২০১৭ সালের ২৯ আগস্ট এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় সাংবাদিকতায় অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে। 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক চার মাস মেয়াদি চারটি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স*

বর্তমানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ২ হাজার ৮৩৪টি। এছাড়া ১,৭১৭টি অনলাইন সংবাদমাধ্যম নিবন্ধনের জন্য তথ্য অধিদপ্তরে আবেদন করেছে। (আহসান, ২০১৮)। দেশে ৪১টি টিভি চ্যানেল, ১২টি রেডিও চ্যানেল এবং ১৫টি কমিউনিটি রেডিও রয়েছে। রয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ সংস্থা। বেশকিছু অনলাইন রেডিও ও অনলাইন টিভি ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। ফলে দেশের সাংবাদিকতায় নতুন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। শুরু হয়েছে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা। এ টিকে থাকার জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। যে পরিমাণ সংবাদ প্রতিষ্ঠান এক দশকে সৃষ্টি হয়েছে, সে পরিমাণ সাংবাদিকতা শিক্ষায় শিক্ষিত জনসম্পদ দেশে তৈরি হয়নি। আর সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ চাহিদার তুলনায়ও অপ্রতুল। আবার শ্রেণিকক্ষে সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ সবার নেই। বিশেষ করে মফস্বল সাংবাদিকদের। আগে অনেকে অতিশয় মেধা ও ভাষা দক্ষতায় বলীয়ান হওয়ায় সহজাতভাবেই সাংবাদিক হয়ে উঠতেন। এখন সাংবাদিক হতে হলে নিজেকে তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ এ কমিউনিটিকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করতে সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই। সাংবাদিকসহ প্রায় ছয় হাজার আগ্রহী প্রার্থী পিআইবি'র অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। বাছাইয়ের পর দুটি কোর্সে ২ হাজার ৬৫১ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। (আহসান, ২০১৮)। অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণের এ আগ্রহই বলে দেয়, বাংলাদেশে অনলাইনে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের সম্ভাবনা অসীম। তবে এ অনলাইন প্রশিক্ষণ হতে হবে আরো মিথস্ক্রিয়ামূলক ও রিয়েল টাইম অনুসারিত। শুধু প্রশিক্ষণ উপকরণ ডাউনলোড এবং শিক্ষণবার্তার ফাইল সংযুক্তি ও বিতরণনির্ভর নয়।

তথ্যসূত্র

১. হক, মাহামুদুল (২০১৬), সাংবাদিকতা: অফলাইন অনলাইন, এপিপিএল, ঢাকা।
২. Feeberg, A (1998). "The Written World: On the Theory and Practice of Computer Conferencing". In Mason, R and Keya A (Eds), Mind weave: Communication, Computer and Distance Education. Oxford Press.
৩. আহসান, নাসিমূল (২০১৮), ই-লার্নিং ও সাংবাদিকতা শিক্ষা, (অনলাইন ব্লগ) https://nasimul.com (৮ এপ্রিল, ২০১৮)।
৪. বাংলাপিডিয়া (২০০৩), এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা।

লেখক: সিটি এডিটর, ডেইলি স্টার

সাইবারস্পেস ও সাংবাদিকতা

শুভ কর্মকার

সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যম প্রতিবেশ সাইবারস্পেস দ্বারা পরিপৃক্ত হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অসংখ্য কম্পিউটার সংযুক্ত হয়ে বৃহৎ বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। এই বিশ্ব সাইবারস্পেস নামে পরিচিত, এর কোনো সীমানা নেই। দ্রুত যোগাযোগ সাধন ও তথ্য আদান-প্রদানে সাইবারস্পেস অতুলনীয়। ভালোর পাশাপাশি মন্দের জায়গাটাও সাইবারস্পেসে কম নয়। যে কারণে সংবাদ-উৎস ও ক্ষেত্র হিসেবে সাইবারস্পেসের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। সাইবারস্পেস সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে সাংবাদিকতার ধরনেও এসেছে পরিবর্তন। সাম্প্রতিক সময়ে সাইবারস্পেসকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সংবাদ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাইবারস্পেসের গুরুত্ব বিবেচনা করে আলোচ্য প্রবন্ধে সাইবারস্পেসে সংবাদ-উৎস, নতুন নতুন সাংবাদিকতার ধরন এবং সাংবাদিকের করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

> *ওয়েবসাইটে তথ্য গ্রহণের আগে দেখতে হবে সর্বশেষ কবে ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য, তথ্যগুলোর আপডেট, তথ্য লেখার তারিখ, ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের তারিখ, সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ বা সম্পাদনা করার তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে*

সাইবারস্পেস

আশির দশকের দিকে সায়েন্স ফিকশনগুলো লেখার মধ্য দিয়ে সাইবারস্পেসের ধারণা উৎপত্তি লাভ করে। সাইবারস্পেস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন উইলিয়াম গিবসন। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত গিবসনের Neuromancer গ্রন্থে প্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সামরিক মতবাদ অনুযায়ী সাইবারস্পেস যুদ্ধের নতুন ডোমেইন, সামাজিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী এটি হলো তথ্যস্তর, যেখানে অর্থনৈতিক বাস্তুসংস্থান এবং শিল্প গড়ে উঠে।

গিবসনের ভাষ্য অনুযায়ী সাইবারস্পেস হলো: 'A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts… A graphic representation of data

abstracted from the banks of every computer in the human system.' অক্সফোর্ড ডিকশোনারি মতে, সাইবারস্পেস হলো: 'The notional environment in which communication over computer networks occurs.'

সাইবারস্পেসকে বলা যায় ইন্টারনেটনির্ভর 'সাংকেতিক স্পেস'। মূলত সাইবারস্পেস হলো কল্পিত জগৎ। এ স্পেসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সামাজিক বাস্তবতার বাইরে নতুন একধরনের বাস্তবতা তৈরি হয়। যে বাস্তবতাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাস্তবজগতে রাষ্ট্রের বাসিন্দাকে বলা হয় সিটিজেন আর সাইবারস্পেসের বাসিন্দাকে বলা হয় নেটিজেন। অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের দ্বৈত সত্তা তৈরি হয়। ইন্টারনেটভিত্তিক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের এই জগতে সৃষ্ট কল্পিত সোসাইটিকে বলা হয় নেটওয়ার্ক সোসাইটি। মূলত সাইবারস্পেস তৈরি হওয়ার মূল অন্তরায় বা শক্তি হলো: স্থান, দূরত্ব ও আকার। সাইবারস্পেস সাংকেতিক এবং আলংকারিক স্পেস, যা ইন্টারনেটের আওতার মধ্যে গড়ে ওঠে।

সাইবারস্পেস ও সাংবাদিকতা

সাইবারস্পেস ও সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– এক. সংবাদ উৎস হিসেবে সাইবারস্পেস, দুই. সাইবারস্পেসভিত্তিক সাংবাদিকতা, তিন. সাংবাদিকের সাইবার নিরাপত্তা।

এক. সংবাদ উৎস হিসেবে সাইবারস্পেস

সাইবারস্পেস হলো তথ্যসমুদ্র। এখানে প্রায় সব ধরনের তথ্যই পাওয়া যায় সহজে। ফলে সাংবাদিকের অন্যতম তথ্য-উৎস হতে পারে সাইবারস্পেস। যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তার যুগে সাংবাদিক বাইরে না গিয়েও ইন্টারনেট থেকে যে কোনো ধরনের তথ্য গ্রহণ করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একজন রিপোর্টার টেকসই উন্নয়নবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করবেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এসডিজি ট্যাকার (http://www.sdg.gov.bd/) নামে একটি ওয়েবসাইট খুলেছে, যেখান থেকে তিনি সব ধরনের তথ্য পেতে পারেন। আবার আন্তর্জাতিক টেকসই উন্নয়নবিষয়ক তথ্যের জন্য রিপোর্টার আইআইএসডি'র (International Institute for Sustainable Development) মেইলিং তালিকার (http://enb.iisd.org/email/) সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

এভাবে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেও রিপোর্টারকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এক. ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। দুই. সার্চিং পদ্ধতি সম্পর্কে জানা। (যেমন: নির্দিষ্ট ফাইল খুঁজতে বিষয়ের শেষে .pdf, .doc ইত্যাদি লেখা, কোনো দেশের বিষয়ে জানতে দেশের শর্টকোড ব্যবহার করা যেমন বাংলাদেশ হলে bd, ভারত in, অস্ট্রেলিয়া হলে aus ইত্যাদি লেখা)।

প্রশ্ন হলো, এসব তথ্যের ওপর কতটা বিশ্বাস করা যায়? সাইবারস্পেসে যে কেউই তথ্য দিতে পারে। ফলে যে কোনো বিষয়ে 'অযোগ্যের' দেয়া তথ্য বিশ্বাস করা মোটেও উচিত হবে না। সাইবারস্পেস হলো প্রোজিউমিং[১] এর সফল উদাহরণ। তাই সাইবারস্পেস থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় সাংবাদিককে অবশ্যই কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। হয়তো বিষয়গুলো তথ্যে বাছাইয়ের শতভাগ সফল উপায় হতে পারবে না, তবে সাংবাদিককে বিষয়গুলো সতর্ক করে তুলতে পারে। এ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা CARS থিওরি মেনে চলতে পারেন। CARS হলো: ওয়েবসাইটের Credibility, Accuracy, Reasonableness এবং Support। CARS থিওরি এবং তথ্য বাছাইয়ের অন্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো:

ক. কর্তৃত্ব : কর্তৃত্ব বলতে বোঝায় তথ্যসূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। ওয়েবসাইটটির ধরন এবং লেখকের তথ্য বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। লেখকের ক্ষেত্রে দেখতে হবে লেখকের যোগ্যতা, পদবি, যোগাযোগের ঠিকানা ইত্যাদি। এছাড়া ডোমেইন পরীক্ষার মাধ্যমেও ওয়েবসাইটের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করা যায়। যেমন: দেখা গেল কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের শেষে .কম (.com) রয়েছে। তাহলে এ ওয়েবসাইটটিকে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। কেননা শিক্ষাবিষয়ক ওয়েবসাইটের শেষে .এডু (.edu) থাকার কথা। ডোমেইনের ধরন দেখে আপনি ওয়েবসাইটের বিশ্বাসযোগ্যতা পেতে পারেন। ডোমেইনের কয়েকটি ধরন তুলে ধরা হলো: .edu : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, .gov : সরকারি প্রতিষ্ঠান, .org : অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান, .mil : মিলিটারি প্রতিষ্ঠান, .com : বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, .info : সাধারণ তথ্য সাইট, .net : নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার, .int : আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সুতরাং ডোমেইন থেকে নিশ্চিত হওয়া যাবে ওয়েবপেজটি ব্যক্তিগত নাকি প্রাতিষ্ঠানিক।

খ. সাম্প্রতিকতা: ওয়েবসাইটে তথ্য গ্রহণের আগে দেখতে হবে সর্বশেষ কবে ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য, তথ্যগুলোর আপডেট, তথ্য লেখার তারিখ, ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের তারিখ, সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ বা সম্পাদনা করার তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। যদি আপডেট করা না হয়, তাহলে ওয়েবসাইটটির তথ্য গ্রহণ করা খুব বেশি যৌক্তিক হবে না।

গ. নির্ভুলতা : নির্ভুলতা বলতে বোঝায় তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা। ওয়েবসাইটের গুণমান বিচার করতে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে। যেমন: ওয়েবসাইটের তথ্য কি নির্ভরযোগ্য? নির্ভুল? নথিভুক্ত? সঠিক? বিস্তীর্ণ? বোধগম্য?

ঘ. বস্তুনিষ্ঠতা: ওয়েবসাইটটি থেকে তথ্য গ্রহণের আগেই ওয়েবসাইটটির উদ্দেশ্য খেয়াল রাখবেন। তাছাড়া ওয়েবসাইটে পক্ষপাতমূলক তথ্য, কুসংস্কারপূর্ণ তথ্য রয়েছে কি না, সেটা বিচার করতে হবে। এক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে প্রদত্ত কোনো তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নজনের মতামত লক্ষ রাখতে হবে। ওয়েবসাইটটি থেকে তথ্য গ্রহণের আগে কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হবে– ওয়েবসাইটে পক্ষপাতের কি কোনো প্রমাণ আছে? এখানে কি শুধু একটি পক্ষ আছে? উদ্দেশ্যমূলকভাবে কি কোনো তথ্য গোপন করা হয়েছে? ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য কী? প্রভাবন, তথ্য প্রদান, ব্যাখ্যা করা, বিক্রয় করা, প্রচার করা অথবা উপহাস করার বিষয়ে তথ্য আছে? এ সম্পর্কে প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওয়েবসাইটিকে বিশ্বাস করা যায় কি যায় না।

ঙ. ব্যবহারযোগ্যতা: গ্রাহকের সহজে তথ্য গ্রহণ ও প্রবেশের সুযোগই ব্যবহারযোগ্যতা। কয়েকটি বিষয় অনুসরণ করলে ওয়েবসাইটটির ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়গুলো হলো: বন্ধুসুলভ অর্থাৎ ওয়েবসাইটে তথ্য সহজে খুঁজে পাওয়া যায় কি না, পড়া যায় কি না এবং ব্যবহার করা যায় কিনা। আবার আরেকটি বিষয় নিশ্চিত হতে হবে সেটি হলো, ওয়েবসাইটটির তথ্য-সংগঠন। এখানে সব তথ্য যৌক্তিক এবং স্বচ্ছভাবে সাজানো থাকবে, সূচিপত্র থাকবে, সুশৃঙ্খল ডিজাইন থাকবে, তথ্য ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হবে, ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লিংকের উপস্থিতি থাকবে।

চ. সঠিকতা: অন্যান্য ওয়েবসাইটের সঙ্গে তুলনা করতে হবে। তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ে ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য পরীক্ষা করতে হবে। এ সময় লক্ষ রাখতে হবে এটি কি প্রাতিষ্ঠানিক, অ্যাডভোকেসি, ব্যবসায়িক, তথ্যসমৃদ্ধ, সংবাদ না কি ব্যক্তিগত ওয়েবপেজ। এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। অন্য ওয়েবসাইটের সঙ্গে তুলনাই ওয়েবসাইটের সঠিকতা বিচারে কাজ করে।

সর্বশেষ মনে রাখতে হবে, ইন্টারনেট শুধু তথ্যের উৎস নয়, এটি একজনের কাছে খুবই উপকারী আবার আরেকজনের কাছে মূল্যহীন বলে মনে হতে পারে। যে কারণে একজন সাংবাদিককে শুধু সাইবারস্পেসনির্ভর তথ্যের ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। সাইবারস্পেস সাংবাদিকের তথ্যে সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে।

দুই. সাইবারস্পেসভিত্তিক সাংবাদিকতা

সাইবারস্পেসকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতা গড়ে উঠেছে। আবার সাইবারস্পেস প্রতিনিয়ত সংবাদের বিষয় হচ্ছে। সাইবারস্পেসকেন্দ্রিক সাংবাদকিতার আলোচনায় সাইবারস্পেসকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার ধরন ও সংবাদের নতুন ধারা আলোচনা করা হলো:

ক. সাইবারস্পেসকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার ধরন

সাইবারস্পেসকেন্দ্রিক যে সাংবাদিকতা গড়ে ওঠে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: ডিজিটাল বা অনলাইন সাংবাদিকতা, মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম, মোবাইল জার্নালিজম, সিটিজেন জার্নালিজম, ডাটা জার্নালিজম।

ডিজিটাল বা অনলাইন সাংবাদিকতা: অনলাইন সাংবাদিকতাকে অনেকেই ডিজিটাল সাংবাদিকতা বলে অভিহিত করে থাকেন। অনেকেই এটিকে সংক্ষেপে ডিজি সাংবাদিকতাও বলেন। ডিজিটাল বা অনলাইন সাংবাদিকতায় সংবাদ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতার কাছে পরিবেশিত হয়। এখানে সংবাদ টেক্সট, অডিও-ভিডিও মাধ্যমে প্রচারিত-প্রকাশিত হয়ে থাকে। মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের তুলনায় ডিজিটাল সাংবাদিকতায় দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার পরিমাণ বেশি থাকে।

মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম: মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম সমকালীন সাংবাদিকতার প্রধান আলোচ্য। মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম হলো একজন প্রতিবেদকের সংবাদ উপস্থাপনের বহু দক্ষতা। অর্থাৎ একজন রিপোর্টারকে টিভি-রেডিও, অনলাইন– তিন ধরনের মাধ্যমেই সংবাদ পরিবেশনের দক্ষতা থাকতে হবে। সেই সঙ্গে নিউজরুমে তিন ধরনের সংবাদ উৎপাদনের সুবিধা থাকবে। অর্থাৎ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম হলো দুই বা ততোধিক মাধ্যম ব্যবহার করে ব্যবহার করে সংবাদ উৎপাদন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতার কাছে পরিবেশন করা।

মোবাইল জার্নালিজম: মোবাইল জার্নালিজমকে মোজো জার্নালিজম বলা হয়ে থাকে। যে রিপোর্টার মোবাইল জার্নালিজম করে থাকেন, তাকে সংক্ষেপে mojos বলা হয়। সাংবাদিক অথবা ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট ডিজিটাল ক্যামেরা, স্মার্টফোন অথবা ট্যাবলেট ব্যবহার করে সংবাদ সংগ্রহ করে মোবাইলে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক অথবা সেলুলার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করে থাকে, তাকে মোবাইল জার্নালিজম বলে। মোবাইল জার্নালিজমের কারণে প্রত্যেক স্মার্টফোনধারী ব্যক্তিই মোজোস হয়ে উঠেছেন। ফোর্ট মেয়ারস নিউজ প্রেস ২০০৫ সালে মোজো শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যানেট নিউজপেপারের মাধ্যমে মোজো টার্মটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সিটিজেন জার্নালিজম: শেখ আদনান ফাহাদ বলেন, 'জনসাধারণ যখন নিজ নিজ অবস্থান, সময় ও পেশায় থেকেও তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন তাকে নাগরিক সাংবাদিকতা বলা যায়। সংক্ষেপে বলা যায় অপেশাদারদের সাংবাদিকতা।' নাগরিক সাংবাদিকতায় সাধারণ জনগণ তাদের স্ব-অবস্থান থেকে মোবাইল বা অন্য কোনো ডিভাইসের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করে সরাসরি সংবাদমাধ্যমে অথবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। সংবাদমাধ্যম সংবাদ পরিবেশন করতে অপারগতা প্রকাশ করলে সিটিজেন জার্নালিস্ট নিজেই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। সিটিজেন জার্নালিজমে সাংবাদিকের অনুপস্থিতিতে প্রতিটি জনগণই সাংবাদিক।

ডাটা জার্নালিজম: সংখ্যা ব্যবহার করে সংবাদ উৎপাদন করা এবং ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে এ সংবাদ পরিবেশন করাকে ডাটা জার্নালিজম বলে। ডাটা জার্নালিজম করতে হলে একজন সাংবাদিককে পরিসংখ্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। এ ধরনের সাংবাদিকতায় কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। মূলত সাইবার অপরাধবিষয়ক রিপোর্টিং, কম্পিউটারসহায়ক রিপোর্টিং (CAR: Computer Assisted Reporting), ডাটাবেজ জার্নালিজম, ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রের সাংবাদিকতাকে ডাটা জার্নালিজম বলা হয়।

খ. সংবাদের নতুন ধারা

সাইবারস্পেসকেন্দ্রিক সাংবাদিকতায় সংবাদের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সাইবারস্পেসে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাইবারস্পেসে সংঘটিত অপরাধগুলোই সাইবার অপরাধ। দশম ইউএন কংগ্রেসে সাইবার অপরাধকে দুটি অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়: Cyber crime in a narrow sense (computer crime) covers any illegal behavior directed by means of electronic operations that target the security of computer systems and the data processed by them. আবার, Cyber crime in a broader sense (computer-related crimes) covers any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer system or network. হেলের মতে, 'কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত কম্পিউটারবাহিত কার্যক্রম, যা বিশ্ব ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কে সম্পাদিত হয়।'

সাইবার অপরাধ এখন বিশ্বে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কয়েকটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০১২ সালে আমেরিকায় ৫ হাজার ভুয়া ট্যাক্স রিফান্ড জমা পড়ে, যা টাকার অঙ্কে ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ হলো ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার। এফবিআইয়ের তথ্যমতে, ২০০৯ সালে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয় আমেরিকার করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো। আবার পরিচিতি চুরিও অন্যতম অপরাধ, ২০১১ সালে আমেরিকায় ১১.৬ মিলিয়ন মানুষ পরিচিতি চুরির শিকার হয়েছে। ২০১২ সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনায় রাজস্ব বোর্ড থেকে ৩.৬ মিলিয়ন সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর এবং ৩ লাখ ৮৭ হাজার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড নম্বর চুরি হয়। সবমিলিয়ে সাইবার অপরাধ বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাইবার অপরাধের ধরন: বিনা অনুমতিতে কম্পিউটার অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা, বৈদ্যুতিক ফর্মে তথ্য চুরি করা, ইমেইল বোম্বিং, সালামি অ্যাটাক, ড্যানিয়েল অব সার্ভিস অ্যাটাক, ভাইরাস আক্রমণ, ওয়েব জ্যাকিং, অর্থনৈতিক অপরাধ, সাইবার পর্নোগ্রাফি, অবৈধ প্রবন্ধ বিক্রয়, ইমেইল প্রতারণা, অনলাইন জুয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চুরি, জালিয়াতি, সাইবার মানহানি, সাইবার ছদ্মবেশী ইত্যাদি।

এ অপরাধগুলোর অনেক ধরনই বাংলাদেশে সংঘটিত হচ্ছে। ২০১৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইস্টার্ন ব্যাংকের ২১ জন গ্রাহকের হিসাব থেকে টাকা উধাও হয়ে যায়। এটিএম বুথে স্কিমিং ডিভাইস লাগিয়ে ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করে। চুরিকৃত তথ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে কার্ড ক্লোন করে সাইবার অপরাধীরা। ফলে খুব সহজেই তারা অন্যের অর্থ চুরি করতে পারে।

সাইবারস্পেসে জালিয়াতির ঘটনাও কম নয়। ফেসবুকে প্রেমের সূত্র ধরে ২০১৭ সালের ৩১ জুলাই রাজশাহীতে এক তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ওয়েবসাইট হ্যাকসহ ইমেইল বোম্বিং, সাইবার অ্যাটাক, সাইবার পর্নোগ্রাফি, ব্ল্যাকমেইলিং ইত্যাদি নানা অপরাধের ঘটনা ঘটছে।

এসব অপরাধ সম্পর্কে জানা সাংবাদিকের একান্ত প্রয়োজন। একইভাবে এ ধরনের অপরাধী থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হচ্ছে সচেতনতা। সাইবারস্পেসভিত্তিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে অবশ্যই এসব বিষয়ে সচেতনতামূলক সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।

তিন. সাংবাদিকের সাইবার নিরাপত্তার উপায়

সাইবার নিরাত্তার উপায়গুলো সম্পর্কে সাংবাদিককে যেমন জানতে হবে, তেমনি সংবাদের মাধ্যমে পাঠককে জানানোও অন্যতম কর্তব্য। তাহলে সাইবার নিরাপত্তার বিষয়গুলো জেনে নেওয়া যাক:

* ফাইল, স্মার্ট ফোন ও কম্পিউটারে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা
* পাসওয়ার্ড দীর্ঘ রাখুন এবং সংখ্যা, অক্ষর ও চিহ্নের সমন্বয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করুন
* ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্টের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড দিতে হবে
* পাসওয়ার্ড কোথাও লিখে না রেখে মস্তিষ্কে রাখা অধিকতর নিরাপদ
* কোনো ওয়েবলিঙ্ক, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, বিজ্ঞাপন, অপরিচিত ইমেইলে সন্দেহ হলেই বাদ দিতে হবে।
* ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস বারে লক্ষ রাখুন https:// আছে কিনা। https:// ছাড়া http://, shttp:// ইত্যাদি থাকলে বুঝতে হবে ওয়েবসাইটটির নিরাপত্তা সুরক্ষিত নয়।
* অপরিচিত ওয়াইফাই বা ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে প্রবেশ না করা।
* ইন্টারনেটে তাৎক্ষণিক তথ্য দেওয়ার আগে ভাবুন, আপনার তথ্য চুরি হচ্ছে কিনা।
* ফেসবুকে আকর্ষণীয় খেলাগুলোয় ক্লিক করার আগে চিন্তা করুন তথ্যদাতা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য নিচ্ছে কিনা।
* যদ্দূর সম্ভব যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্যাদি গোপন রাখতে হবে।
* ইন্টারনেটভিত্তিক সব অ্যাকাউন্টে বহুস্তর নিরাপত্তা চালু রাখা।
* সবসময় অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করা।
* অনলাইন প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন থাকা।
* অপরিচিত নেটিজেনকে যাচাই-বাছাই করা।
* নিরাপত্তা হিসেবে অ্যান্টি ভাইরাস ব্যবহার করা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যারগুলো আপডেট করা।

১. যে ব্যক্তি পণ্য উৎপাদন এবং ভোগ করতে পারে তাকে প্রোজিউমার বলে। আর এই প্রক্রিয়াকে বলে প্রোজিউমিং।

লেখক: প্রভাষক, পিআইবি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি: পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকার ভূমিকা

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যে সময়কালের রাজনীতির সঙ্গে সাংবাদিকতার মিথস্ক্রিয়ার বিষয়ে আমাকে আলোচনা করার গুরুদায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন, সেটি ছিল অবিভক্ত ব্রিটিশশাসিত ভারতের এক দারুণ অনিশ্চয়তার কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন মাত্র শেষ হলেও, মানব ইতিহাসের ভয়ংকরতম ও নৃশংস সেই ঘটনার রেশ তখনো কাটেনি। যে সাম্রাজ্যে একসময় সূর্য অস্ত যেত না, সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রেট ব্রিটেন তখন যুদ্ধের পরিণামে মৃতপ্রায় দুর্বল সিংহের মতো ধুঁকছে। ভারতের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিরাজ করছে গুরুতর বিভ্রান্তি। বিশেষ করে, ব্রিটিশ শাসকরা তখন ভারত ত্যাগের ঘোষণা দেওয়ায় ভারতীয় রাজনীতির নতুন মেরুকরণ হচ্ছে। ভারতের প্রভাবশালী রাজনীতিকরা স্বাধীন ভারতের পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল কংগ্রেসেরই এক প্রাক্তন নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তখন পাকিস্তান নামে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র দাবি করছে। এই প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসকরাও দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধাগ্রস্ত কংগ্রেস এমনকি কমিউনিস্টরাও। সেই সময়ে ভারতের সাংবাদিকতা ছিল দারুণভাবে রাজনীতিপ্রবণ। মূলত সংবাদপত্র প্রকাশিতই হতো রাজনৈতিক স্বার্থে। যে রাজনীতিকরা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি করেছিলেন তাঁদেরও প্রয়োজন ছিল কিছু সংবাদপত্রের। অবিভক্ত বাংলার প্রধান মুসলিম লীগ নেতারা তখন মূলত কলকাতাতেই সক্রিয়। কাজেই তাঁদের উদ্যোগে পাকিস্তান দাবির সমর্থক সংবাদপত্রগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়। জিন্নার পাকিস্তান দাবি ছিল একটি নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক দাবি। তিনি তাঁর দাবিকে কিছুটা অ্যাকাডেমিক প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’ নামক এক উদ্ভট চিন্তা উপস্থাপন করে। এই সময়ের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। একদিকে ব্রিটিশ শাসক, অন্যদিকে দেশের বড়ো দুই

জিন্নার পাকিস্তান দাবি ছিল একটি নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক দাবি। তিনি তাঁর দাবিকে কিছুটা অ্যাকাডেমিক প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’ নামক এক উদ্ভট চিন্তা উপস্থাপন করে

সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান নেতারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার এই ইন্ধন জোগানোর ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা ছিল সংবাদপত্রগুলোর। আমরা এখানে মূলত অবিভক্ত বাংলায় পাকিস্তান দাবির সমর্থক সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে তৎকালীন মুসলিম লীগ রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া নিয়ে কিছু আলোচনা করব। এ সময়ের শেষদিকে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তার পূর্বাংশেই এখন বাংলাদেশ। কাজেই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই সময়ের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি শ্রোতাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, এমন আশা কিংবা দুরাশা নিয়েই শুরু করছি।

চল্লিশের বিভাগপূর্ব সময়ে কলকাতার দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদক এবং প্রথম কাতারের মুসলিম লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁর লেখা 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইতে স্পষ্টই বলেছেন যে, ছেচল্লিশের কলকাতা মহাদাঙ্গা না হলে পাকিস্তান সৃষ্টি হতো না। তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য ধরে অগ্রসর হলে বোঝা যায় যে, কলকাতার মহাদাঙ্গার পূর্বে পাকিস্তান দাবির সমর্থক লীগ নেতৃবৃন্দ এবং এই দাবির সমর্থক তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত বলে জোর প্রচারণার ভেতরটা ছিল নিতান্তই ফাঁপা। এমনকি জিন্না সাহেব, যাঁকে পাকিস্তানে পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা গণ্য করা হলো, তিনি নিজেও যে তাঁর দাবি অনুযায়ী পাকিস্তান পাবেন সে ব্যাপারে মোটেই নিশ্চিত ছিলেন না। মোহাম্মদ মোদাব্বের, যিনি সেই সময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ এর মালিকানাধীন এবং লীগের মুখপত্র বলে বিবেচিত আজাদ পত্রিকা এবং পরবর্তী সময়ে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী না বলে প্রধানমন্ত্রীই বলা হতো) ও লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দীর মালিকানাধীন ইত্তেহাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি তাঁর সাংবাদিকের রোজনামচা বইতে জানাচ্ছেন যে, জিন্না পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে 'বৃহত্তর' বা 'অখণ্ড' বাংলা রাষ্ট্রের গঠন প্রচেষ্টার প্রতি 'God speed' বলে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, জিন্না বিশ্বাস করতেন, কলকাতা ছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তা হবে অর্থহীন। অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের গঠন প্রচেষ্টার প্রথমদিকে গান্ধীরও সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। এগুলো সবই ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই জিন্না তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি এবং ইংরেজদের দরবারে নরম-গরম তদবির করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করার যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তার সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিজে এবং তাঁর অনুসারী লীগ নেতারাও মোটেই আস্থাবান ছিলেন না। তা এটা ঠিক যে, তৎকালীন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের জিন্নাকে পাকিস্তান দিয়ে বা না দিয়ে ভারতকে 'স্বাধীনতা' দেওয়ার একটা তাড়া ছিল। কারণ ব্রিটিশ সরকার এই কাজটিই দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে ভারতে পাঠিয়েছিল। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ধীরগতির ভাইসরয় ওয়াভেলকে তাই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসুর নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠন প্রক্রিয়ার প্রতি এক পর্যায়ে লীগের মুখপত্র আজাদ পত্রিকা, এমনকি খাজা নাজিমউদ্দিনসহ প্রায় সর্বস্তরের লীগ নেতাও সমর্থন জানিয়েছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ অখণ্ড বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলার পক্ষে আজাদে সম্পাদকীয়ও লিখেছিলেন। আকরম খাঁ বরং মনে করতেন যে, বাংলা ও আসাম নিয়ে যে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে তার নাম হবে 'বঙ্গাসাম'।

এই অবস্থা পাকিস্তান বাস্তবে রূপ নেবে কি নেবে না সে সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে অনিশ্চয়তা থাকা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্যযোগ্য যে, যখন নেতাদের মধ্যে এই অনিশ্চয়তা, তার আগেই কলকাতা মহাদাঙ্গা সংঘটিত হয়। মহাদাঙ্গার কারণে পাকিস্তানপন্থীদের এই কথা প্রচার করা সহজ হয় যে, এ দেশে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়। তাদের অদ্ভুত যুক্তি ছিল এই যে, মহাদাঙ্গার ব্যাপকতাই তাদের বক্তব্যের অকাট্য প্রমাণ। তারা অবশ্য পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাঞ্জাবে যে ভয়ংকর দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, তা উল্লেখ করে এ সত্য উচ্চারণ করেনি যে, পাকিস্তান হওয়ার কারণেই এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পেরেছিল। কিংবা এ প্রশ্নও তারা তোলেনি যে, দাঙ্গার নামে অসহায় নিরীহ মানুষ মেরে কোনো রাজনৈতিক দাবি প্রতিষ্ঠার পথ কতটা অসংগত, নিষ্ঠুর ও অনৈতিক।

যাই হোক, কলকাতায় দাঙ্গার নামে অসহায় কয়েক হাজার হিন্দু-মুসলমানের প্রাণনাশ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার এই পরিবেশ সৃষ্টিতে কলকাতার পাকিস্তানপন্থী পত্রিকাগুলোর সবগুলোরই কমবেশি ভূমিকা ছিল। আগে আমরা দেখে নিই যে, অবিভক্ত বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ক্ষেত্র রাজধানী কলকাতায় তখন ক'টি পাকিস্তানপন্থী পত্রিকা ছিল? মোট পাঁচটি পত্রিকা মুসলিম লীগের রাজনীতি তথা পাকিস্তান দাবির সমর্থক ছিল। এগুলো হচ্ছে, মুসলিম লীগের আকরম খাঁ-খাজা নাজিমউদ্দিন গ্রুপের সমর্থক পত্রিকা আজাদ, মূলত অবাঙালি মুসলমানদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর মর্নিং নিউজ, ধনী ব্যবসায়ী ইস্পাহানিদের মালিকানাধীন মুসলিম ব্যবসায়ী গ্রুপের সমর্থক ও রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী স্টার অব ইন্ডিয়া, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিমের নিয়ন্ত্রণাধীন মিল্লাত এবং বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গীয় আইনসভায় লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা সোহরাওয়ার্দীর মালিকানাধীন ইত্তেহাদ। পত্রিকাগুলোর মধ্যে তৎকালীন মুসলিম লীগের উপদলীয় কোন্দলের প্রভাব ছিল প্রকট। আজাদ ছিল শতভাগ জিন্নাপন্থী। সেই সময় জিন্না ছিলেন ঘটনাক্রমে মুসলমানদের মধ্যে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় নেতা। আকরম খাঁ-নাজিমউদ্দিন ছিলেন জিন্নাভক্ত উপদলের নেতা। ইস্পাহানিদের কাছে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বড়ো হলেও লীগ রাজনীতিতে তারাও ছিল জিন্নার নেতৃত্বে বিশ্বাসী। উল্লেখ্য যে, ইস্পাহানি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ। কলকাতাবাসী অবাঙালি মুসলমানরা ছিল একটি বিশাল সম্প্রদায়। এদের একটি অংশই কলকাতা দাঙ্গায় সবচাইতে সক্রিয় ছিল। খুন-খারাবিতে তাদের উৎসাহই ছিল সর্বাধিক। মর্নিং নিউজ মূলত ছিল এদেরই মুখপত্র। এছাড়া পত্রিকাটির জিন্নাভক্তি তো ছিলই। তবে মিল্লাত এবং ইত্তেহাদ খানিকটা ব্যতিক্রমী ছিল এই অর্থে যে, পাকিস্তান দাবির পক্ষে প্রকাশ্যে সোচ্চার থেকেও তারা এই অঞ্চলের মুসলমানদের বাঙালি চেতনাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে চাইত না। পাকিস্তান দাবির পক্ষে জিন্না যে উদ্ভট 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' হাজির করেছিলেন, তারপক্ষে এই পত্রিকা দু'টি তেমন সোচ্চার হয়নি। তবে মিল্লাতের বা তার মালিক আবুল হাশিমের তত্ত্ব ছিল এই যে, মুসলমানরা নির্যাতিত, তাই তারা প্রোলেতারিয়েত এবং সেজন্য তাদের আলাদা আবাসভূমি দরকার ইত্যাদি। ইত্তেহাদে আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদক থাকায় তাতে প্রকাশিত লেখাগুলোর মান ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং যুক্তিনির্ভর। অন্যদিকে সুলেখক হলেও আজাদের নীতিনির্ধারণে সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে সেই সময়ে আলোচ্য সবগুলো পত্রিকাই ছিল কমবেশি সোচ্চার। এই পাকিস্তান কেমন হবে, রাষ্ট্র হিসেবে তার গঠনপ্রণালি কী হবে–এসব আলোচনা মিল্লাত কিংবা ইত্তেহাদে কিছুটা হয়েছে; কিন্তু আজাদের স্পষ্ট কথা ছিল, আগে কোনো তর্কে না গিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর প্রয়োজনবোধে এইসব আলোচনা।

কিন্তু আজাদের পৃষ্ঠায় পাকিস্তান কেমন রাষ্ট্র হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে অনীহা জানিয়েও এমন সব সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে, যাতে এক্ষেত্রে আজাদের মনোভাব অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন ভবিষ্যৎ পাকিস্তান কেমন রাষ্ট্র হবে সে প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে আজাদের সম্পাদকীয় মন্তব্য: '...পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দেশ হইলে, সে গণতন্ত্রের রূপ ও পরিচয় কি হইবে– তাহা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করিবে, না মার্কিন গণতন্ত্রের অনুসারী হইবে, না অন্যকিছু? পাকিস্তান পুঁজিবাদ স্বীকার করিবে, না, নিছক সমাজতান্ত্রিক আদর্শই হইবে তার পরিণতি?'

অর্থাৎ 'গণতান্ত্রিক' না হয়ে যদি পাকিস্তান 'নিছক সমাজতান্ত্রিক পরিণতি'-এর দিকে যায় তবে আজাদ তাকে ভালো মনে করবে না। কারণ 'সমাজতন্ত্র' হচ্ছে একটা 'নিছক পরিণতি' যা স্পষ্টতই নেতিবাচক। আর পুঁজিবাদ হচ্ছে সেই সময়ে শুধু 'স্বীকার' করে নেওয়ার মতো একটি ব্যবস্থা।

এখানে উল্লেখ্য যে, কামরুদ্দিন আহমদ A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh নামক বইতে মুসলিম লীগের ভেতরেও 'বামপন্থী' এবং 'ডানপন্থী' ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সার্বিকভাবে মুসলিম লীগের এই প্রবণতাগুলো পাকিস্তানপন্থী আলোচ্য সংবাদপত্রগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল। আজাদ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের 'মূলনীতি' মেনে নেওয়ার পরই পাকিস্তান রাষ্ট্র কী ধরনের হবে, সেটি সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে, তা-ও হতে হবে কেবলমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর। তবে এই 'মূলনীতি' বিষয়টি ঠিক কী, তা আজাদের বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল না। আজাদের অবশ্য দাবি বা আবদার ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতের সবাইকে পাকিস্তানের এই তথাকথিত 'মূলনীতি' মেনে নিতে হবে।

আজাদের বক্তব্যে বোঝা যায় যে, আজাদ চাচ্ছিল বিনাবাক্য ব্যয়ে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়া হোক। অর্থাৎ পাকিস্তান দাবি যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক সে বিচারে যাওয়া যাবে না। ভাবটা যেন এই যে, প্রথমে পাকিস্তান দাবির পক্ষে 'ঈমান' আনতে হবে, তারপর অন্য কথা; কিন্তু সেই সময়ে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ নিজেরাই যে কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত রেখে বাংলা ও

আসাম নিয়ে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র কিংবা প্রাদেশিক লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ-এর ভাষায় স্বাধীন 'বঙ্গাসাম' রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করেছিলেন, সেকথা কিন্তু পাকিস্তান দাবি প্রসঙ্গে আজাদ মাঝে-মাঝে সুবিধামতো বিস্মৃত হতে চেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, জিন্নার ইচ্ছা অনুযায়ী কলকাতা অন্তর্ভুক্ত রেখেই স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বরং কলকাতার তুলনায় অনুন্নত জেলা শহর ঢাকাকে রাজধানী করে পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠনের ক্ষেত্রে ঢাকার নওয়াব পরিবারের আগ্রহ প্রকাশ পায়। সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে খাজা নাজিমউদ্দিন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর কলকাতাসহ বাংলা স্বাধীন করার দাবি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এই খাজা নাজিমউদ্দিনই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে স্বাধীন অখণ্ড বাংলার পক্ষে জোর সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। খাজা নাজিমউদ্দিন এবং আকরম খাঁ-ও তাঁর স্বাধীন 'বঙ্গাসাম' রাষ্ট্র গঠনের বা কলকাতাকে রেখে বাংলায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আর উচ্চবাচ্য করেননি। ঘটনাপ্রবাহের এই অসংগতি কিন্তু তৎকালীন ইতিহাসে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবেই রয়ে গেছে।

আবুল মনসুর আহমদ আমাদের জানাচ্ছেন যে, ৫ আগস্ট (১৯৪৭) তারিখে খাজা নাজিমউদ্দিন পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানপন্থী পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেবল ইত্তেহাদ ছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত রেখে বাংলা স্বাধীন করার দাবি মন্দীভূত হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের কয়েক বছরের পাকিস্তানপন্থী কলকাতার পত্রিকাগুলোর উপস্থাপনা ও মতামত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রগুলোর নিকট পাকিস্তান দাবিটি

> *আবুল মনসুর আহমদ আমাদের জানাচ্ছেন যে, ৫ আগস্ট (১৯৪৭) তারিখে খাজা নাজিমউদ্দিন পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানপন্থী পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেবল ইত্তেহাদ ছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত রেখে বাংলা স্বাধীন করার দাবি মন্দীভূত হয়ে যায়*

কোনো আদর্শভিত্তিক দাবি ছিল না, বরং যেকোনো প্রকারেই হোক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ রেখে ক্ষমতায় থাকাই ছিল এই দাবির অন্তর্গত অভিপ্রায়। এ ক্ষেত্রে জিন্না উদ্ভাবিত তথাকথিত 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' এরও কোনো প্রভাব ছিল না। এই তত্ত্বটি সম্পর্কে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও পত্রিকাগুলোর পাতায় দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এ সময় এ পত্রিকাগুলোতে শুধু যে পাকিস্তান দাবির বিরোধিতাকারীদের বিশেষ করে কংগ্রেসের সমালোচনা করা হয়, তা-ই নয়, তাদের ভাষায় 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান'দের (অর্থাৎ লীগবিরোধী মুসলমান) কঠোর নিন্দার পাশাপাশি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পত্রিকাগুলো তৎকালীন বাঙালি মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যথা, শেরেবাংলা ফজলুল হক, নওশের আলী, শামসুদ্দীন আহমদসহ অন্যান্য লীগবিরোধী মুসলিম নেতৃবৃন্দের তীব্র, অশালীন ও প্রায়শ অযৌক্তিক নিন্দা-সমালোচনায় মুখর হয়।

উল্লেখ্য যে, এই সময় ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত অবস্থায় ছিলেন। প্রধানত জিন্নার সঙ্গে মতবিরোধের কারণেই ফজলুল হককে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ফজলুল হক পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান করলে সানন্দে তাঁকে দলে স্বাগত জানায় আজাদ পত্রিকা এবং তাঁর নেতৃত্বগুণের ভূয়সী প্রশংসা করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগের রাজনীতির চাইতে পত্রিকাগুলোর মধ্যে আজাদ ও স্টার অব ইন্ডিয়া'য় ব্যক্তি জিন্নার প্রতি আনুগত্য বেশি ছিল। এই দু'টি পত্রিকার মধ্যে আরো একটি উল্লেখযোগ্য মিল এই যে, সুভাষ বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি উভয় পত্রিকার বিরূপতা ছিল। তারা এই বাহিনীর সদস্যদের দেশপ্রেমিক মনে করত না।

স্টার অব ইন্ডিয়া রাজনীতিতে বিপ্লবী তৎপরতার বিরোধী এবং ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিল। অন্যদিকে মিল্লাত পত্রিকা ছিল ব্রিটিশবিরোধী। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টন রশীদকে (১৯৪৬ সালের প্রথমদিকে) দণ্ডাদেশ দেওয়া হলে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ বিক্ষোভের পরিণামে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটি মিলন প্রচেষ্টা চলতে পারে, এই 'আশঙ্কায়' আজাদ বিচলিত হয়েছিল। অন্যদিকে মিল্লাত এই বিক্ষোভকে স্বাগত জানিয়েছিল।

মিল্লাত ও আজাদ পত্রিকার ভূমিকার তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, উভয় পত্রিকা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী প্রচারে মুসলিম লীগের কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানালেও আজাদ এই প্রচারণায় ছিল বিশেষভাবে কমিউনিস্ট ভাবধারার বিরোধী, অন্যদিকে মিল্লাত এই প্রচারণায় মুসলমানদের শোষিত হিসেবে চিত্রিত করে কিছুটা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে এই নির্বাচনকে শোষক-শোষিতের লড়াই বলে চিহ্নিত করে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের সমর্থন করেছিল।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচিত হয়েও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী অবশ্য কোয়ালিশনে কংগ্রেসকে রাজি করাতে ব্যর্থ হন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর এই কোয়ালিশন প্রচেষ্টার ব্যাপারে আজাদ সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির কারণে সর্ব অবস্থায় কোয়ালিশনের বিরোধী ছিল। কিন্তু স্টার অব ইন্ডিয়া'র মালিক যেহেতু ছিলেন ব্যবসায়ী ইস্পাহানিরা, কাজেই তারা বিশৃঙ্খলতার রাজনীতির চাইতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাদের ব্যবসায়ের সুবিধা হবে ভেবে শর্ত সাপেক্ষে কোয়ালিশনের পক্ষে ছিল, ফলে তাদের পত্রিকাটিও একই নীতির অনুসরণ করে। দেখা যায় যে, স্টার অব ইন্ডিয়া কোয়ালিশন প্রশ্নে ছিল বেশ নমনীয়।

সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনে ব্যর্থ হয়ে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আজাদ ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু তৎকালীন উপদলীয় কোন্দলে মিল্লাতের পরিচালক আবুল হাশিম ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর মিত্র। তাই সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার প্রতি মিল্লাতের মনোভাব ছিল অনুকূল।

তবে এই পর্যায়ে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, উপদলীয় কোন্দলে জড়িত পাকিস্তানপন্থী ও লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সর্বদা একই নীতি বজায় রেখে চলতে পারেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে পত্রিকাগুলোতে গুরুতর বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ায় এ সমস্ত পত্রিকার ভূমিকা মাঝে-মাঝে স্ববিরোধী হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠন প্রশ্নে পত্রিকাগুলোর মধ্যে স্ববিরোধী প্রবণতা মাঝে-মাঝেই প্রকট হয়ে ওঠে। তারা নিজেরাও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে বিভ্রান্তিতে ভোগে। পত্রিকার পাতায় এই বিভ্রান্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠন, স্বাধীন বাংলায় কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত রাখা কিংবা পাকিস্তান রাষ্ট্রে কলকাতার অন্তর্ভুক্তি, বাংলা ও আসামকে একত্রিত করে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন ইত্যাদি প্রশ্নে পত্রিকাগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ উপদলীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে নানা বিভ্রান্তির প্রকাশ দেখা যায়। পাকিস্তান দাবি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মেনে নেবে কিনা, মানলেও কতখানি মানবে, এই প্রশ্নে কংগ্রেস ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে কী মাত্রায় প্রভাবিত করতে পারবে, এসব প্রশ্নে মুসলিম নেতারা মোটেও নিশ্চিত ছিলেন না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত যে ধরনের পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেতাদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, সে পাকিস্তান সম্পর্কে লীগের শীর্ষ নেতা জিন্না নিজেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তাঁর ভাষায়, 'পোকায় খাওয়া, খণ্ডিত পাকিস্তান' পেয়েছেন। এ অবস্থায় পাকিস্তান দাবি কিংবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতা কিংবা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রিকাগুলোর গুরুতর বিভ্রান্তি বা স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। বাস্তবে তাই ঘটেছিল।

এই সমস্ত বিভ্রান্তির একটা প্রধান কারণ ছিল সম্ভবত এই যে, ১৯৪৬ সালের কলকাতা মহাদাঙ্গার পর বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু দিনের মধ্যেই সকল বাঙালিকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হালে পানি পায়নি, যদিও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার

উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম লীগ দলে সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়দের এই উদ্যোগের ব্যাপারে প্রথমে যথেষ্ট সক্রিয় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে কংগ্রেসপন্থী সংবাদপত্রগুলোর চোখে সোহরাওয়ার্দী 'দাঙ্গাবাজ' হিসেবে পরিচিত হয়েছেন এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পরিণামে স্বয়ং গান্ধী কর্তৃক অখণ্ড স্বাধীন বাংলার উদ্যোগ বন্ধ করার নির্দেশ পেয়েছিলেন শরৎ বসু। অনেকে অবশ্য এই উদ্যোগ বন্ধের পেছনে নেহেরু ও প্যাটেলের বিরোধিতাকেও দায়ী করেন। উল্লেখ্য যে, গান্ধীর উপর নেহেরু-প্যাটেলের চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা এখন ইতিহাস-স্বীকৃত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এইসব ধারণা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ তৎকালীন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মতাশ্রয়ী সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং বিভিন্ন নামে-বেনামে লেখা বহু সংখ্যক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এমনকি বাংলা ভাগ প্রসঙ্গে তখন পত্রপত্রিকায় এই উদ্যোগের পক্ষে-বিপক্ষে বেশকিছু সংখ্যক ছড়া কবিতা এমনকি গান ছাপা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এ প্রসঙ্গে খুকুর তেলের শিশি ভাঙ্গা নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিখ্যাত 'রাজনৈতিক' ছড়াটির কথা বলা যায়, যেটি এখনো অনেকেরই স্মৃতিতে ধারণ করা আছে।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির সমর্থনে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' বা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালন করে। এই দিবসটির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঠিক কার বিরুদ্ধে– ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে নাকি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তা মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতাই সম্পূর্ণ স্পষ্ট করেননি। আবুল মনসুরের মতে, খাজা নাজিমউদ্দিন বলেছিলেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

তৎকালীন পাকিস্তানপন্থী পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠায় আসন্ন 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' সংক্রান্ত সম্পাদকীয় ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের এই দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমউদ্দিন এবং পত্রিকাগুলোর মধ্যে মূলত আজাদ পত্রিকার কণ্ঠস্বরই অধিক 'জঙ্গি' মনোভাবসম্পন্ন ছিল।

এই অবস্থায় দেখা যায়, ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু নেতার এই দিবস সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতা ও কার্যকলাপ দাঙ্গা বাধানোর ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। কোনো কোনো লেখকের মতে ব্রিটিশ সরকারই কৌশলে এই দাঙ্গা বাধিয়েছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম নামক পুস্তকে সুপ্রকাশ রায় লেখেন, 'ভারতের কতিপয় মুসলমান ও হিন্দু নেতার দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি ও ক্রিয়াকলাপ যে উগ্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াই ব্রিটিশ শাসকগণ এই দাঙ্গা (অর্থাৎ কলকাতা মহাদাঙ্গা) বাধাইতে পারিয়াছিল।' বাংলাদেশের ইতিহাস বইতে ইতিহাসবিদ এম বি এস মাহমুদের বক্তব্য: কলকাতা দাঙ্গার জন্য 'পত্রপত্রিকার প্রচারণা, নেতৃবৃন্দের উস্কানিমূলক বক্তৃতা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা দায়ী ছিল।'

কলকাতার মহাদাঙ্গার পর ১৯৪৭ সালে দাঙ্গার ক্ষত না শুকাতেই লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যথা সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখের স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি আজাদ ও স্টার অব ইন্ডিয়া স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের বিরোধিতা করে। মিল্লাত অবশ্য মনে করত যে, অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই পাকিস্তানের বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু অন্যদিকে আজাদ অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানে আনা সম্ভব নয় মনে করেও 'পূর্ব পাকিস্তানে সকল সম্প্রদায়ের স্বাধীন রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল। তবে তৎকালীন মুসলিম লীগ সমর্থক আলোচ্য সকল সংবাদপত্রই সম্ভব হলে সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে নিয়ে আসার পক্ষপাতি ছিল। এইসব মিলে রাজনৈতিক মহলে একটা প্রচণ্ড বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, আজাদের মালিক আকরম খাঁ আজাদের পৃষ্ঠায় সেসময় বাংলার সঙ্গে আসাম যোগ করে 'বঙ্গাসাম' নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে উৎসাহী ও জোরালো বক্তব্য দিয়েছিলেন। আবার ১৯৫০ সালে (২৪ জুলাই) এসে দেখা যাচ্ছে যে, আকরম খাঁ এর পত্রিকা আজাদ পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, পত্রিকাটি সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার ক্ষেত্রে সর্বদাই কাজ করেছে এবং তাতে সফলও হয়েছে। অর্থাৎ অখণ্ড বাংলার বিরোধী হয়েও বিভিন্ন সময়ে স্ববিরোধী মত দিয়ে আজাদের মালিক আকরম খাঁ দুই পক্ষেই থাকার অবাস্তব চেষ্টা করেছিলেন। তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আজাদ বঙ্গভঙ্গ অথবা অখণ্ড বঙ্গ প্রশ্নে কেবল জিন্নার মতামতই গ্রাহ্য করার পক্ষে ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, জিন্না একসময় কলকাতাসহ অখণ্ড সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে থাকলেও শেষ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফের পেন্সিলের দাগ দেওয়া সীমানা মেনে খণ্ডিত বাংলাকেই পাকিস্তানে গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়েছিলেন।

ইত্তেহাদে তৎকালীন সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ অবশ্য দাবি করেছেন যে, তাঁর পত্রিকা ইত্তেহাদ শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ দেশভাগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কলকাতাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে অটল ছিল। অন্যদিকে মিল্লাত পত্রিকা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো অভিমত দিলেও এরূপ রাষ্ট্রকেই পাকিস্তান আখ্যায়িত করে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়েছিল। মিল্লাত কর্তৃপক্ষের এরূপ মতামত দেওয়ার সময় সম্ভবত একথা খেয়াল ছিল না যে, প্রায় সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রাষ্ট্র অখণ্ড বাংলা আর যাই হোক জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠন করা সম্ভব নয়।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সেসময় বাংলার মুসলিম লীগ রাজনীতিতে এমনকি পাকিস্তান সমর্থক সাংবাদিকতায়ও মওলানা আকরাম খাঁ এবং আবুল হাশিম ছিলেন পরস্পরের ঘোর বিরোধী বা বলা যায় তাঁরা ছিলেন বিবদমান দুই পক্ষের নেতা। আকরম খাঁ তখন বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং দলের রক্ষণশীল অংশের প্রতিনিধি, অন্যদিকে দলের সেক্রেটারি আবুল হাশিম ছিলেন দলের প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধি। ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ আইন প্রণেতাদের কনভেনশনে জিন্নার বিরাগভাজন হবেন জেনেও আবুল হাশিম মূল লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আকরম খাঁ ছিলেন জিন্নার সকল ন্যায়-অন্যায় আচরণের অন্ধ সমর্থক। এই দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রত্যেকেরই নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এক একটি পত্রিকা, যেগুলোকে চরিত্রের দিক থেকে প্রায় 'প্রচারপত্র' বলা যায়। আজাদ তখন সাধারণ বাঙালি মুসলমান সমাজে খুবই জনপ্রিয়। অন্যদিকে মিল্লাত খুব জনপ্রিয় না হলেও চিন্তাশীল বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত নাগরিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এই পত্রিকার পাঠক। তাছাড়া মিল্লাতের পরিচালক আবুল হাশিম ছিলেন সুবক্তা এবং অত্যন্ত দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রগতিশীল আবুল হাশিম ও উদারনৈতিক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক মেলবন্ধন ও দক্ষতা এবং অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য নির্বাচনী প্রচারের কারণেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। নির্বাচনী প্রচারে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আকরম খাঁ কখনোই খুব উৎসাহী ছিলেন না। বহুল প্রচারিত আজাদ-ই ছিল আকরম খাঁ এর রাজনৈতিক শক্তির প্রধান উৎস। হাশিম-আকরম তিক্ত রাজনৈতিক বিরোধে আজাদ ও মিল্লাত পত্রিকাকে বিতর্কের হাতিয়ার হিসেবে দুইপক্ষই প্রায় সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, আবুল হাশিমের বিরোধিতার ক্ষেত্রে মর্নিং নিউজ ও স্টার অব ইন্ডিয়া, আজাদের সহযোগী ছিল।

আজাদের সঙ্গে মিল্লাতের তিক্ত সম্পর্ক কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা ১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে আজাদের একটি মন্তব্য থেকেই বোঝা যাবে। এই সময় আবুল হাশিমকে আজাদের ভাষায় 'মোছলেম বাংলার সব চাইতে অপ্রিয় ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করা হয়। এসময় আবুল হাশিম বাংলা মুসলিম লীগের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, মিল্লাতের সম্পাদক পদে থেকে প্রগতিশীল চেতনার সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস মিল্লাত পরিচালনায় আবুল হাশিমকে সহযোগিতা করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের প্রথমদিক থেকে ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দী এবং অবিভক্ত বাংলায় তাঁর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার উপর আজাদ তীব্র আক্রমণাত্মক সমালোচনার তীর ছুঁড়তে থাকে। বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে আজাদ এবং ইত্তেহাদের মধ্যেও বাকবিতণ্ডা তীব্রতর ও সংযমহীন হয়ে ওঠে। আজাদ বহুল প্রচারিত হওয়ায় আজাদ-ইত্তেহাদ বিতর্কে পার্লামেন্টারি দলের আসন্ন নেতা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোহরাওয়ার্দী পিছিয়ে পড়েন বলে অনেকের ধারণা। আজাদ তথা আকরম খাঁ ছাড়াও পার্লামেন্টারি দলের নেতা (যিনি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন) নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী বদলে খাজা নাজিমউদ্দিনের প্রতি জিন্নারও সমর্থন ও আশীর্বাদ ছিল। শেষ পর্যন্ত আজাদের সমর্থিত প্রার্থী খাজা নাজিমউদ্দিনই জয়লাভ করেন। অবশ্য এই সময় আজাদের মতো এত সর্বাত্মকভাবে না হলেও মর্নিং নিউজ-ও খাজা নাজিমউদ্দিনের পক্ষ অবলম্বন করে। স্টার অব ইন্ডিয়া সোহরাওয়ার্দী-বিরোধী হলেও পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচনে অনেকটা নিরপেক্ষ ছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে পাকিস্তানের সম্ভাব্য রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বা তর্কে আজাদ বাংলা ভাষার পক্ষে থাকলেও মাঝে-মাঝে উর্দুর পক্ষে দোদুল্যমান

হয়ে পড়ত। কিন্তু বাংলা ভাষার পক্ষে ইত্তেহাদের ভূমিকা ছিল স্পষ্ট ও নিরঙ্কুশ। মর্নিং নিউজ সর্বদাই ছিল উর্দুর পক্ষে।

আজাদ ও ইত্তেহাদের বিরোধ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও শেষ হয়ে যায়নি। কলকাতায় প্রকাশিত পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেবল আজাদ ও মর্নিং নিউজ-ই পাকিস্তানে অর্থাৎ রাজধানী ঢাকায় আসতে পেরেছিল। ইত্তেহাদ অনেক চেষ্টা করেও নাজিমউদ্দিন সরকারের অসহযোগিতার কারণে ঢাকায় আসতে পারেনি। এ ব্যাপারে কোনো কোনো প্রকাশনায় ইত্তেহাদ-ও কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে উল্লেখ থাকায় আমি বিস্মিত হয়েছি। ইত্তেহাদ নামে দেশভাগের পর ঢাকায় যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার সঙ্গে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সোহরাওয়ার্দীর মালিকানাধীন ইত্তেহাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। কলকাতার ইত্তেহাদের ঢাকা স্থানান্তরে ব্যর্থতা সম্পর্কে আমি বাংলা একাডেমি পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মূলত ঢাকায় আসতে না পারার কারণেই ইত্তেহাদ বন্ধ হয়ে যায়। প্রাদেশিক সরকার কলকাতা থেকে ডাক ও বিমানযোগে আসা ইত্তেহাদকে কয়েকবার পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেসময় নাজিমউদ্দিন সরকার শুধু ইত্তেহাদই নয়, বরং ইত্তেহাদের মালিক অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সোহরাওয়ার্দীকেও পূর্ব পাকিস্তানে আসতে দেয়নি।

এই আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করে ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো ঠিক হবে না। তবে এ কথা বলা যায় যে, বাংলায় এ সময়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রগুলোকেই সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার জন্মলগ্নের সূচনাকারী বলা যায়। রক্ষণশীল এবং অনেকটাই সুবিধাবাদী রাজনীতিক; কিন্তু দক্ষ সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সংগঠক ও পরিচালক মওলানা আকরম খাঁ সেই সময়ের রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় স্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর পরিচালিত আজাদ সেই সময়ে বাঙালি মুসলমানদের কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য বাংলা ভাষার একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছিল, যা থেকেই আজকের এ দেশের বাংলা সংবাদপত্র ও অফিস-আদালতে ব্যবহারযোগ্য ও কার্যকর বাংলা গদ্য সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা চলে। রাজনীতিতে আকরম খাঁ জিন্নার ক্রীড়নক ছিলেন ঠিকই; কিন্তু বাঙালি মুসলমান জনগণের মধ্যে জিন্নার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর পত্রিকা আজাদের সাফল্য ছিল ঐতিহাসিক। বিপুল সরকারি সহযোগিতা পেয়ে আকরম খাঁ আজাদকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন এবং এখানেও মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থক ছিল পত্রিকাটি।

বাঙালি মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাবান, অসাম্প্রদায়িক, সাহসী, শিক্ষিত ও দক্ষ, দেশপ্রেমিক কিংবা বলা যায় বাঙালিপ্রেমিক ছিলেন শেরেবাংলা ফজলুল হক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সময়ে জিন্নার সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতের পরিণতিতে মুসলিম লীগ থেকে তিনি ছিলেন বহিষ্কৃত। ফলে তাঁর নিজের বা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রপত্রিকার মুসলিম লীগ রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফজলুল হক পাকিস্তান হওয়ার প্রাক্কালে মুসলিম লীগে পুনরায় যোগদান করলে আজাদ পত্রিকা তাকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছিল। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ফজলুল হক একসময় সর্বভারতীয় কংগ্রেসেরও মহাসচিব ছিলেন এবং বাঙালি মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে তাঁরই ব্যাপক সর্বভারতীয় পরিচিতি ছিল। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক হিসেবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের কাছেই তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। ইত্তেহাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যিনি আলোচ্যকালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁরও শিক্ষা-দীক্ষা, মেধা ছিল অসাধারণ এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবেও তাঁর প্রচুর সুনাম ছিল। বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন এক অনন্য রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইংরেজ আমলাদের কাছেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্য ও সহযোগী হিসেবে রাজনীতিতে বিশেষ পরিচিত ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সেই সময়ের মুসলমান রাজনীতিকদের পক্ষে মুসলিম লীগ রাজনীতির বাইরে গিয়ে টিকে থাকা কঠিন ছিল। তাই স্বভাব ও মননে উদারনৈতিক এবং অসাম্প্রদায়িক হয়েও মুসলিম লীগ রাজনীতির অনিবার্য প্রয়োজনে তাঁকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষেই কাজ করতে হয়েছিল। তবে তাঁর পত্রিকা (যার সম্পাদক ছিলেন দক্ষ রাজনীতিক ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ) মোটামুটিভাবে লীগ রাজনীতির আবহে থেকেও অনেকটাই যুক্তিবাদী ভূমিকা গ্রহণের প্রয়াস পেয়েছিল। মিল্লাত পত্রিকা পরিচালনাকারী আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগ মহলের 'বামপন্থী' অংশের নেতা। বাংলা মুসলিম লীগের নির্বাচিত সম্পাদক আবুল হাশিম ছিলেন একাধারে জ্ঞানী, অসাধারণ বাগ্মী ও অত্যন্ত কর্মঠ রাজনৈতিক সংগঠক। ইসলামি শিক্ষায় দক্ষ হওয়ায় তাঁকে 'আল্লামা' আবুল হাশিমও বলা হতো। তিনি চোখের অসুখে ভুগে শেষ বয়সে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরও লীগ মহলের সুশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে অনেক সম্মানিত আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর পত্রিকার বিষয়বস্তু, ভাষা ও যুক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, তীব্র, সাহসী ও ব্যতিক্রমী। কিন্তু লীগের রক্ষণশীল মহলের বেপরোয়া আক্রমণ ও শত্রুতার ফলে তিনি এবং তাঁর পত্রিকা শেষ পর্যন্ত খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আবুল হাশিমের এবং সেই সাথে ইত্তেহাদের সঙ্গে মিল্লাতের সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। কখনো ছিল তা সম্প্রীতির কখনো তা ছিল বিরোধিতার। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ প্রায়ই অত্যন্ত কার্যকর ইতিবাচক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে। আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় ইত্তেহাদ উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

মিল্লাত পত্রিকা অযথা কংগ্রেস ও হিন্দু বিরোধিতার চাইতে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুসলমানদের নির্যাতিত ও অধিকারহারা হিসেবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। মিল্লাতের কথা ছিল একটি নির্যাতিত ও অধিকারবঞ্চিত সম্প্রদায় হিসেবে ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির জন্যই পাকিস্তান দরকার। মিল্লাত একই সঙ্গে দেশে পূর্ণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছে।

ভারতে ইস্পাহানি গ্রুপ ছিল মূলত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসেছিলেন ইরান থেকে। জিন্না রাজনীতি করতে গিয়ে আর্থিক কারণেই ধনী ইস্পাহানিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছিলেন। সেজন্যই ইস্পাহানি বাঙালি না হওয়া সত্ত্বেও জিন্না তাঁকে বাংলা মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ করেছিলেন। রাজনীতির চাইতে ব্যবসাই ইস্পাহানিদের কাছে বড়ো ছিল। তবে যদি পাকিস্তান হয়ে যায় তবে সেখানে বড়ো হিন্দু ব্যবসায়ীদের অনুপস্থিতিতে ইস্পাহানিরা ও মুসলমান বড়ো ব্যবসায়ীরা একচ্ছত্র ব্যবসায়িক আধিপত্য বজায় রাখার সুযোগ পাবে, সেই সম্ভাবনাতেই তারা জিন্নাভক্ত হয়েছিল বলা যায়। তারা খুব একটা ব্রিটিশবিরোধীও ছিল না। তাই তাদের পত্রিকা স্টার অব ইন্ডিয়া-তেও এই নীতি ও মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছিল। ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে এ ধরনের কোনো অস্থিতিশীল পরিবেশের তারা বিরোধী ছিল। তবে যে কোনো অবস্থায় রাজনীতিতে তারা জিন্নার পক্ষাবলম্বনের নীতি মেনে চলেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অবশ্য তারা তাদের পত্রিকা পাকিস্তানে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়নি। আবুল হাশিমও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অনেকটা সময় তাঁর জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান। ফলে মিল্লাতেরও পাকিস্তানে আসার প্রশ্ন ওঠেনি।

মর্নিং নিউজ ছিল মূলত অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি। ঢাকার নওয়াব পরিবার মূলত কাশ্মির থেকে এ দেশে এসেছিলেন বলে দাবি করেন। কাজেই নওয়াব পরিবারের খাজারা নিজেদের বাঙালি বলে মনে করতেন না। সেই খাজা পরিবারেরই পত্রিকা ছিল মর্নিং নিউজ। খাজা নাজিমউদ্দিনের শ্যালক খাজা নূরউদ্দিন ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। ঢাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে (উদাহরণস্বরূপ বরিশালে) খাজাদের জমিদারি থাকলেও তারা সবসময়ই অবাঙালি স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছিল। কলকাতার অবাঙালি মুসলমানদের একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ছিল, মর্নিং নিউজ মূলত সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থের ধারক-বাহক ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় মর্নিং নিউজ সহজেই সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ঢাকায় স্থানান্তরিত হতে পেরেছিল। মর্নিং নিউজ সম্পাদকের জন্য তখন ঢাকায় বিরাট সরকারি বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল। অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার নীতি মর্নিং নিউজ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বপর্যন্ত যথারীতি বজায় রেখেছিল।

আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র, যা একসময় পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ (পরে পূর্ব পাকিস্তান) প্রদেশ ছিল, তারই জন্মলগ্নের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার মিথস্ক্রিয়ার কালটিকেই আমি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। আমার সাফল্য-ব্যর্থতা পুরোটাই আজকের পাঠক-শ্রোতাদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(সূত্র: স্মারক বক্তৃতা, সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড, আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান- ২০১৭)

লেখক: অনারারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢা.বি.

সোহরাওয়ার্দী মুজিব সম্পর্ক

কতিপয় খণ্ডচিত্র (১৯৩৮-১৯৪৯)

প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশাপাশি আর যে ক'জন রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে তাঁরা হলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ইতিহাসের যে প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব রাজনীতির মাঠে পদচারণা করেন, উক্ত চার রাজনৈতিক ব্যক্তিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো পথ তাঁর ছিল না। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, সেসময় শেখ মুজিব একজন তরুণ ছাত্রনেতা। সেসময় এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বেই তাঁকে চলতে হয়েছে। তবে শেখ মুজিবের আদর্শ নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তুলনামূলকভাবে তাঁকে বঙ্গবন্ধু বেশি শ্রদ্ধা করতেন। বলা যেতে পারে একসময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে শেখ মুজিব তাঁর 'রাজনৈতিক গুরু' হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন– 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা। কেমন করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হল, কেমন করে তাঁর সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম, কিভাবে তিনি আমাকে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১)

> *সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে শেখ মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৩৮ সালে। তখন শেখ মুজিবের বয়স ১৮ বছরের মতো হবে। সেসময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে শেখ মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৩৮ সালে। তখন শেখ মুজিবের বয়স ১৮ বছরের মতো হবে। সেসময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে এক্সিবিশন উপলক্ষে দুই মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলার দুই বড়ো মাপের

নেতা গোপালগঞ্জে আসবেন, তা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন দেখা দেয়। শেখ মুজিব তখন স্কুলের ছাত্র। অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছাত্রদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিব। সেসময় দেশব্যাপী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে নানা রকম দ্বন্দ্ব চলছিল। এর ফলে এক্সিবিশন ভণ্ডুল করার ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। হক সাহেব এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেব সভাস্থলে আসেন। তাঁরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এক্সিবিশন উদ্বোধন করেন।

এক্সিবিশন উদ্বোধন শেষে ফজলুল হক পাবলিক হল পরিদর্শনে যান, অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব পরিদর্শন করতে যান মিশন স্কুল। শেখ মুজিব তখন মিশন স্কুলের ছাত্র। ছাত্রদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সংবর্ধনা জানানোর সুযোগ পান। স্কুল পরিদর্শন শেষে সোহরাওয়ার্দী যখন হাঁটতে হাঁটতে লঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন, শেখ মুজিবও তাঁর সাথে সাথে হাঁটতে থাকেন। শেখ মুজিবের ভাষায়– 'তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছিলেন।' আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাম এবং বাড়ি কোথায়। একজন সরকারি কর্মচারী আমার বংশের কথা বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে। আদর করলেন এবং বললেন, 'তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই? বললাম, 'কোন প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম ছাত্রলীগও নাই।' তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পর আমি একটা চিঠি পেলাম, 'তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করি। আমিও তাঁর চিঠির উত্তর দিলাম। এইভাবে মাঝে মাঝে চিঠিও দিতাম।' সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে তরুণ শেখ মুজিবের যেভাবে পরিচয়পর্বটি হয়, তার মধ্যে খানিকটা নাটকীয়তা আছে এবং ঘটনাটি অসাধারণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা যায়।

১৯৩৯ সালে শেখ মুজিব একবার কলকাতায় বেড়াতে যান। বেড়াতে গিয়ে তিনি সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় দেশের রাজনীতি নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সাথে কিছু কথাবার্তা হয়। সোহরাওয়ার্দী তাঁকে রাজনীতিতে উৎসাহিত করেছিলেন।

১৯৪১ সালে অসুস্থ শরীর নিয়ে শেখ মুজিব ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে, থাকতেন বেকার হোস্টেলে। সোহরাওয়ার্দীর সাথে মাঝে মাঝে তিনি দেখা করতেন, উপদেশ নিতেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের কাছে শেখ মুজিব বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর জনপ্রিয়তার খবরে আনন্দ অনুভব করতেন।

১৯৪৩ সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোক অনাহারে মারা যায়। এই সময় শেখ মুজিবকে প্রাদেশিক মুসলিম কাউন্সিলের সদস্য করা হয়। আবুল হাশিম মুসলিম লীগের সম্পাদক হন। তিনি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মনোনীত ছিলেন। এর পূর্বে সোহরাওয়ার্দী সাহেবই মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন যখন প্রধানমন্ত্রী হন, সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী করা হয়। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শেখ মুজিব কয়েকজন ছাত্রকে সাথে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে গিয়ে বলেছিলেন– 'কিছুতেই জনসাধারণকে বাঁচাতে পারবেন না, মিছামিছি বদনাম নেবেন।' তিনি বললেন, দেখি চেষ্টা করে কিছু করা যায় কিনা, কিছু লোক তো বাঁচাতে চেষ্টা করব।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৭)

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নেয়ার পর গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা করার হুকুম দিলেন। দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ অবস্থার কথা জানালেন এবং সাহায্য দিতে বললেন। চাল, আটা, গম বজরায় করে আনতে শুরু করলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নির্দেশ ছিল কোনো মানুষ যেন না খেয়ে মারা না যায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নির্দেশ শেখ মুজিব কতখানি সততার সাথে পালন করেছেন, শেখ মুজিবের লেখা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, 'আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসায় এবং আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনদিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৮)

দুর্ভিক্ষে সমগ্র দক্ষিণ বাংলার মানুষ অতি কষ্টে দিনযাপন করছিল। তাঁদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে গোপালগঞ্জে আনার কথা ভাবা হয়। দক্ষিণ বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে কোনো কনফারেন্স হয়নি। একটি কনফারেন্স ডেকে সেখানে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং অন্যান্য বড় মাপের নেতাদের আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কনফারেন্সের নামকরণ হয় 'দক্ষিণ বাংলা পাকিস্তান কনফারেন্স।' উক্ত কনফারেন্স কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব শেখ মুজিবকেই পালন করতে হয়েছিল। নানারকম প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সেই সময় দিল্লিতে একটি জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় কনফারেন্সে উপস্থিত থাকতে পারেননি বটে, তবে অন্য নেতারা যেন কনফারেন্সে উপস্থিত থাকেন, সে ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী সাহেব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন, ফলে কনফারেন্সটি সফলতা লাভ করে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্ক গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ হলেও মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের সংঘাত দু'জনার মধ্যে লক্ষ করা গেছে। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

কলকাতায় যেসব ছাত্রকর্মী ছিল তাঁরা সবাই মূলত সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশেম সাহেবের ভক্ত ছিলেন। তবে ছাত্রদের মধ্যে কিছুটা বিভেদ ছিল। শেখ মুজিব ছাত্রনেতা আনোয়ার সাহেবকে পছন্দ করতেন না। কোনো এক কমিটি গঠন নিয়ে আনোয়ার সাহেবের সাথে শেখ মুজিবের মতপার্থক্য দেখা দেয়। সোহরাওয়ার্দী নেতাদের ডাকেন তাঁদের গোলমাল মিটমাট করার জন্য। সোহরাওয়ার্দী ছাত্রনেতা আনোয়ার কমিটিতে রাখতে চান। শেখ মুজিব তাতে ঘোরতর আপত্তি জানান। একপর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে শেখ মুজিবের কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। কথা কাটাকাটির সময় হঠাৎ করে সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে বলে ফেলেন– 'Who are you? You are nobody' উত্তরে শেখ মুজিব বলেন– 'If I am nobody them why you have invited me, you have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you Sir. I will never come to you again' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৯) কথাগুলো বলে চিৎকার করতে করতে শেখ মুজিব বৈঠক ত্যাগ করে বাইরে চলে আসেন। সোহরাওয়ার্দী বুঝতে পারেন এত শক্ত কথা বলা তাঁর ঠিক হয়নি। অতি দ্রুত ছাত্রনেতা নুরুল হুদাকে সোহরাওয়ার্দী নির্দেশ দেন, 'শেখ মুজিবকে ধরে ফিরিয়ে আনো।' সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নির্দেশমতো হুদা সাহেব দৌড়ে এসে শেখ মুজিবকে ধরে ফেলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও দোতলা থেকে শেখ মুজিবকে ফিরে আসতে বলেন। হুদা সাহেব অনেক চেষ্টা চালিয়ে উত্তেজিত শেখ মুজিবকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে নিয়ে আসেন। কাছে এলে সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'যাও তোমরা ইলেকশন করো, দেখ নিজেদের মধ্যে গোলমাল করো না।' এরপর সোহরাওয়ার্দী আদর করে শেখ মুজিবকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি বোকা, আমি তো আর কাউকেই একথা বলি নাই, তোমাকে বেশি আদর ও স্নেহ করি বলে তোমাকেই বলেছি।' শেখ মুজিবের ভাষায়– 'তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি যে সত্যিই আমাকে ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত। ... সেই দিন থেকে আমার জীবনে প্রত্যেকটা দিনই তাঁর স্নেহ পেয়েছি। এই দীর্ঘদিন আমাকে তাঁর কাছ থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে নাই এবং তাঁর স্নেহ থেকে কেউই আমাকে বঞ্চিত করতে পারে নাই।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৯)

বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ফলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মন্ত্রিত্ব চলে যায়। মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পর তিনি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানটিকে অধিক শক্তিশালী করার দিকে মন দেন। এই সময় কংগ্রেস 'ভারত ত্যাগ কর' আন্দোলন তীব্রতর করে তোলে। পাশাপাশি সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন।

এই পর্যায়ে একদিন এ কে ফজলুল হক ইসলামিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধিকে তার বাসায় দাওয়াত করেন। হক সাহেবের সাথে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের তখন রাজনৈতিক মতবিরোধ চলছিল। হক সাহেবের বাসায় দাওয়াত খেতে গেলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বিষয়টিকে কিভাবে নেবেন, এ বিষয়ে দাওয়াতপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শেখ মুজিবের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল হক সাহেবের বাসায় দাওয়াত খেতে গেলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব কিছু মনে করবেন না, কারণ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মন অনেক বড়। সেই বিশ্বাস থেকে শেখ মুজিব দাওয়াত নেয়ার ব্যাপারে ছাত্রনেতাদের বলেছিলেন 'কেন যাব না, নিশ্চয়ই যাব, হক সাহেবকে অনুরোধ করবো মুসলিম লীগে ফিরে আসতে।' হক সাহেবের বাসায় দাওয়াত খাওয়ার খবরটি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কানে পৌঁছে যায়। শেখ মুজিবের ভাষায়– 'কয়েকদিন পরে যখন আমি শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তিনি

হাসতে হাসতে বললেন, "কি হে, আজকাল খুব হক সাহেবের বাড়িতে যাও, খানা-পিনা কর?' বললাম- 'একবার গিয়েছি জীবনে।' তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, "ভালই করেছ, তিনি যখন ডেকেছেন, কেন যাবে না?" আরও বললাম, 'আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছি মুসলিম লীগে আসতে।' সোহরাওয়ার্দী সাহেব মন্তব্য করেছিলেন– 'ভালোই তো হত যদি তিনি আসতেন। কিন্তু আসবেন না, আর আসতে দিবেও না। তাঁর সাথে কয়েকজন লোক আছে, তিনি আসলে সেই লোকগুলির জায়গা হবে না কোথাও। তাই তাঁকে তারা মুসলিম লীগের বাইরে রাখতে চেষ্টা করছে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৩৬-৩৭)

সোহরাওয়ার্দী সাহেব কতটা উদার ছিলেন তার উদাহরণ, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কলকাতার দুইটা সিট থেকে সোহরাওয়ার্দী এমএলএ নির্বাচিত হন। অপরদিকে নাজিমুদ্দিন সাহেব পটুয়াখালী থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন। নাজিমুদ্দিন সাহেবের রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম দেখা দেয়। নাজিমুদ্দিন সাহেবের এই বিপদের মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। শেখ মুজিবের বক্তব্য থেকে জানা যায়– 'শহীদ সাহেব হক সাহেবকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, আমি নাজিমুদ্দিন সাহেবকে কলকাতা থেকে বাই ইলেকশনে পাস করিয়ে নেব। যদি হক সাহেব পারেন, তাঁর প্রতিনিধি দিয়ে মোকাবিলা করতে পারেন। হক সাহেবও
লোক

> *সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় তাঁর সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ স্থাপনে শেখ মুজিবের সমস্যা হয়। সোহরাওয়ার্দী পাশে না থাকায় শেখ মুজিব খানিকটা অসহায় বোধ করতে থাকেন*

দাঁড় করিয়েছিলেন নাজিমুদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে। নাজিমুদ্দিন সাহেবই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন শহীদ সাহেবের দয়ায়।' পরবর্তীকালে নাজিমুদ্দিন সাহেব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের উদারতার মূল্য দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৪২)

শেখ মুজিব বয়সে তরুণ হলেও সোহরাওয়ার্দী তাঁকে কতটা গুরুত্ব দিতেন, এখানে তার একটি উদাহরণ তুলে ধরা যায়। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন হবে। সেখানে নয়জন সদস্য থাকবে। তার মধ্যে নির্বাচিত সদস্য থাকবেন পাঁচজন। অপর চারজন থাকবেন পদাধিকার বলে। পাঁচজন সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দী একটু নমনীয় হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, 'এখন পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম, গোলমাল করে কি হবে, একটা আপোস হওয়াই ভাল।' সোহরাওয়ার্দী সাহেবের আপোস প্রস্তাবের বিরোধী শেখ মুজিব পার্লামেন্ট বোর্ড সভায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে বলেছিলেন– 'আপস করার কোন অধিকার আপনার নাই। আমরা খাজাদের সাথে আপোস করব না। কারণ ১৯৪২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের ভাইকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আবার তাঁর বংশের থেকে এগারোজনকে এমএলএ বানিয়েছিলেন। এদেশে তারা ছাড়া আর লোক ছিল না? মুসলিম লীগে কোটারি করতে আমরা দিব না।' (পৃ. ৪২)

সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবের কথাগুলো উপলব্ধির চেষ্টা করেন। সভা থেকে উঠে এসে তিনি তাঁর বাসায় শেখ মুজিব এবং তার অনুসারীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। শেখ মুজিবের ভাষায়– তিনি আমাদের নিয়ে বসলেন। আমি তাঁর কাছেই বসলাম। শহীদ সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছি না তোমরা পাঁচটা সিটই দখল করতে পারবে কি না।' আমি বললাম, 'স্যার, বিশ্বাস করেন, আমরা নিশ্চয়ই জিতব, খোদার মর্জি থাকলে আমাদের পরাজিত হবার কোন কারণ নাই।' আমি টেলিফোন তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'বলে দেন খাজা সাহেবকে– ইলেকশন হবে।' শহীদ সাহেব নাজিমুদ্দিন সাহেবকে টেলিফোন করে বললেন, 'ইলেকশনই হবে। যাই হোক না কেন, ইলেকশনের মাধ্যমেই হবে।' এই ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় শেখ মুজিব বয়সে তরুণ হলেও সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁকে কতটা গুরুত্ব দিতেন। নির্বাচনে সত্যি সত্যি সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং হাশিম সাহেব মনোনীত পাঁচজন প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৪৩)

১৯৪৫-'৪৬ সালে ভারতের রাজনীতিতে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের দ্বন্দ্ব, ব্রিটিশদের নানা কলাকৌশলের ফলে দেশে নানা অরাজকতা দেখা দেয়। বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। সোহরাওয়ার্দী তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা থামানোর তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় ছুটে গেছেন। এতে হয়তো অনেক জীবনরক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হয়, তা দূর করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যে কারণে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুসলমানরা তাঁদের প্রিয় বাসভূমি ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে থাকেন, অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় ব্যাপক হারে আশ্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। সোহরাওয়ার্দী তাঁর সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং দেশত্যাগ ঠেকাতে পারেননি। শেখ মুজিব এই দুঃসময়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পাশে থেকে তাঁকে নানাভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সাথে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের এমন বিপর্যয় ঘটবে, সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং শেখ মুজিব তা আদৌ ভাবতে পারেননি। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী, সে কারণে তাঁকে উদ্বাস্তু হতে হয়নি; কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সাহেবের উদ্বাস্তু হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, কারণ তাঁর মূল বাসভূমি পাকিস্তানের কোনো অংশেই ছিল না। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ভারতে একা ফেলে রেখে আসতে শেখ মুজিবের মন সায় দেয়নি। শেখ মুজিবের ভাষায়– 'তাঁকে রেখে চলে আসতে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল।' ... শহীদ সাহেবকে বললাম– 'চলুন স্যার পাকিস্তানে, এখানে থেকে কি করবেন? তিনি বললেন, 'যেতে তো হবেই, তবে এখন এই হতভাগ্য মুসলমানদের জন্য কিছু একটা না করে যাই কি করে? দেখ না, সমস্ত ভারতবর্ষে কি অবস্থা হয়েছে, চারদিকে শুধু দাঙ্গা আর দাঙ্গা। সমস্ত নেতা চলে গেছে, আমি চলে গেলে এদের আর উপায় নেই। তোমরা একটা কাজ কর, দেশে গিয়ে সাম্প্রদায়িক গোলমাল যাতে না হয়, তার চেষ্টা কর। ... পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দিও না।' (পৃ. ৮২)

শেখ মুজিব দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকায় এসে যখন ঘোষণা দেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন ছাত্রদের কাছ থেকে প্রচণ্ড আপত্তি উত্থাপিত হয়। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। শেখ মুজিব ছিলেন সেই ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কারারুদ্ধ হন। তবে ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনের কারণে তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পান।

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মারা যান। খাজা নাজিমউদ্দিনকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয় নূরুল আমিন সাহেবকে। শুরু হয় ষড়যন্ত্রের রাজনীতি।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভারতে অবস্থান মোটেই সম্মানজনক ছিল না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর এক ভাইয়ের কাছে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবের ভাষায়– 'সোহরাওয়ার্দী সাহেব সামান্য কিছু কাপড় ছাড়া আর কিছু নিয়ে আসতে পারেন নাই। ভারত সরকার তাঁর সর্বস্ব ক্রোক

করে রেখেছে। অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন, শহীদ সাহেবের কলকাতায় নিজের বাড়ি ছিল না। ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ি, ভাড়া করা বাড়ি। তিনি করাচিতে তাঁর ভাইয়ের কাছে উঠলেন, কারণ তার খাবার পয়সাও ছিল না।' (পৃ. ১২৯) লিয়াকত আলী খান সোহরাওয়ার্দী সাহেবের করাচি আসার ঘটনাটি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। 'ভারত কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে', এমন কথা বলতেও লিয়াকত আলী খান কুণ্ঠাবোধ করেননি। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানে নাজিমউদ্দিন এবং নূরুল আমিন তাঁদের নিজেদের স্বার্থে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে উপেক্ষা করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী করাচিতে ওকালতি শুরু করেন।

সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় তাঁর সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ স্থাপনে শেখ মুজিবের সমস্যা হয়। সোহরাওয়ার্দী পাশে না থাকায় শেখ মুজিব খানিকটা অসহায় বোধ করতে থাকেন। এর মধ্যে মওলানা ভাসানী আসাম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছেন। মওলানা ভাসানীর সাথে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৯৪৮ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু হয় মুসলিম ছাত্রলীগের। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক করা হয় শামসুল হক এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক করা হয় শেখ মুজিবকে। সেসময় শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন।

শেখ মুজিব একপর্যায়ে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর উপলব্ধি করতে পারেন আওয়ামী লীগে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্ব অপরিহার্য। মওলানা ভাসানীও এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের সাথে একমত হন। এই পর্যায়ে মওলানা ভাসানী সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং মিয়া ইফতিখার উদ্দীন সাহেবের সাথে পরামর্শের জন্য শেখ মুজিবকে লাহোর যেতে বলেন।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নানা রকম মামলা চাপানো হয়। যে কোনো মুহূর্তে আবার

> *সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে শুধু নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়নি, ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিপরীতে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়, সেই যুক্তফ্রন্টেরও অন্যতম নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*

গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন। কাজেই বিলম্ব না করে অনেক কষ্টে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর পরামর্শে লাহোর চলে যান। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন নবাব মাসদোতের বাড়িতে থেকে তাঁর একটি মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছিলেন। শেখ মুজিবের ভাষায়– 'ভীষণ শীত। বেলা এগারোটার সময় নবাব সাহেবের বাড়িতে পৌঁছালাম। শহীদ সাহেব লনে বসে কয়েকজন এডভোকেটের সাথে মামলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমি কাছে যেয়ে সালাম করতেই তিনি উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে এসেছ? তোমার শরীর তো খুব খারাপ, কোথায় আছো?' আমাকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলকে বিদায় করে দিয়ে আমাকে নিয়ে বসলেন। প্রত্যেক কর্মী ও নেতাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। পূর্ব বাংলার অবস্থা কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাও জিজ্ঞাসা করলেন। বাংলাকে তিনি যে কতটা ভালোবাসতেন তাঁর সাথে না মিশলে কেউ বুঝতে পারতো না।' ... শহীদ সাহেব আমাকে নিয়ে দোকানে গেলেন। তিনি নিজের কাপড় বানানোর হুকুম দিয়ে একটা ভালো কম্বল, একটা গরম সোয়েটার, কিছু মোজা ও মাফলার কিনে নিলেন এবং বললেন, কোন কাপড় লাগবে কি না।... বললাম, না আমার কিছু লাগবে না। তিনি আমাকে যখন গাড়িতে নিয়ে হোটেলে পৌঁছাতে আসলেন, জিনিসগুলো দিয়ে বললেন, 'এগুলো তোমার জন্যই কিনেছি। আরও কিছু দরকার হলে আমাকে বোলো।' গরম ফুল হাতার সোয়েটার ও কম্বলটা পেয়ে আমার জানটা বাঁচল। কারণ, শীতে আমার অবস্থা কাহিল হতে চলেছিল।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৩৭-৩৮)

মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন শুধু পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম গঠন করলে সে আওয়ামী মুসলিম লীগ যথেষ্ট শক্তিশালী হবে না। প্রয়োজন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা এবং তা করতে হলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্ব অপরিহার্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

একদিকে আর্থিক সংকট, অন্যদিকে রাজনৈতিক বৈরিতা সবকিছু মিলিয়ে সোহরাওয়ার্দী সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। সোহরাওয়ার্দী যেসময় 'জিন্না আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময় শেখ মুজিবের উপস্থিতি সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে খানিকটা পথের দিশা করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করতে হলে 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করা প্রয়োজন, এ বিষয়ে শেখ মুজিবের সাথে সোহরাওয়ার্দী সাহেব একমত হন। তবে কাজটি খুব সহজ নয়। শেখ মুজিবকে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মিয়া ইফতিখার উদ্দীন, পীর মানকী শরীফ, গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোর, কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, সর্দার আবদুল গফুর, সর্দার সেকেন্দার, শামীম জং, পীর সালাহউদ্দিন প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে শেখ মুজিবকে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেন সোহরাওয়ার্দী। পশ্চিম পাকিস্তানে একমাস অবস্থান করে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শেখ মুজিব 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনের ব্যাপারে বেশ খানিকটা সাফল্য অর্জন করেন।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন ঢাকায় গেলেই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হবে। শেখ মুজিবকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু ছেড়ে তাঁকে দিতেই হবে। শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– 'সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্টই হচ্ছিল, কারণ জীবনের বহুদিন তাঁর সাথে ঘুরেছি। তাঁর স্নেহ পেয়েছি এবং তাঁর নেতৃত্বে কাজ করেছি। বাংলাদেশে শহীদ সাহেবের নাম শুনলে লোকে শ্রদ্ধা করত, তাঁর নেতৃত্বে বাংলার লোক পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়েছিল। যাঁর একটা ইঙ্গিতে হাজার হাজার লোক জীবন দিতে দ্বিধা বোধ করতো না, আজ তাঁর কিছুই নাই। মামলা পরিচালনা না করলে তাঁর খাওয়ার পয়সা জুটছে না। কত অসহায় তিনি। ...কতদিনে আবার দেখা হয় কি কবে বলব? তবে একটা ভরসা নিয়ে চলেছি, নেতার নেতৃত্ব আবার পাব। তিনি নীরবে অত্যাচার সহ্য করবেন না, নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করবেন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতি আবার পাবে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৪৪)

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে শুধু নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়নি, ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিপরীতে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়, সেই যুক্তফ্রন্টেরও অন্যতম নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে ১৯৫৪ সালের সে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কাজেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ব্যাপারে শেখ মুজিব যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, তা পূর্ণ হতে বেশি সময় লাগেনি। ঘটনার এমন পারম্পার্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর আত্মিক সম্পর্কেরই বহিঃপ্রকাশ।

লেখক: উপাচার্য, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী

২৫ মার্চ গণহত্যা প্রতিবেদনের পেছনের গল্প ও সায়মন ড্রিং

মো. মিনহাজ উদ্দীন

সাংবাদিক সায়মন ড্রিং যুদ্ধ-সাংবাদিকতায় এক সুপরিচিত নাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বাংলাদেশের পরম বন্ধু। বিশ্বের প্রভাবশালী বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিক, সংবাদ উপস্থাপক ও প্রযোজক হিসেবে তিনি ৩০ বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে ক্র্যাকডাউনের পর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরের হত্যাকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। ডেইলি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়েছিলেন পাকিস্তানি বর্বরতার কথা। যাতে জাগ্রত হয়েছিল বিশ্ববিবেক। টেলিগ্রাফে প্রকাশিত 'Casualties like to be Heavy' প্রতিবেদনে ওঠে এসেছিল ইয়াহিয়া খানের গণহত্যার সার্বিক চিত্র। সায়মন ড্রিং ঢাকার পরিস্থিতির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল ওয়াশিংটন পোস্টও। প্রভাবশালী ওই দৈনিকটি সায়মন ড্রিং-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রকাশ করে 'How Dacca Paid for a United Pakistan' শিরোনামের প্রতিবেদন। যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

> *সাংবাদিক সায়মন ড্রিং যুদ্ধ-সাংবাদিকতায় এক সুপরিচিত নাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বাংলাদেশের পরম বন্ধু*

১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় বাংলাদেশে বেশকিছু দিন অবস্থান করেছিলেন সায়মন। সেই সময়ের সাড়া জাগানো সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট (ডব্লিউএনইডব্লিউ টিভির জন্য) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, তার সমন্বয়ক ছিলেন তিনি। এরপর ইউরোপে নিজ কর্মস্থলে ফিরলেও তাঁর হৃদয়ে ছিল বাংলাদেশ। পরে আবার তিনি বাংলাদেশে আসেন ১৯৯৮ সালে। তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশে আধুনিক সম্প্রচার সাংবাদিকতার সূচনা। সম্প্রচারে আসে একুশে টেলিভিশন (১৪ এপ্রিল, ২০০০)। একুশে টিভি বাংলাদেশের সম্প্রচার সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতিই পাল্টে দেয়। যদিও ২০০২ সালে একুশে টিভি বন্ধ হওয়ার পর সায়মন ড্রিং-এর বাংলাদেশে কাজ করার অনুমতিপত্র বাতিল করা হয়। একপর্যায়ে দেশ থেকে বহিষ্কৃতও হন। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার সায়মন ড্রিংকে ১৯৭১

সালে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা জানায়। এর কিছু পর সম্প্রচারের অপেক্ষায় থাকা 'চ্যানেল টোয়েন্টিফোর'-এ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। এরপর দেড় বছরের বেশি সময় কাজ করেন ২৪ ঘণ্টা সংবাদভিত্তিক আরেকটি টিভি চ্যানেল যমুনা টেলিভিশনে।

যমুনা টেলিভিশনে সায়মন ড্রিং-এর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল লেখকের। অফিসে কাজের ফাঁকে একদিন লেখক তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথা। তাঁর সেই বিখ্যাত প্রতিবেদনের পেছনের কথা। শুনেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর সোনালি স্মৃতির কথা।

১৯৭১ সালে সায়মন 'দ্য টেলিগ্রাফ'-এর যুদ্ধ প্রতিবেদক হিসেবে কম্বোডিয়ায় সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন। দেশটিতে তখন সরকারি বাহিনীর সঙ্গে খেমাররুজদের যুদ্ধ চলছে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে টেলিগ্রাফের সম্পাদক তাঁকে লন্ডন থেকে ফোন করে ঢাকার পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। তাঁর ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় পৌঁছান মার্চের প্রথম সপ্তাহে। ঢাকা তখন সায়মনের কাছে একেবারেই নতুন শহর। নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ, অজানা ভাষা। তবে একটি বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল ছিল। সায়মন অনেক যুদ্ধ কাভার করেছেন। যুদ্ধ-সংঘাতপূর্ববর্তী পরিস্থিতি তিনি ভালো বুঝতেন। ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ কাভার করেন তিনি। বাংলা তখন তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ভাষা। দোভাষীর অভাবে ভাষণের কোনো কিছুই বুঝতে পারেননি। তবে মানুষের আন্দোলন অভিব্যক্তি, উন্মুখ ভাব আর জনস্রোত দেখে তিনি ভালোই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন– এই জাতিকে মিলিটারি শক্তি দিয়ে পদাবনত করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত, বজ্রকণ্ঠের ভাষণ তাঁকে মুগ্ধ করে। ৭ই মার্চের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর কয়েক দফা সাক্ষাৎ হয়। মধ্য মার্চের দিকে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসায় গিয়ে কয়েকবার দেখা করেন। এতে তাঁর রিপোর্টিং করতে সুবিধা হচ্ছিল। ২৫ মার্চ বিকালে সায়মনসহ ঢাকার অন্য বিদেশি সাংবাদিকরা জানতে পারেন ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন। তখন প্রায় ২০০ সাংবাদিক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছিলেন। তাদের সবার মধ্যেই গুঞ্জন– আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। ইয়াহিয়া হয়তো সামরিক আইনের নির্দেশ দিয়েছেন। বিকালেই তারা ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পারেন। সায়মন তখন পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন 'chips are down' (খুব খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে)। হয়তো তা আজ রাতেই (২৫ মার্চ ১৯৭১)।

সায়মনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেমন ছিল ওই রাতে পরিস্থিতি। তিনি জানান, সন্ধ্যার দিকেই হোটেলের পাশে সৈন্যদের দেখা যায়। পরিবেশটা এমন, যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটতে পারে। সায়মন ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাদের একটা বহর (কলাম) বের হতে দেখেন। সে সময় কাউকে হোটেল থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছিল না। হোটেলে প্রচুর পুলিশ ও সেনা। ভেসে আসছে গুলির শব্দ। তখন তারা নিশ্চিত হন যে সেনারা মুভ করছে। সময় আনুমানিক রাত ১১টার দিকে চারদিকে প্রচণ্ড গুলির শব্দ। শেলিং। এই শব্দ আসছিল মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে। এর কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধাস্ত্রের গর্জন। এ শব্দ রাজারবাগ এলাকার। ঢাকার সড়কগুলো তখন ফাঁকা। চারদিকে শুধুই গুলির শব্দ।

সারারাত হোটেলের ছাদ থেকে সায়মনরা ছবি তুলেছিলেন। ভিডিওগ্রাফাররা শুটিং করছিল। এদিকে ওই দিন সন্ধ্যার পরই শেখ মুজিবের বাসায় ফোন করেন সায়মন। জানতে চেষ্টা করেন বঙ্গবন্ধু কী করতে যাচ্ছেন। মুজিবের প্রেস সেক্রেটারি বাদশার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। বাদশা জানান, শেখ মুজিব বাসাতেই থাকবেন। এরপর মধ্যরাতে আবার শেখ মুজিবের বাসায় ফোন করেন সায়মন। তখন ফোনটি বিকল (ডেড) ছিল।

যদ্দূর জানা যায়, ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর সব বিদেশি সংবাদিককে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়। মেজর সিদ্দিক সালিক এতে মূল ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এত কড়াকড়ির মধ্যে কীভাবে সায়মন রিপোর্টিংয়ের কাজ করলেন? তিনি বলেন, মেজর সিদ্দিক সালিক গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার ছিলেন। সামরিক সরকারের প্রেস লিয়াজোঁ অফিসার। সালিক হোটেলে আসেন। কড়া কড়া কথা শোনান। তখন এক বন্ধু আমাকে বলল, আমাদের চলে যেতে বলা হচ্ছে। তা শুনে খুব অবাক হই। আমার বন্ধু বলে, আমাদের ব্যাগ গোছাতে বলা হয়েছে। কাল কারফিউ তুলে নেয়া হবে। তখন ঢাকা ত্যাগ করতে হবে। এতে আমি খুবই রাগান্বিত হই। ঢাকায় আমার প্রচুর বাংলাদেশি বন্ধু আছে। আমি তাদের খোঁজখবর নিতে চেয়েছিলাম। ২৫ মার্চ রাতে তাদের কী পরিণতি ঘটেছে, তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম। তখন আমি মেজর সিদ্দিক সালিকের কাছে যাই। তাকে জিজ্ঞাসা করি, মেজর কী হচ্ছে? আমাদের কি চলে যেতে হবে। তিনি তখন বললেন, 'না তো। যাদের ইচ্ছা তারা যাবে। আর যারা থাকতে চায়, তারা থাকবে। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি– যদি আমি থাকতে চাই, তাহলে কোনো সমস্যা আছে কি? তিনি বলেন, না না, কোনো সমস্যা নেই! কিন্তু চতুর সিদ্দিক উল্লেখ করেন, 'এটা একটা গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি। এখানে থাকাটা খুবই ভয়ংকর। আমরা তোমাদের নিরাপত্তার কথাই ভাবছি। তোমাদের এখানে থাকাটা মনে হয় নিরাপদ নয়।' এরপর আমি তাদের সামনেই আমার কক্ষে যাই। এমন ভাব করি যেন আমি ঢাকা ত্যাগ করতে চাই। ব্যাগ গোছাই। তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে আমি সেই বাস মিস করি। পরে পরিকল্পনা করি কোথাও লুকিয়ে থাকার। প্রথমে হোটেলের ছাদে যাই। সেখানে এয়ারকন্ডিশনের জন্য বড়ো একটা রুম ছিল। ওটার পেছনে লুকাই। সেখানে কয়েক ঘণ্টা থাকি। তখন একটা মিলিটারি ট্রাক হোটেলে আসে।

পাকিস্তানিরা একটা ভুল করেছিল। তারা সাংবাদিকদের গণনা করেনি। আমি ছাদ থেকে দেখলাম, আমার সব সহকর্মীকে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। রাত ৯টার দিকে ট্রাকগুলো চলে যায়। কেউ আমার খোঁজ করেনি। আমি ছাদে এক ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করি। এরপর সতর্কতার সঙ্গে ফ্লোর হয়ে হোটেল লবিতে নেমে আসি। লবি ম্যানেজার আতঙ্কিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি এখানে রয়ে গেছ? তখন আমি জানতে পারি, আরও একজন এখানে রয়ে গেছেন। একজন ফ্রেঞ্চ ফটোগ্রাফার। এপি'র ফটোগ্রাফার মিশেল লরেন্ট (Michel Laurent)। দোতলার একটা কক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। মনে মনে খুশিই হই। ভাবী একজন রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার মিলে ভালো কাজ করা যাবে।

ওই সময় হোটেলের বাঙালি স্টাফরা খুবই সহযোগিতা করেছিল। সায়মন তাদের প্রথম পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মনে করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা সায়মন ও মিশেলকে লুকিয়ে রেখেছিল, রক্ষা করেছিল। তারা সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা করে কীভাবে স্থান পরিবর্তন করে করে লুকিয়ে রাখা যায়।

সায়মনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম ওই প্রতিবেদন তৈরির কাজ সম্পর্কে। তিনি বলেন, মিশেলকে সঙ্গে নিয়ে একটা গাড়িতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা হই। ওয়েস্টার্ন পোশাক বাদ দিয়ে পরেছিলাম সাদা পাঞ্জাবি। মিশেলও পাঞ্জাবি পরে। রাজারবাগ-ধানমন্ডি আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গেলাম। এরপর পুরান ঢাকা। বিশ্ববিদ্যালয় ঢুকে হেঁটেই জগন্নাথ হলে যাই। হলের দোতলায় বেশকিছু মরদেহ পড়ে ছিল। সেগুলোর মধ্যে এক যুবকের মরদেহের প্রতি দৃষ্টি আটকে যায়। সে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। শরীরের নিচ দিয়ে শুকনো রক্তের ধারা। একটা পেইন্টিংয়ের মতো দেখাচ্ছিল। এরপর ওখান থেকে বের হয়ে আসি। চলে আসি ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারি, এই জায়গা থেকে জগন্নাথ হলে শেলিং করা হয়েছে। সেখানে একটা কোয়ার্টারে এক শিক্ষক দম্পতিকেও হত্যা করা হয়। সবকিছু দেখে মনে হলো, ঠাণ্ডা মাথায় একধরনের ভয়ংকর গণহত্যা চালানো হয়েছে। সেখান থেকে ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) হয়ে হোটেলের দিকে ফিরছিলাম। তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক টহল দল ওই এলাকা অতিক্রম করছিল। তাদের গাড়িবহরটি বেশ দূর এগিয়েছিল। তবে সেসময় আমার মনে হলো তারা দূরে থাকলেও আমাদের দেখতে পেয়েছে। তারা থামেনি। কিন্তু তাদের অবস্থান আমাকে ভীত করল। তখন থেকেই সমস্যার শুরু।

কী ধরনের সমস্যা? সায়মন বললেন, বিকালে ফিরে এসে জানতে পারি সেনাবাহিনী হোটেলে এসেছিল। তারা পুরো হোটেল তল্লাশি করে। আমার ধারণা, ওই সেনাদল কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একদল বিদেশিকে দেখা গেছে। তারপরই সিদ্দিক সালিকের নির্দেশে তারা হোটেলে আসে। এরপর আপনারা কী করলেন? আমরা ঢাকা থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজছিলাম। আমাদের কাছে প্রচুর স্টোরি আর যথেষ্ট ছবি ছিল। সেগুলো প্রকাশে উদগ্রীব ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা ছাড়তে চেয়েছিলাম দ্রুত। ওই সময় পাকিস্তান এয়ারলাইন্স প্রচুর অতিরিক্ত ফ্লাইট পরিচালনা করছিল। যাত্রী পরিবহনের জন্য পাকিস্তান এয়ারলাইন্স তখন টিকিটের বিপরীতে নম্বর ইস্যু করত। সেই নম্বরের ভিত্তিতেই যাত্রী পরিবহন করা হতো। আমার আর মিশেলের টিকিট ছিল, কিন্তু নম্বর ছিল না। তখন হোটেলে থাকা দুইজন জার্মান দুটি নম্বর দেন। আমি আর মিশেল পরিকল্পনা করলাম কীভাবে ক্যামেরার ফিল্ম আর নোটগুলো অক্ষত রাখা যায়। একবার ব্রিটিশ হাইকমিশনে গেলাম; কিন্তু তারা কোনো সহযোগিতা করেনি। টিপিক্যাল ব্রিটিশদের মতো আচরণ করে দূতাবাস কর্মকর্তা কর্কশভাবে

জানায়, কোনোভাবেই সহযোগিতা করা যাবে না। তবে জার্মান দূতাবাস সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল। তারা ডিপ্লোমেটিক ট্যাগ লাগিয়ে আমাদের ফিল্মগুলো পাঠাতে সম্মত হয়। আমি আর মিশেল অর্ধেক ফিল্ম (৯ রোল ছবি) জার্মান হাইকমিশনে দিয়ে আসি। জার্মান হাইকমিশন জানায়, বন-এ পৌঁছার পর এপি'কে ফোন করা হবে। তারা এসে ফিল্মগুলো নিয়ে যাবে। কিন্তু সেই ছবিগুলো আর পাওয়া যায়নি। বন-এর এপি অফিসে কেউ ফোন করেনি। ওই ছবিগুলোয় গণহত্যার দালিলিক প্রমাণ ছিল, যা চিরতরে হারিয়ে যায়।

বিমানবন্দরে সায়মন ও মিশেলের অভিজ্ঞতা ছিল বেশ ভয়াবহ। সায়মন জানান, বিমানবন্দরে সত্যিই খুব নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বিমানবন্দরে দায়িত্বে ছিলেন বিমানবাহিনীর সদস্যরা। তারা আমাদের চিনতে পারেনি। আমি আর মিশেল আলাদাভাবে কাস্টমসে যাই। যাতে তারা আমাদের চিনতে না পারে। শুল্ক বিভাগে সব ব্যাগ পরীক্ষা করা হচ্ছিল। ব্যাগ খুলে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে। তারা পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের কিছু মানচিত্র পায়। সন্দেহ করতে শুরু করে। চলতে থাকে জেরা। মনে হলো আমি সত্যিই বিপদে পড়তে যাচ্ছি। তবে কিছু বই সে যাত্রায় রক্ষা করে। ব্যাগে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ সংক্রান্ত কিছু বই ছিল। সায়মন বলেন, পর্যটক হিসেবে বাংলাদেশ ঘুরতে এসেছি। এতে দায়িত্বরত কর্মকর্তা আশ্বস্ত হন। সে যাত্রায় তারা বেঁচে যান। মোজা আর টুথপেস্ট নিয়ে ইমিগ্রেশন পার হন। যাতে ছিল ছবি আর রিপোর্ট তৈরির নোট।

সেই সময় বিমান চলাচল করত কলম্বো হয়ে। সেখানে কী সমস্যায় পড়লেন? সায়মন উল্লেখ করেন, তখন ঢাকা থেকে প্লেনগুলো করাচি হয়ে চলত। ভারতের আকাশসীমায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্লেনগুলো চলত ঢাকা-কলম্বো-করাচি রুটে। সায়মন ঢাকা থেকে সিলন্ (বর্তমান শ্রীলংকা) পৌঁছান। সেখানে এক ঘণ্টার ট্রানজিট। বিমানবন্দরে নেমেই সায়মন কলম্বোর ব্রিটিশ হাইকমিশনে ফোন করেন। কামনা করেন রাজনৈতিক আশ্রয় কিন্তু হাইকমিশন থেকে জানানো হয়, দুঃখিত! কোনোভাবেই সাহায্য করা সম্ভব নয়। টিপিক্যাল ব্রিটিশ বিহেভিয়ার! সায়মন উঠে পড়েন করাচিগামী প্লেনে।

করাচিতে গিয়ে কী ঘটল? সাইমন ড্রিং বলেন, ওখানে সব লাগেজ খুলে চেক করা হলো। সেখানকার অফিসার সাংবাদিক বলে সন্দেহ করে। কিন্তু দৃশ্যমান কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় সে সায়মনকে আটকাতে পারেনি। এরপর আরেকটি কক্ষে যেতে বলা হয় শরীর তল্লাশির জন্য। ওই কক্ষে তাঁকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হয়। তবে সায়মন মোজা খোলেন কৌশলে। যাতে নোটগুলো মোজার ভেতরেই থাকে। অন্যদিকে মিশেলকেও একইভাবে তল্লাশি করা হচ্ছিল। তাকেও বিবস্ত্র করা হয়। মিশেলের জন্য পরিস্থিতিটা একটু বেশিই খারাপ ছিল। কারণ ওর কাছে ক্যামেরা ছিল। সায়মন ফিল্মগুলো লুকাতে পারলেও মিশেলের পক্ষে ক্যামেরাগুলো লুকানো সম্ভব ছিল না। সায়মনের ধারণা সিদ্দিক সালিক তাদের ব্যাপারে জানতে পেরেছিল। তাই সে কোনো একটা মেসেজ পাঠায় করাচিতে। যার ভিত্তিতে সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ের চেক-আপ চলছিল। ওই কক্ষে তল্লাশির একপর্যায়ে সায়মনের পায়ুপথও পরীক্ষা করা হয়। তারপর মুক্তি মেলে। প্লেন ওড়ে আকাশে।

প্লেনে বসেই জুতার ভেতর থেকে নোটগুলো বের করেন সায়মন। সেগুলোর ভিত্তিতে শুরু হয় স্টোরি লেখা। বিমান থেকে নেমেই চলে যান টেলিগ্রাফের ব্যাংকক ব্যুরো অফিসে। সেখানে বসে স্টোরিটা ফাইনাল করেন, যা ৩০ মার্চ টেলিগ্রাফ প্রকাশ করে, যা ছিল বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে বিশ্ব গণমাধ্যমের প্রথম প্রতিবেদন।

এরপর দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে কলকাতা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কে করে আবার ঢাকায় আসেন সায়মন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দেখা করেন সিদ্দিক সালিকের সঙ্গে। ওই সময় এক প্রশ্নের জবাবে সিদ্দিক সালিক সায়মনকে জানান, 'তোমাদের খুঁজে পাওয়া গেলে হয়তো নিশ্চতভাবেই হত্যা করা হতো।' ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফেরেন, তখন ওই খোলা ট্রাকের পেছনে ঝুলে ঝুলে রেসকোর্সে আসেন সায়মন। ওই দিন (১০ জানুয়ারি) ছিল সায়মনের জন্মদিন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁকে জন্মদিনের কেক পাঠিয়েছিলেন। গুণী এই সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোন স্মৃতিটি বেশি মনে পড়ে। সায়মনের উত্তর, 'বিশালদেহী মুজিবের হাতটা বড়ো ছিল। ছিল উষ্ণ, ফ্রেন্ডলি। বঙ্গবন্ধু কয়েকবার তাঁর হাতটি আমার (সায়মনের) কাঁধে রেখেছেন। তাঁর হাতের স্পর্শ আজও অনুভব করি। ভারী, বিশাল হাত। যাতে অন্যকে আপন করে নেওয়ার এক জাদু ছিল।' যা আজও অনুভব করেন সায়মন ড্রিং।

লেখক: *প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

মুক্তিযুদ্ধে দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রের ভূমিকা

বোরহান বিশ্বাস

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বঙ্গাব্দ ৮ই ফাল্গুন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ছিল সেই ফাল্গুনই। '৫২-এর ফেব্রুয়ারিতে ভাষার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিল বাঙালি। ১৯ বছর পর সেই পলাশরাঙা দিনে আবারও জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন। এবার ভাষাকে সমুন্নত রাখার ডাক, স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার ডাক, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার ডাক, মুক্তিযুদ্ধের ডাক। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর জলদগম্ভীর ভাষণে সবই বলে দিয়েছিলেন। দিনটি ছিল রোববার। পরদিন সোমবার বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দৈনিক ইত্তেফাকের ৮ কলাম ব্যানারের শিরোনাম ছিল, 'পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি...। যদি চারটি দাবি মেনে নেওয়া হয়।' শিরোনামের নিচে উল্লেখ করা হয় সেই চার দাবি। ১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, ২. সমস্ত সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া, ৩. নিরস্ত্র গণহত্যার তদন্ত করা, ৪. নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর।

> *১৯৭১ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া কর্তৃক পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী সম্বোধন এবং ভুট্টোর অগণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়*

খবরের মধ্যে আরেকটি শিরোনাম ছিল– 'আজ থেকে আমার নির্দেশ।' খবরের নিচে আট কলামজুড়ে সমাবেশে উপস্থিত লাখো জনতার ছবি। ছবির উপরে ক্যাপশন ছিল– 'এবার বন্দী বুঝেছে মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ, জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব উত্থান।'

তখনকার দিনের আরেকটি প্রধান দৈনিক সংবাদও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আট কলামজুড়ে ছাপে। রিভার্স টাইপে যার শিরোনাম ছিল– 'এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম ঃ মুজিব।' খবরটিতে দুই লাইনের শোল্ডার ছিল এমন– 'সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিলেই পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিব কি না ঠিক করিব।' 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' পরিবেশিত খবরটির সূচনা ছিল বড়ো পয়েন্টে। মূল শিরোনামের নিচে ছিল বঙ্গবন্ধুর ছবি। ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে নির্দেশনা দেন, তা 'মুজিবের নির্দেশ' নামে পৃথক আরেকটি শিরোনামে ছাপা হয়। ভেতরে ছাপা হয় শেখ মুজিবের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ। এই পাতাতেই ছাপা হয় জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ছবি।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পরদিন লন্ডনের 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'পুরাতন পাকিস্তানের ইতি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন। এতে সাংবাদিক ডেভিড লুসাক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের অখণ্ডতা থাকছে না এবং সামরিক জান্তাদের হস্তক্ষেপের ফলে জিন্নাহর সৃষ্ট এই রাষ্ট্রটির মৃত্যু।'

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশি ও বিদেশি সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। দেশীয় গণমাধ্যম একদিকে যেমন রণাঙ্গনে যুদ্ধরতদের মনোবল চাঙ্গা রেখেছে, অন্যদিকে বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্বের সামনে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরেছে।

দেশি গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ

পাকিস্তান শাসনামলে দৈনিক সংবাদ, ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, জনপদ, অবজারভারসহ প্রকাশিত অন্য পত্রিকাগুলো বাঙালির চেতনাকে যেভাবে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ ও বিশাল ঐকমত্য তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল, তা ইতিহাস হয়ে আছে। সেই সময় তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর আহমেদ চৌধুরী, আহমেদুল কবির, আবদুস সালাম, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, রণেশ দাশগুপ্ত, কামাল লোহানী, সন্তোষ গুপ্তসহ নির্ভীক সাংবাদিকদের ভূমিকা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাইলফলক হয়ে আছে। শুধু তা-ই নয়, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন দিতে হয়েছে বেশ কয়েকজন সাংবাদিককেও। একদল সাহসী সাংবাদিক দেশের ভেতরে-বাইরে থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে তখন একাধিক সংবাদপত্র বের করেছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকাগুলোর ওপর পাকিস্তান সরকার খড়্গহস্ত ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তান বাহিনীর মর্টারের গোলায় তিনটি দৈনিক পত্রিকার প্রেস ও অফিস ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলো হলো– দৈনিক সংবাদ, ইত্তেফাক ও দ্য পিপল। পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে দৈনিক সংবাদ পত্রিকাটি একাত্ম থাকায় এর অফিসে প্রায়ই পুলিশের অভিযান পরিচালিত হতো। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বরাবরই এর প্রতি বিরূপ ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পত্রিকাটির প্রেস, মেশিনপত্র, অফিস আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় শহিদ হন সাংবাদিক সাবের। একই রাতে ইত্তেফাক ভবনও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় ইত্তেফাকের প্রকাশনা (পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে) শুরু হতে ওই বছরের ২১ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। (উইকিপিডিয়া)।

১৯৭১ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া কর্তৃক পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী সম্বোধন এবং ভুট্টোর অগণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠী ও পিপিপির আসল চেহারা উন্মোচন হলে সরকার প্রেস সেন্সরশিপ ও প্রেস অ্যাডভাইজ আরোপ করে। সামরিক আইনের বিধান অগ্রাহ্য করেই ইত্তেফাক সে সময় অসহযোগ আন্দোলনের খবর নিয়মিতভাবে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে। অথচ সরকার আপত্তিকর সংবাদ পরিবেশনের দায়ে ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান করেছিল। কিন্তু দৈনিক ইত্তেফাক তার কোনো তোয়াক্কা করেনি। মানুষের মুক্তির প্রশ্নে অস্তিত্ব বিলীনের ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি নিরবচ্ছিন্নভাবে সমর্থন জুগিয়ে যায় পত্রিকাটি। ইত্তেফাকের এ ভূমিকা উপমহাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। একসময় পাকিস্তানের সামরিক শাসক দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্তত ৬৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ছিল হাতেগোনা কয়েকটি। বাকিগুলো ছিল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, সাময়িকী, বুলেটিন বা নিউজ লেটার। ১৯৭১ সালের ২১ মে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা'। এটি ছিল আওয়ামী লীগের মুখপত্র। অন্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– 'জাগ্রত বাংলা', 'সংগ্রামী বাংলা', 'স্বাধীন বাংলা', 'সোনার বাংলা', 'দেশবাংলা', 'নতুন বাংলা', 'সাপ্তাহিক বাংলা', 'দুর্জয় বাংলা', 'মুক্ত বাংলা', 'বিপ্লবী বাংলাদেশ', 'মুক্তিযুদ্ধ' (সিপিবি প্রকাশিত), 'রণাঙ্গন', 'দাবানল', 'অগ্রদূত', 'অভিযান', 'জন্মভূমি' ইত্যাদি। 'জয় বাংলা' নামে অন্তত চারটি এবং 'বাংলাদেশ' নামে সাতটি পত্রিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ পত্রিকাগুলো সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ সম্পাদনা করতেন। যেমন– এবি সিদ্দিকী সম্পাদনা করতেন 'অমর বাংলা'। এ সাপ্তাহিকটি ঢাকার বেঙ্গল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হতো। চার পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। বিখ্যাত কবি ও সাংবাদিক সিকান্দার আবু জাফরের পত্রিকা ছিল 'অভিযান'। দাম ছিল ৩০ পয়সা, চার থেকে আট পৃষ্ঠা ছিল এটি। ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমের মুক্তিযোদ্ধাদের মুখপত্র ছিল 'অগ্নিবাণ'। মুক্তিযোদ্ধা ও ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী এটি প্রকাশ করতেন। জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'আমার দেশ'র সম্পাদক ছিলেন খাজা আহমদ। ২৫ পয়সার ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকাটি আগস্টে বাজারে আসে। ২৬শে মার্চ থেকে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে নওগাঁর তরুণরা স্বাধীন বাংলার প্রথম দৈনিক 'ইশতেহার' প্রকাশ করে। 'উত্তাল পদ্মা'র সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আবু সাহিদ খান। মুজিবনগর থেকে এটি প্রকাশিত হতো। 'ওরা দুর্জয় ওরা দুর্বার' ছিল মুক্তিবাহিনীর ক্রোড়পত্র। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তরের পক্ষে এম আর আখতার মুকুল এটি বের করতেন। 'গণমুক্তি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১০ পয়সা দামের এই কাগজটি ছিল চার পৃষ্ঠার। সাপ্তাহিক 'গ্রেনেড' ঢাকার তরুণ ছাত্ররা বের করত। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশের মুজিবনগর থেকে সর্বপ্রথম 'দৈনিক জয় বাংলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ এটি প্রকাশনা শুরু করে ১১ এপ্রিল বন্ধ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মুখপত্র সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা'র সম্পাদক ছিলেন গণপরিষদ সদস্য আহমদ রফিক। প্রথমে ২০ এবং পরে ২৫ পয়সা দামের এই ট্যাবলয়েডের ছাপা ছিল ঝকঝকে। প্রথম সংখ্যাটি ১৯৭১ সালের ১১ মে প্রকাশিত হয়। শেষ সংখ্যা ২৪ ডিসেম্বর। মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত এ পত্রিকায় 'রণাঙ্গন' নামে যুদ্ধের খবরের আলাদা কলাম শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হতো। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'যা দেখছি যা ভাবছি' নামে এখানে নিয়মিত কলাম লেখতেন। টাঙ্গাইল থেকে 'রণাঙ্গন' প্রকাশ হয় ১১ জুলাই ১৯৭১ সালে। পত্রিকার নামের নিচে লেখা থাকত 'মুক্তি ফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র'। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী। সম্পাদক হিসেবে 'রণদূত' বলে একজনের ছদ্মনাম ছাপা হতো। চার পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল ৫০ পয়সা। এতে মূলত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কাদেরিয়া বাহিনীর বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের খবরাখবর প্রকাশ হতো। 'নতুন বাংলা' নামে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিল। এটি ন্যাপপ্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হতো। মুজিবনগর থেকে এটি ১৯ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৯ জুলাই এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন বন্ধ হয়ে গেলেও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হতো 'অগ্রদূত' নামে একটি পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন আজিজুল হক মাস্টার। জেনারেল এম এ জি ওসমানী ২ নভেম্বর এ পত্রিকার সম্পাদককে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তাঞ্চল থেকে খন্দকার গোলাম মোস্তফা বাটুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক রণাঙ্গন'। গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো 'সাপ্তাহিক রণাঙ্গন'। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের অনেক আগেই সেপ্টেম্বরে সাপ্তাহিক রণাঙ্গনে 'ডিসেম্বরে বাংলা মুক্ত' শিরোনামে একটি লিড নিউজ প্রকাশিত হয়। এটি সেই সময়ে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার মুখে পড়ে। পরবর্তী সময়ে রণাঙ্গনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলে পত্রিকাটি এবং এর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্পাদক-প্রকাশক খন্দকার গোলাম মোস্তফা বাটুল ভূয়সী প্রশংসিত হন। একই সময়ে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' প্রকাশিত হয় ফুলু সরকারের সম্পাদনায়। মুক্তিসংগ্রামে রংপুর অঞ্চলের এ দুই পত্রিকার অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও তখন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের একক প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শিলালিপি' পত্রিকা। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শিলালিপির ওপর নেমে আসে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর খড়্গ। হাশেম খানের প্রচ্ছদ করা একটি শিলালিপির প্রকাশিতব্য সংখ্যা নিষিদ্ধ করে দেয় পাকিস্তান সরকার। পরে প্রকাশের অনুমতি মিললেও নতুনভাবে সাজানোর শর্ত দেওয়া হয়। এতে সেলিনা পারভীন বরাবরের মতো প্রচ্ছদ না নিয়ে তাঁর ভাইয়ের ছেলের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করে আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে শিলালিপির সর্বশেষ সংখ্যা বের করেন। কিন্তু এর আগেই তিনি পাকিস্তানি ও তাদের এদেশীয় দালালদের নজরে পড়ে যান। তাঁর পত্রিকায় দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী এবং স্বাধীনতার পক্ষের লেখা প্রকাশিত হতো।

এছাড়া 'বাংলাদেশ' নামে আরেকটি সাপ্তাহিকের ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সালেহা চৌধুরী। নারীদের নিয়ে একমাত্র পত্রিকা 'মায়ের ডাক'-এর সম্পাদক ছিলেন সালেহা বেগম। এমন আরো অনেক পত্রিকা তখন অবরুদ্ধ দেশের নানা স্থান, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত হতো।

বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি বহির্বিশ্বের সাংবাদিক বন্ধুরাও বাংলাদেশের ঘটে যাওয়া ও চলমান ঘটনাবলি বিশ্বকে জানাতে তৎপর ছিলেন, যা

পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত তৈরিতে সহযোগিতা করেছিল।

২৫ মার্চের গণহত্যার চিত্র যেন বিশ্ববাসী জানতে না পারে, সেজন্য পাকিস্তানি বাহিনী বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিংয়ের জন্য তাদের পরিকল্পনা সফল হয়নি। তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন– পাকিস্তানে গণহত্যা হয়েছে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সরকার সব বিদেশি সাংবাদিককে কৌশলে হোটেল শেরাটনে (বর্তমানে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল) আটক করে ফেলে। পরদিন বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিদেশি সাংবাদিকশূন্য হয়ে পড়ে ঢাকা। এরই মধ্যে একজন পালিয়ে থাকতে সক্ষম হন। তিনি সাইমন ড্রিং। সামরিক শাসকের নির্দেশ অমান্য করে তিনি লুকিয়েছিলেন হোটেলে। ২৭ মার্চ সকালে কারফিউ উঠে গেলে হোটেলের কর্মচারীদের সহযোগিতায় একে একে ঘুরে দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক ও পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকা। শুধু লাশ আর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। এসব দেখে তিনি লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় লিখেন, 'ট্যাংকস ক্রাশ রিভোল্ট ইন পাকিস্তান'। এ সংবাদ ৩০ মার্চ ছাপা হওয়ার পর বিশ্ববাসী জানতে পারে পূর্ব পাকিস্তানে কী হচ্ছে!

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমা সাংবাদিকদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে বিবিসি বাংলা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিদেশি সাংবাদিকরা আসতে শুরু করেন '৭০-এর ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসকে কেন্দ্র করে। তারপর তাঁরা '৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরঙ্কুশ বিজয় প্রত্যক্ষ করেন। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যাদের মদত ছিল, তাঁরা বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে মূল্যায়ন না করলেও অধিকাংশ মিডিয়া বাঙালির পক্ষে ছিল। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা মেনে নিতে পারেনি। যুগোস্লাভিয়ার সংবাদপত্র ওই সময় লিখেছে, 'ইয়াহিয়া বেয়নেট দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইছেন।' ঘানার পত্রিকা লিখেছে, 'বিশ্ববিবেক এখনো জাগেনি।' আমেরিকার পত্রিকাগুলো লিখেছে, 'মার্কিন অস্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানিরা মারা যাচ্ছে। সুতরাং দায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারেরও।'

এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো মুক্তিযুদ্ধের ওপর গুরুত্বারোপ করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– 'চীন চায় না ভারতীয় উপমহাদেশে যুদ্ধ বেঁধে যাক' (এএফপি পিকিং, নভেম্বর ১৫, ১৯৭১), 'মুজিবের রাষ্ট্রদ্রোহের প্রকৃতি' (দ্য সানডে টাইমস, জাম্বিয়া, ২২ আগস্ট), 'ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ পরিস্থিতি' (সানডে পোস্ট, নাইরোবি, ৩ অক্টোবর), 'শরণার্থী সমস্যার সমাধান' (মানিচি, ডেইলি নিউজ, টোকিও)।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার পত্রিকাগুলোর বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোর করুণ অবস্থা তাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। তাই তারা ত্রাণশিবির, গভীর অরণ্য কিংবা অনিশ্চিত আশ্রয়স্থলে বসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবরাখবর প্রচারের পাশাপাশি জনমত গঠনসহ দেশবাসীর মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করে। যেসব দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত যুদ্ধের খবর ছাপত, সেগুলোর মধ্যে সংবাদ জাগরণ, গণরাজ, রুদ্রবীণা, নাগরিক জনপদ ছিল অন্যতম। এছাড়া সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল সমাচার, দেশের কথা, সীমান্ত প্রকাশ ও ত্রিপুরার কথা। প্রথম অবস্থায় এসব পত্রিকা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা লোকদের স্মৃতিনির্ভর প্রতিবেদন করত। পরবর্তী সময়ে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় প্রতিবেদক পাঠিয়ে যুদ্ধের চলমান সংবাদ পরিবেশন করত।

ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত সমাচার পত্রিকাটির কথা ভোলার নয়। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রী অনিল ভট্টাচার্য। তিনি দৈনিক যুগান্তরের ত্রিপুরা প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি শুধু সাংবাদিকই ছিলেন না, বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও সংবাদ সাময়িকী মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হতো। এগুলো মুক্তিকামী জনতার মুখপত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– দৈনিক পূর্বদেশ ও জয়বাংলা পত্রিকার সাংবাদিক আবুল মনজুর, চট্টগ্রামের মাসিক বান্ধবী পত্রিকার সাংবাদিক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথিকা পাঠিকা বেগম মুশতারী শফি, দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সাংবাদিক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথক আবু তোয়াব খান, দৈনিক অবজারভার পত্রিকার সাংবাদিক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র পাঠক এম আর আখতার মুকুল, সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক, দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার সাংবাদিক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথক মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ, দৈনিক পূর্বদেশ ও জয়বাংলা পত্রিকার সাংবাদিক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথক রণজিত পাল চৌধুরী, দ্য পিপলের সাংবাদিক আবিদুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাক ও জয় বাংলা পত্রিকার মোহাম্মদুল্লাহ চৌধুরী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইংরেজি বিভাগের সংগঠক আলমগীর কবির, খুলনার সাংবাদিক আলী তারেক, সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সাংবাদিক মুছা সাদেক, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার আবুল হাসনাত, দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার মহাদেব সাহা, দৈনিক অবজারভার ও জয় বাংলা পত্রিকার এ বি এম মূসা, সাপ্তাহিক হলিডে'র সাদেক খান, বাংলার বাণীর শফিকুল আজিজ মুকুল ও আমির হোসেন, দৈনিক আজাদ ও জয় বাংলা পত্রিকার আমিনুল হক বাদশা, দৈনিক অবজারভার পত্রিকার মৃণাল কুমার রায় ও জালাল উদ্দিন, দৈনিক বার্তা পত্রিকার আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, দৈনিক আজাদীর সাধন কুমার ধর, দৈনিক পূর্বদেশ ও জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, দৈনিক অবজারভারের ফয়েজ আহমেদ, দৈনিক পূর্বদেশের কামাল লোহানী, দৈনিক সংবাদের সন্তোষ গুপ্ত, দৈনিক ইত্তেফাকের আল মাহমুদ, দ্য পিপল'র নির্মলেন্দু গুণসহ আরো অনেকে।

উল্লিখিত সাংবাদিকদের প্রায় সবাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সমর্থন আদায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে ওই সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ প্রচারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করত। যেমন– রম্যকথিকাবিষয়ক অনুষ্ঠান চরমপত্র-এর কথক ও লেখক ছিলেন সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল, সংবাদভিত্তিক কথিকা বিশ্বজনমতের কথক সাংবাদিক সাদেকীন, রম্যকথিকা পিণ্ডির প্রলাপ অনুষ্ঠানের কথক আবু তোয়াব খান ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফয়েজ আহমদ, মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, কামাল লোহানীসহ অনেক সাংবাদিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কামাল লোহানী ছিলেন সংবাদ বিভাগের প্রধান।

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষপ্রান্তে পাকিস্তান বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় ১১ ডিসেম্বর থেকে ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবী নিধন শুরু করে। সেই নিধনযজ্ঞের নীলনকশা অনুযায়ী ১৪ই ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তান বাহিনী দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিকদের চোখ বেঁধে বাড়ি থেকে তুলে এনে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধে সারাদেশে ১ হাজার ১১১ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। (উইকিপিডিয়া)। এর ভেতর ১৩ জনের মতো ছিলেন সাংবাদিক।

মুক্তিযুদ্ধকালীন কতজন সাংবাদিক শহিদ হয়েছিলেন, তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন– দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন (নিহত ১০ ডিসেম্বর), শহীদুল্লা কায়সার, সহ-সম্পাদক দৈনিক সংবাদ (১৪ই ডিসেম্বর), শহিদ সাবের, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ (২৫ মার্চ), নিজামুদ্দীন আহমেদ, জেনারেল ম্যানেজার পিপিআই সংবাদদাতা, বিবিসি (১২ ডিসেম্বর), আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সিনিয়র সম্পাদক, দৈনিক পূর্বদেশ (১১ ডিসেম্বর), চিশতি হেলালুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা, দৈনিক আজাদ (২৫ মার্চ), সৈয়দ নাজমুল হক, চিফ রিপোর্টার পিপিআই সংবাদদাতা, সিবিএস (১১ ডিসেম্বর), খন্দকার আবু তালেব, সহ-সম্পাদক দৈনিক পয়গাম (২৯ মার্চ), শেখ হাবিবুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব (১০ এপ্রিল), আবুল বাশার চৌধুরী, সাংবাদিক দ্য মর্নিং নিউজ (অক্টোবর), আবু সাঈদ, আঞ্চলিক প্রধান দৈনিক আজাদ, রাজশাহী (২৮ জুন), শেখ আবদুল মান্নান (লাডু), সাংবাদিক দৈনিক অবজারভার, মোহাম্মদ আখতার, কর্মাধ্যক্ষ সাপ্তাহিক লালনা (১৪ই ডিসেম্বর), সেলিনা আক্তার পারভীন, সম্পাদক, শিলালিপি (১৪ই ডিসেম্বর)।

রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। আর কলম হাতে নেপথ্যে থেকে সাহস ও উৎসাহ জুগিয়েছেন সংবাদকর্মীরা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকার কথা গণমাধ্যমগুলোয় সেভাবে উঠে আসেনি। আত্মদানকারী সাংবাদিকদেরও পরবর্তী সময়ে সেভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি জাতির সামনে। দেশে অসংখ্য প্রেস ক্লাব ও গণমাধ্যম কার্যালয় রয়েছে। কিন্তু সেখানে চোখে পড়ে না কোনো শহিদ সাংবাদিকের ম্যুরাল অথবা মনুমেন্ট। মার্চ অথবা ডিসেম্বর এলে আমরা তাঁদের স্মরণ করি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শহিদ পরিবারগুলো পারিবারিকভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রিয় মানুষকে স্মরণ করে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ অথবা জীবিত সাংবাদিকদের অবদান পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রধান প্রধান সড়কের নাম সেই এলাকার কৃতী সাংবাদিকদের নামে নামকরণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) শহিদ সাংবাদিকদের স্মরণে 'শহিদ সাংবাদিক কর্নার' প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। জাতীয় পর্যায়ে আরো বড়ো পরিসরে এমন উৎসাহব্যঞ্জক কাজ করা যায় কি না, সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল তা ভেবে দেখতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক ভোরের কাগজ

মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন

পরবর্তী সময়ে গ্রন্থ সংকলনে বিভ্রান্তি

রীতা ভৌমিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ থেকে জুনিয়র রিসার্চ সিজিএস স্কয়ার ফেলোশিপ ২০১৬-এর জন্য মনোনীত হই। আমার গবেষণার শিরোনাম 'Massacre in Dhaka City by the Pakistani Army on 25-27 March 1971'। এ গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে তথ্য সংগ্রাহক গ্রন্থ হিসেবে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৯৮৪ সালের জুনে প্রথম প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' এবং অনুপম প্রকাশনী থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত সুকুমার বিশ্বাসের 'একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর' বইটি পড়ি। সেখান থেকে আমার গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ করি। একজন গবেষক হিসেবে পত্রিকায় প্রকাশিত সেই তথ্যগুলো আমি মেলাই। মূল পত্রিকার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে দেখা যায়, এ বই দুটিতে পত্রিকার হুবহু তথ্য তুলে ধরা হয়নি। কিছু শব্দ, বানান ও বাক্য পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় আমার দৃষ্টি এড়ায় না। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' বইয়ের ৬৪৮-৬৫১নং পৃষ্ঠায় ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল দ্য টাইমসের (লন্ডন) সাংবাদিক লুইস হেরেনের ঢাকায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাত্রির চিত্র 'Political and Intellectual Leaders Being Wiped Out in War of Genocide' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

> *২৬শে মার্চের ভোরে ইকবাল হলের যেখানেই দৃষ্টি পড়ে সেখানে দেখা যায় শুধু লাশ। স্বদেশের সোনার ছেলেদের গুলী খাওয়া লাশ। আর আকাশে ধোয়ার কুন্ডলি। এখান থেকেই শুরু হলো বাংলাদেশে পাক হানাদারদের বীভৎস লঙ্কাকান্ডের যাত্রা শুরু।*

'The Pakistan Army is alleged to have waged a war of genocide in East Pakistan. The objective is said to be the elimination of the political and intellectual leadership, and it might well have been achieved.

Old religious enmities are also said to have been revived. Thousands of Hindus are alleged to have been slaughtered by Muslim troops.

This and other charges were made in London yesterday by a young man who left Dacca earlier this week after spending the past two years there. For many reasons his name cannot be revealed, but I know him to be a level -headed and responsible man.

He confirmed that Shaikh Mujibur Rahman, the East Bengal leader escaped the carnage, but 11 members of his bodyguard were killed.

The Shaikh was arrested by troops last Thursday, held in the Adamji school for two days, and then flown to West Pakistan. He is believed to be held in Multan.

According to this informant, a systematic pattern of Physical and psychological destruction became apparent even during the first night of fighting on March 25, Soon after, it became clear that certain groups had been selected to be the victims of completely unrestrained brutality.

দৈনিক ইত্তেফাক
পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি যদি—
আজ থেকে আমার নির্দেশ—
ঢাকা বেতার বন্ধ

These included Awami League leaders, students (who are the most radical members of the League), professors and their families, and any Hindu who could be found.

The Army commanders had apparently concluded that the students were the nucleus of a future Bengali independence movement. The professors represented the East Pakistan intelligentsia, vital foe the administration of a future independent Bengal.

The reason for killing the Awami League leaders was self-evident. As for the Hindus, my informant is convinced that the troops were led to believe that they were the malign force behind the secessionist movement.

No single observer could possibly have observed all that went on during the five days of fighting, but what follows was actually seen.

At the University of Dacca, the residential dormitory Jagannath Hall was reserved for Hindu students, Tank tracks led to the wall of the compound, which had been blasted down.

Outside the building there was a fresh mass grave. Inside blood streamed from every room which had also been looted. There were bodies of six savagely-killed men in the servants quarters near by.

In the apartments of the faculty staff, children were seen shot dead in their beds. The dead bodies of what appeared to be the entire family of a senior professor, were found in another apartment.

Outside were seen the bodies of students still clutching lathes, or bamboo staves, in their hands. There were bloody footprints on the central staircase, and splotches of blood trickled down the outside wall of the building.

In two of the old city's largest bazaars, one entirely Hindu and the other predominantly so, the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors walked about with cloths over their noses. At least seven or eight bodies were seen in the rubble of ruined buildings and on refuse dumps.

In one House, my information saw the still warm corpse of a man who had been shot to death minutes before. It was surrounded by his wailing wives.

This is what was actually seen. What follows is an account of what happened during the five days of the fighting. Parts of it are reports received by the informant from friends before he left Dacca.

The Army moved in, in force, to occupy key points of the town shortly before midnight on March 25, President Yahya Khan had departed for Karachi only a few hours before, and the assumption was that the troops acted on his personal instructions.

According to official spokesmen, the Army had been warned of a plot to barricade all the approaches to the cantonment shortly after the President's departure. Barricades had certainly gone up throughout the city, and from midnight until noon the next day, Dacca echoed with the sounds of firing from heavy artillery, heavy machine-guns and other automatic weapons.

Throughout the night. there was the glare of large fires and tracer bullets.

By dawn, a large pall of smoke covered much of the city and drifted slowly northwards towards the wealthy suburb of Gulshan. Fires were also seen in the Bihari area, the scene of communal friction earlier in the month.

`Shoot to kill' curfew was imposed upon the city on March 26. Soldiers were seen firing with automatic weapons al the house of Colonel Osmani, a retired Bengal Army officer.

Shooting and fires continued through the night, but less violently and the curfew was relaxed for five hours on Saturday March 27.

During a walk through the newer part of the city, destroyed barricades and squatters, huts were seen every where.

In the older part of the city. near the police lines, there was complete destruction everywhere. It was understood that the only strong resistance to the Army took place here, with the help of policemen and troops of the East Pakistan Rifles. They were said to have been massacred for their temerity.

Refugees were already beginning to leave the city. Most of them carried only a small bundle of clothes.

The curfew was again lifted on Sunday to allow families to buy food but the New Market was almost completely destroyed.

At the Ramna racecourse, the two small villages and shrines of Hindu herdsmen were burnt and utterly destroyed. Many bodies were seen in the rubble, and the few remaining villagers were dazed and terrified.

The conclusion drawn was that East Pakistan would be without political and intellectual leadership for at least a decade, and perhaps a generation.'

অথচ মূল পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল শুক্রবার দ্য টাইমসের (লন্ডন) সাংবাদিক লুইস হেরেনের প্রতিবেদনের শিরোনামটি ছিল এরকম 'Pakistan army said to be wiping out leaders in brutal war'. Louis Heren–

'The Pakistan Army is alleged to have waged a war of genocide in East Pakistan. The objective is said to be the elimination of the political and intellectual leadership, and it might well have been achieved.

Old religious enmities are also said to have been revived. Thousands of Hindus are alleged to have been slaughtered by Muslim troops.

This and other charges were made in London yesterday by a young man who left Dacca earlier this week after spending the past two years there. For many reasons his name cannot be revealed, but I know him to be a level-headed and responsible man.

He confirmed that Shaikh Mujibur Rahman, the East Bengal leader, escaped the carnage, but 11 members of his bodyguard were killed.

The Shaikh was arrested by troops last Thursday, held in the Adamju school for two days, and then flown to West Pakistan. He is believed to be held in Multan.

According to this informant, a systematic pattern of Physical and psychological destruction became apparent even during the first night of fighting on March 25. Soon after, it became clear that certain groups had been selected to be the victims of completely unrestrained brutality.

These included Awami League leaders, students (who are the most radical members of the League), professors and their families, and any Hindu who could be found.

The Army commanders had apparently concluded that the students were the nucleus of a future Bengali independence movement. The professors represented the East Pakistan intelligentsia, vital for the administration of a future independent Bengal.

The reason for killing the Awami League leaders was self-evident. As for the Hindus, my informant is convinced that the troops were led to believe that they were the malign force behind the secessionist movement.

No single observer could possibly have observed all that went on during the five days of fighting, but what follows was actually seen.

At the University of Dacca, the residential dormitory Jangarnath Hall was reserved for Hindu students. Tank tracks led to the wall of the compound, which had been blasted down.

Outside the building there was a fresh mass grave. Inside blood streamed from every room which had also been looted. There were bodies of six savagely-killed men in the servants quarters near by.

In the apartments of the faculty staff, children were seen shot dead in their beds. The dead bodies of what appeared to be the entire family of a senior professor, were found in another apartment.

Outside were seen the bodies of students still clutching lathis, or bamboo staves, in their hands. There were bloody footprints on the central staircase, and splotches of blood trickled down the outside wall of the building.

In two of the old city's largest bazaars, one entirely Hindu and the other predominantly so, the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors walked about with cloths over their noses. At least seven or eight bodies were seen in the rubble of ruined buildings and on refuse dumps.

In one house, my informant saw the still- warm corpse of a man who had been shot to death minutes before. It was surrounded by his wailing wives.

This is what was actually seen. What follows is an account of what happened during the five days of the fighting. Parts of it are reports received by the informant from friends before he left Dacca.

The Army moved in, in force, to occupy key points of the town shortly before midnight on March 25, President Yahya Khan had departed for Karachi only a few hours before, and the assumption was that the troops acted on his personal instructions.

According to official spokesmen, the Army had been warned of a plot to barricade all the approaches to the cantonment shortly after the President's departure. Barricades had certainly gone up throughout the city, and from midnight until noon the next day, Dacca echoed with the sounds of firing from heavy artillery, heavy machine-guns and other automatic weapons.

Throughout the night, there was the glare of large fires and tracer bullets.

By dawn, a large pall of smoke covered much of the city and drifted slowly northwards towards the wealthy suburb of Gulshan. Fires were also seen in the Bihari area, the scene of communal friction earlier in the month.

A "Shoot to kill" curfew was imposed upon the city on March 26. Soldiers were seen firing with automatic weapons at the house of Colonel Osmani, a retired Bengal Army officer.

Shooting and fires continued through the night, but less violently, and the curfew was relaxed for five hours on Saturday March 27.

During a walk through the newer part of the city, destroyed barricades and squatters, huts were seen everywhere.

In the older part of the city, near the police lines, there was complete destruction everywhere. It was understood that the only strong resistance to the Army took place here, with the help of policemen and troops of the East Pakistan Rifles. They were said to have been massacred for their temerity.

Refugees were already beginning to leave the city. Most of them carried only a small bundle of clothes.

The curfew was again lifted on Sunday to allow families to buy food but the New Market was almost completely destroyed.

At the Ramna racecourse, the two small villages and shrines of Hindu herdsmen were burnt and utterly destroyed. Many bodies were seen in the rubble, and the few remaining villagers were dazed and terrified.

A body was seen outside the High Court building, but the most wanton destruction was to be found in the old city, Bodies were everywhere, and the bazaars had clearly been subjected to direct artillery fire.

The exodus of refugees increased when Army patrols resorted to open terrorism. They could be seen everywhere, brandishing bazookas, machineguns, and rifles.

Much of the destruction was senseless. The Shaheed Minar, a lovely monument to the martyrs of the 1953 Bengal language movement, was shattered. On Monday, March 29, a friend arrived from Chittagong and reported that the city had been held successfully until noon on Sunday by members of the East Pakistan Rifles, the Bengal Regiment and the police.

My informant refused to estimate the number of dead, but he was convinced that they could be counted in thousands. Among those known to have been killed was Mr. Innas Ali, Dean of Sciences at the University.

Dr. Kamal Hussain, a prominent member of the Awami League, was reported to have been killed. Mr. Tajuiddin Ahmen, general secretary of the league, was missing.

A justice of the High Court was shot after refusing to swear in Lieutenant-General Tikka Khan. The military governor. Dr. Nurul Huda, Chairman of the department of economics at the university, and a former Governor of East Pakistan, was beaten and badly hurt.

The conclusion drawn was that East Pakistan would be without political and intellectual leadership for at least a decade, and perhaps a generation.'

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' ও দ্য টাইমস (লন্ডন) পত্রিকার এই দুটি প্রতিবেদন এক হলেও এর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন– দুটি প্রতিবেদনের শিরোনামে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মূল পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল শুক্রবার দ্য টাইমসের (লন্ডন) সাংবাদিক লুইস হেরেন তার প্রতিবেদনে ঢাকায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাত্রির বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন এভাবে– 'Pakistan army said to be wiping out leaders in brutal war'. একই প্রতিবেদন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, অষ্টম অধ্যায়ে শিরোনাম পাল্টে হয়ে যায় 'Political and Intellectual Leaders Being Wiped Out in War of Genocide' প্রতিবেদনের কয়েকটি স্থানে ভুল বানানও লক্ষ করা যায়। উদ্ধরণ চিহ্নের (' ') ব্যবহার হয়নি। মূল প্রতিবেদনে উপসংহারের আগের প ১ া র া 'A body was seen outside... was beaten and badly hurt.' পর্যন্ত ছয়টি প্যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের অষ্টম অধ্যায়ে যোগ করা হয়নি। তথ্যের কোনো অংশ বাদ দিলে ... (তিনটি ডট) দিয়ে প্রতিবেদনটি চলমান বোঝানো হয়। সেই চিহ্নের উপস্থিতিও এখানে লক্ষ করা যায় না।

সংবাদ

সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা

এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম : মুজিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, জুন ১৯৮৪, সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, অষ্টম অধ্যায়ের ৪১৩-৪১৪ পৃষ্ঠায় দৈনিক আজাদে ১৯৭২ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানি বাহিনীর 'ইকবাল হল' আক্রমণের ওপর দুটি প্রতিবেদনের 'স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দুর্গ ইকবাল হল (নিজস্ব নিবন্ধকার)' শিরোনামে এখানে পরিবেশন করা হয়েছে– 'রেলসড়কের বস্তির বাসিন্দা চম্পার মা, তার ছোট ছেলেকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এই সাধারণ কর্মচারীদের একটি ঘরে, রাতে তার ঘরে এসে আশ্রয় নেওয়া আরো দুজন ছাত্র। সেই ছাত্র দুজনকে ঘরের ভিতরে ছেড়া কাঁথা লেপ দিয়ে ঢেকে সারারাতটা দরজায় বসে কাটিয়েছে চম্পার মা। রাতে দু-দুবার এসেছিল হানাদাররা।

জিজ্ঞেস করেছিল চম্পার মাকে কেউ আছে নাকি তোমার ঘরে। চম্পার মা সভয়ে উত্তর দিয়েছিল না কেউ নেই। আমরাই শুধু। হানাদাররা ঘরে ঢুকে আর দেখেনি। হয়তো কুমতলব ছিলো দস্যুদের কারো মনে, কিন্তু ওদেরই একজন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল আরে ছোড়ো ইয়ার বিলকুল বুড়টি হ্যায়। চম্পার মার পাশের ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভিতরে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গিয়েছিল আরো দুজন ছাত্র। কিন্তু বাঁচতে পারেনি স্টুয়ার্ড জলিল। চম্পার মায়ের চোখের সামনেই তাকে গুলি করে হত্যা করে দস্যুরা।

এই মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে যারা বাঁচলো তারাই আগামী দিনে বিভীষিকাময় ইতিহাসের সাক্ষী। ভোর থেকে চম্পার মার কানে কাদের যেন করুণ মা-মা আর্তস্বর ভেসে এলো। চম্পার মা ভাবলো হানাদারদের বুলেটে আহত কারা যেন মৃত্যুর আগে শেষবারের মতন প্রাণ ভরে মা ডাক ডেকে নিচ্ছে। চম্পার মার মাতৃহৃদয় সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠলো। পায় পায় এগিয়ে গেল চম্পার মা। দু'পা এগুতেই দেখলো পাশের তালাবদ্ধ ঘর থেকে মা ডাক ভেসে আসছে।

চম্পার মা দরজা ঠেলে ফাঁক করে দেখতে চাইলো ওরা জীবিত, অক্ষত, আহত না মৃত। না ওরা দু'জনেই জীবিত ও অক্ষত। ওরা চম্পার মাকে চ্যালা কাঠের মতো শক্ত আকাটা জিভে বের করে দেখালো। কিছুই বলতে পারলো না মুখ ফুটে। চম্পার মা বুঝলো তৃষ্ণায় ওদের জিভ শুকিয়ে গেছে। ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি কিন্তু পানি খাওয়াবে কি করে চম্পার মা ওদের? তেমন কোন পাত্র যে নেই হাতের কাছে। চম্পার মার মাতৃহৃদয় ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। দৌড়োদৌড়ি করে চম্পার মা, তার শেতল আঁচল কলের জলে ভিজিয়ে বাড়িয়ে দিল দরজার ফাঁক দিয়ে।

সেই ভিজে আঁচল চুষে ঢোক গিলে ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো ছেলে দুটোর। তারপর চম্পার মার সাহায্যে দরজা টেনে ফাঁক করে বেরিয়ে ছুটলো যেদিকে দু'চোখ তাদের গেল। যাবার সময় চম্পার মার উদ্দেশ্যে বলে গেল মা, তুমি আমাদের মা, গর্ভধারিণী মায়ের চেয়েও আপন আর মহৎ।'

দৈনিক আজাদে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মূল পত্রিকার প্রতিবেদনটি ছিল এরকম: 'পাক-বাহিনীর 'ইকবাল হল' ॥ চার ॥ আক্রমণের ওপর প্রতিবেদনের 'স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দুর্গ ইকবাল হল (নিজস্ব নিবন্ধকার)' প্রকাশ –

'... রেলসড়কের বস্তির বাসিন্দা চম্পার মা তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এই সাধারণ কর্মচারীদের একটি ঘরে, রাতে তার ঘরে এসে আশ্রয় নেওয়া আরো দুজন ছাত্র। সেই ছাত্র দুজনকে ঘরের ভেতরে ছেড়া কাঁথা লেপ দিয়ে ঢেকে সারা রাতটা দরজায় বসে কাটিয়েছে চম্পার মা। রাতে দু-দুবার এসেছিল হার্মাদরা। জিজ্ঞেস করেছিল চম্পার মাকে– কেউ আছে নাকি তোমার ঘরে। চম্পার মা সভয়ে উত্তর দিয়েছিল– না কেউ নেই, আমরাই শুধু। হার্মাদরা ঘরে ঢুকে আর দেখেনি। হয়তো কুমতলব ছিলো দস্যুদের কারো মনে কিন্তু ওদেরই একজন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল– আরে ছোড়ো ইয়ার- বিলকুল বুড়টি হ্যায়। চম্পার মার পাশের ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভেতরে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গিয়েছিল আরো দুজন ছাত্র। কিন্তু বাঁচতে পারেনি স্টুয়ার্ড জলিল। চম্পার মায় চোখের সামনেই তাকে গুলী করে হত্যা করে দস্যুরা। এই মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে যারা বাঁচলো তারাই আগামী দিনে বিভীষিকাময় ইতিহাসের সাক্ষী।

ভোরবেলা চম্পার মার কানে কাদের যেন করুণ মা-মা আর্তস্বর ভেসে এলো। চম্পার মা ভাবলো হার্মাদদের বুলেটে আহত কারা যেন মৃত্যুর আগে শেষবারের মতন প্রাণ ভরে মা - ডাক ডেকে নিচ্ছে। চম্পার মার মাতৃহৃদয় সে ডাকে সাড়া দেবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলো। পায় পায় এগিয়ে গেল চম্পার মা। দু-পা এগুতেই দেখলো পাশের তালাবদ্ধ ঘর থেকে মা ডাক ভেসে আসছে। চম্পার মা দরজা ঠেলে ফাঁক করে দেখতে চাইল ওরা জীবিত, অক্ষত, আহত না মৃত! না ওরা দুজনেই জীবিত ও অক্ষত। ওরা চম্পার মাকে চ্যালা কাঠের মত শক্ত আকাটা জিভ বের করে দেখালো। কিছুই বলতে পারলো না মুখ ফুটে। চম্পার মা বুঝলো তেষ্টায় ওদের জিভ শুকিয়ে গেছে। ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি কিন্তু পানি খাওয়াবে ওদের কী করে চম্পার মা? তেমন কোন পাত্র যে নেই হাতের কাছে। চম্পার মার মাতৃহৃদয় ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। দৌড়োদৌড়ি করে চম্পার মা তার শেতল আঁচল কলের জলে ভিজিয়ে বাড়িয়ে দিল দরজার ফাঁক দিয়ে। সেই ভিজে আঁচল চুষে ঢোক গিলে ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো ছেলে দুটোর। তারপর চম্পার মার সাহায্যে দরজা টেনে ফাঁক করে বেরিয়ে ছুটলো যেদিকে দুচোখ তাদের গেল। যাবার সময় চম্পার মার উদ্দেশ্যে বলে গেল মা, তুমি আমাদের মা, গর্ভধারিণী মায়ের চেয়েও আপন আর মহত। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তোমার কথা মনে থাকবে মা! চম্পার মা জানে না সেই দামাল ছেলেগুলো আজ কোথায়, কেমন আছে।

ইকবাল হল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক বেরুতেই ডান হাতে খালেকের পানের দোকান। খালেক রাতেই পালিয়ে গিয়েছিল। দোকানে ছিল খালেকের

কর্মচারী কিশোর ইউসুফ। ইউসুফ রাতে দোকানের ঝাঁপ ঠেলে দিয়ে তালাবদ্ধ করে ভেতরে ছিল। রাতে হার্মাদরা যখন গোলাগুলী ছুড়তে ব্যস্ত তখন এক হার্মাদের কণ্ঠ শুনেছিল ইউসুফ– শালালোক সব ভাগ গিয়া! কিন্তু ভোরবেলা হার্মাদরা এসে ডেকে তুললো ইউসুফকে। কিছুই বললেন না। শুধু দোকানে যা কিছু খাবার জিনিস ছিল - বিস্কুট, কেক, টফি সব দিতে বলে একটার পর একটা। প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট - নিয়ে নেয়। সাবান নেয়। পয়সা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তারা যায় ইউসুফ বলে - মন্নু এটা দাও, মন্নু ওটা দাও। হিংস্র নেকড়ের আদরের মত তারা আদর করে ইউসুফকে। ডাকতো 'মন্নু' বলে। ইকবাল হল হত্যাযজ্ঞের সারারাতের আরেক সাক্ষী এই ইউসুফ।

ভোর হবার সাথে সাথে জিনাত আলিরা ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে নামলো গ্যারেজের ছাদ থেকে। ঝাঁপ দিয়ে নামতে গিয়ে ডানপাটা ভেঙ্গে গেল আব্দুর রউফের। ভেঙ্গে ডান পায়ের গোছা থেকে সংযোগটা খুলেই গেল। রউফ আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না। রউফকে আপাততঃ ফেলে রেখেই ওরা শিক্ষকদের কোয়ার্টারের দিকে আশ্রয় নিল। কারণ মৃত্যু চতুর্দিকে হায়েনার মত ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে। একজনের জন্যে সবাইকে বোঝার মত মৃত্যুর নীল স্পর্শে বিলীন হবার কোন যৌক্তিকতা নেই।

... ২৬শে মার্চের ভোরে ইকবাল হলের যেখানেই দৃষ্টি পড়ে সেখানে দেখা যায় শুধু লাশ। স্বদেশের সোনার ছেলেদের গুলী খাওয়া লাশ। আর আকাশে ধোয়ার কুন্ডলি। এখান থেকেই শুরু হলো বাংলাদেশে পাক হানাদারদের বীভৎস লঙ্কাকান্ডের যাত্রা শুরু।'

পত্রিকায় 'হার্মাদরা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বইয়ে 'হার্মাদরা' শব্দটির পরিবর্তে 'হানাদাররা', 'তেষ্টার' স্থলে বইয়ে 'তৃষ্ণায়' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া কয়েক স্থানে বানান ও বাক্যে শব্দের স্থান পরিবর্তিত হয়েছে।

১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি পূর্বদেশ পত্রিকায় 'রোকেয়া হল আক্রমণ-৩' 'রক্তগঙ্গার মধ্যে নবজাতক' শীর্ষক হোসেন তওফিকের প্রতিবেদনে জানা যায়–

'রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোর্য়ার্টার। শুধু রক্ত আর রক্ত, মানুষের তাজা টকটকে লাল রক্তে ভেসে গেছে মেঝের অন্য বর্ণের অংশ। চাপ চাপ এই রক্তের মাঝে কোন লাশ নেই– পড়ে ছিল এক মাসের একটি জীবন্ত শিশু।

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চের কথা বলছি। হলের দারোয়ান হলে ফিরে এসে রক্তের মধ্যে রক্তমাখা যে শিশুটিকে কুড়িয়ে পেলো সে শিশু তাঁর অতি আদরের একমাত্র মেয়ের প্রথম সন্তান।

দারোয়ান মনিরুদ্দীন শুধু রক্ত দেখেছেন কিন্তু লাশ দেখেননি। লাশ দেখেননি কারণ নির্বিচারে হত্যার পর হানাদার হায়েনারা লাশ সব সরিয়ে ফেলেছিল। এই লাশগুলোর মধ্যে ছিল জীবন্ত শিশুটির মা, নানী, দুই মামা ও আরও অনেকে। রক্তমাখা ছেলেটির সর্বাঙ্গে হয়তো তার নিহত মায়ের রক্তও ছিল।

মনিরুদ্দীনের মেয়ের নাম সুরাইয়া। বয়স ২১। বিয়ে দিয়েছিলেন দু'বছর আগে ফরিদপুরে। জামাই ঢাকার মাওতাইলে ব্যবসা করেন-টেইলার, নাম আকবর হোসেন।

সুরাইয়া এসেছিল তার নবজাত শিশু পুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে। পুত্রের বয়স এক মাস। আদরের নাতিকে দেখবার জন্যে সুরাইয়া প্রসূতি ঘর থেকে বেরিয়েই বাপের বাড়ীতে ছুটে এসেছিল। আদরের নাতিকে কাছে পেয়ে নানা-নানী, মামা-খালার সে কি আনন্দ। সারা বাড়ী যেন আনন্দে হেসে উঠেছিল। মনিরুদ্দীনের সে আনন্দে সারাটা কর্মচারীদের কোয়ার্টার অনাবিল আনন্দের ছোঁয়া লেগেছিল। আনন্দ সবাইকে স্পর্শ করেছিল।

কিন্তু মনিরুদ্দীনের এই আনন্দ যে ক্ষণিকের তা কি সেদিন কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল যে মানুষখেকো মানুষ তাদের আনন্দ কেড়ে নিতে আসবে?

২৫শে মার্চের ভয়াল ভয়ঙ্কর রাতে সুরাইয়া সকলের সাথে নিহত হয়েছিলেন। তার বড় সাধ ছিল বাপের বাড়ী আসার। বাপের বাড়ী এসেই সে পরিবারের সকলের সাথে নিহত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে তাঁর নয়নের পুত্তলি, নাড়িছেঁড়া ধন এক মাসের একমাত্র শিশু পুত্রটি। মায়ের কোলে রাতে যখন আরামে সে শুয়েছিল তখন হানাদারদের বুলেট পরিবারের সকলের সাথে সুরাইয়া নিহত হলেও নিষ্প্রাণ এই শিশুকে খান সেনাদের বুলেট স্পর্শ করতে পারেনি। তাকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি রূপ-রস-গন্ধ ভরা পৃথিবী থেকে।

পরদিন পাক সেনারা যখন লাশগুলো নিয়ে গেলো তখনো এই শিশুটি জীবিত। এক মাসের শিশু মায়ের রক্তে লুটোপুটি খাচ্ছিল। খান সেনারা শিশুটি এমনি মরে যাবে ভেবে একে হত্যা করেনি। কিন্তু তাদের অনুমান ব্যর্থ। শিশুটি বেঁচে গেছে সকলকে অবাক করে। গণহত্যার এই নীরব ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী নিষ্পাপ শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এখন তার বয়স দশ মাস। বাপের সাথে আছে।

রোকেয়া হলের দারোয়ান মনিরুদ্দীন অশ্রু সজল চোখে আমায় শোনাচ্ছিলেন তাঁর আদরের নাতির আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যাবার কাহিনী। ২৭শে মার্চ সকালে সকলকে খুঁজতে গিয়ে তিনি রক্ত-সাগর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন তার নাতিকে। একমাত্র আদরের ধনকে। এ শিশুটিই এখন তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা, অশান্ত মনের শান্তির আশ্রয়।

শিশুটি এখন হাসতে শিখেছে মুখে কথা ফুটেছে সব শিশুর মত সে এখন 'মা' ডাকতে পারে। মাঝে মাঝে 'মা' ডেকে ডেকে এই অবুঝ শিশুটি অস্থির হয়ে উঠে। কিন্তু তার এই বিরামহীন ডাকে সাড়া দেবার কেউ নেই। তার মা নেই বলেই হয়তো শিশু পুত্রটি বার বার মাকে ডাকে। মার অমলিন ছবি ভেসে উঠে তার চোখের সামনে। জানি না অনাগত ভবিষ্যৎ তার মাতৃহত্যার কি জবাব দিবে?'

এই প্রতিবেদনটি অনুপম প্রকাশনী থেকে ২০০০ সালে সুকুমার বিশ্বাসের 'একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর' বইয়ের ১৯৯-২০০নং পৃষ্ঠায় ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি পূর্বদেশ পত্রিকায় 'রোকেয়া হল আক্রমণ-৩' শীর্ষক প্রতিবেদনে জানা যায়–

'রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোর্য়ার্টার। শুধু রক্ত আর রক্ত। মানুষের তাজা টকটকে লাল রক্তে ভরে গেছে মেঝের অন্য বর্ণের অংশ। চাপ চাপ এই রক্তের মাঝে কোন লাশ নেই পড়ে রয়েছে এক মাসের একটি জীবন্ত শিশু।

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চের কথা বলছি। হলের দারোয়ান হলে ফিরে এসে রক্তের যে রক্তমাখা শিশুটিকে কুড়িয়ে পেল সে শিশু তার অতি আদরের একমাত্র মেয়ের সন্তান।

দারোয়ান মনিরউদ্দিন শুধু রক্ত দেখেছেন, কিন্তু লাশ দেখেননি, লাশ দেখেননি কারণ নির্বিচারে হত্যার পর হানাদার হায়েনারা লাশ সব সরিয়ে ফেলেছিল। এই লাশগুলোর মধ্যে সেই জীবন্ত শিশুটির মা, নানী, দুই মামা ও আরও অনেকে। রক্তমাখা ছেলেটির সর্বাঙ্গে তার নিহত মায়ের রক্তও ছিল।

মনিরউদ্দিনের মেয়ের নাম সুরাইয়া। বয়স ২১, বিয়ে দিয়েছিলেন দুই বছর আগে মিরপুরে। জামাই মাতোয়াইলে ব্যবসা করেন-টেইলার, নাম আকবর হোসেন। সুরাইয়া এসেছিল তার নবজাত শিশুপুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে। পুত্রের বয়স ১ মাস। আদরের নাতিকে দেখাবার জন্যে সুরাইয়া প্রসূতি ঘর থেকে বেরিয়েই বাপের বাড়িতে ছুটে এসেছিল, আদরের নাতিকে কাছে পেয়ে নানা-নানী, মামা-খালাদের সে কি আনন্দ। সারা বাড়ী যেন আনন্দে হেসে উঠেছিল। মনিরুদ্দিনের সে আনন্দে সারাটা ... কর্মচারীদের কোয়ার্টার অনাবিল আনন্দের ছোঁয়া লেগেছিল। আনন্দ সবাইকে স্পর্শ করেছিল।

কিন্তু মনিরুদ্দিনের এই আনন্দ যে ক্ষণিকের, তা কি সেদিন কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল যে, মানুষখেকো মানুষ তাদের আনন্দ কেড়ে নিতে আসবে?

২৫শে মার্চের ভয়াল ভয়ঙ্কর রাতে সুরাইয়া সকলের সাথে নিহত হয়েছিলেন। তার বড় সাধ ছিল বাপের বাড়ী আসার। বাপের বাড়ী এসেই সে পরিবারের সকলের সাথে নিহত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেছে তার নয়নের পুত্তলি, নাড়িছেঁড়া ধন - এক মাসের একমাত্র শিশু পুত্রটি। মায়ের কোলে রাতে যখন আরামে সে শুয়েছিল, তখন হানাদারদের বুলেট পরিবারের সকলের সাথে সুরাইয়া নিহত হলেও নিষ্প্রাণ এই শিশুকে খান সেনাদের বুলেট স্পর্শ করতে পারেনি। তাকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি রূপ-রস-গন্ধ ভরা পৃথিবী থেকে।

পরদিন পাকসেনারা যখন লাশগুলো নিয়ে গেল, তখনো এই শিশুটি জীবিত। এক মাসের শিশুটি মায়ের রক্তে লুটোপুটি খাচ্ছিল। খান সেনারা শিশুটি এমনি মরে যাবে ভেবে একে হত্যা করেনি। কিন্তু তাদের অনুমান ব্যর্থ। শিশুটি বেঁচে গেছে সকলকে অবাক করে। গণহত্যার এই নীরব ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী নিষ্পাপ শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এখন তার বয়স দশ মাস। বাপের সাথে আছে।

রোকেয়া হলের দারোয়ান মনিরুদ্দিন অশ্রুসজল চোখে আমাদের শোনাচ্ছিলেন তাঁর আদরের নাতির আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যাবার কাহিনী, ২৭শে মার্চ সকালে সকলকে খুঁজতে গিয়ে তিনি রক্ত-সাগর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন তার নাতিকে। একমাত্র আদরের ধনকে। এ শিশুটিই এখন তার একমাত্র সান্ত্বনা, অশান্ত মনের শান্তির আশ্রয়।

শিশুটি এখন হাসতে শিখেছে, মুখে কথা ফুটেছে, সব শিশুর মত সে এখন 'মা' ডাকতে পারে। মাঝে মাঝে 'মা' ডেকে ডেকে এই অবুঝ শিশুটি অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু তার এই বিরামহীন ডাকে সাড়া দেবার কেউ নেই। তার মা নেই বলেই হয়ত শিশু পুত্রটি বারবার মাকে ডাকে। মার অমলিন ছবি ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। জানি না অনাগত ভবিষ্যৎ তার মাতৃহত্যার কি জবাব দিবে?'

পত্রিকায় 'রক্তে ভেসে গেছে'... এর পরিবর্তে বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'রক্তে ভরে গেছে'...। কয়েকটি স্থানে বাড়তি শব্দ যোগ করা হয়েছে। যেমন বইয়ে লেখা ছিল 'এই লাশগুলোর মধ্যে ছিল সেই জীবন্ত শিশুটির মা, নানী,'... কিন্তু পত্রিকায় রয়েছে 'এই লাশগুলোর মধ্যে ছিল জীবন্ত শিশুটির মা, নানী,'...। বইয়ে 'সেই'

শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। আবার পত্রিকার ওই প্রতিবেদনের আরেকটি বাক্যে 'রক্তমাখা ছেলেটির সর্বাঙ্গে হয়তো তার নিহত মায়ের রক্তও ছিল।'... সেখানে বইয়ে প্রকাশ হয়েছে 'রক্তমাখা ছেলেটির সর্বাঙ্গে তার নিহত মায়ের রক্তও ছিল'... । এরকম অনেক শব্দ বিভ্রাট লক্ষ্য করা যায়।

অনুপম প্রকাশনী থেকে ২০০০ সালে সুকুমার বিশ্বাসের 'একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর' বইয়ের ২০৫-২০৬নং পৃষ্ঠায় ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় 'রমনার সেই কালীবাড়ীটির কোন চিহ্ন আর নেই' শিরোনামে জানা যায়– '... ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ দিবাগত রাত্র ১২টার পর বর্বররা পাকবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে রমনা কালীবাড়ীর নিরীহ জনসাধারণের উপর পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন কালীবাড়ীর সমস্ত লোক প্রাণভয়ে মন্দিরে আশ্রয় নেয়। আশা ছিল বর্বর পাকবাহিনী মন্দিরকে কলুষিত করবে না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সে আশাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বর্বর পাকবাহিনী মন্দিরের চারদিক থেকে নামিয়ে আনে। তখন স্বামীজী সবাইকে বলেন, আর রক্ষা নেই। যে যেভাবে পারো জীবন রক্ষা করো। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর নিজের জীবন বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে অন্যের জীবন বাঁচাবার জন্য সর্বাগ্রে লাইনে দাঁড়ান। পাকবাহিনীর লোকেরা সিংহ দরজার নিকট সকলকে নিয়ে গিয়ে বলে 'তোমলোক আওয়ামী লীগ করতা হায়, শেখ মুজিবকো ভোট দিয়া, তোমলোককো হিন্দুস্থান ভেজ দেগা।' তখন স্বামীজী বলেন, এরা সব নিরীহ লোক, এদের ছেড়ে দাও, মারতে হলে আমাকে মারো। কিন্তু বর্বর পশুদের এ সমস্ত কথা শুনবার মত সময় বা ধৈর্য্য ছিল না। তারা সর্বপ্রথম স্বামীজীকে প্রথমে কপালে গুলি করে, পরে আর একটা গুলি করে পেটে। এইভাবে শহীদ হলেন একজন দেশভক্ত সাধক। এরপর লাইনের অন্য সকলকেও বর্বরবাহিনী নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। কত লোককে বর্বরবাহিনী হত্যা করে, তা এখন বলা কঠিন, কারণ এই দুঃখময় ঘটনার পর যে কোন প্রকারে জীবন রক্ষা পেয়েছেন, তারা কে কোথায় আছেন জানি না। তবে লাইনে যাঁরা ছিলেন তাদের আনুমানিক সংখ্যা ছিল ৫০/৬০ জন এবং এদের মধ্যে কেহ বেঁচেছেন কিনা জানি না। এরপর বর্বর পাকবাহিনী কালীবাড়ীর সমস্ত ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরে ঢুকে মায়ের মূর্তি লাথি মেরে ফেলে দেয়। মন্দিরের দামী দামী জিনিসপত্র সব কিছু লুট করে এবং মন্দিরেও আগুন ধরিয়ে দেয়। এইভাবে সারা রাত ধরে তারা ধ্বংসলীলা চালায়, স্বামীজীর স্ত্রী, এক নাবালিকা কন্যা ও এক নাবালক ছেলে এবং তাঁর বড় বোন কোন প্রকারে রক্ষা পান। আমি ও আমার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নিয়ে মন্দিরের নীচেই একটা অন্ধকার কক্ষে লুকিয়ে থেকে বর্বরবাহিনীর হাত থেকে কোন প্রকারে রক্ষা পাই। এই ঘটনার পরও পোড়া মন্দিরটা ধ্বংসের চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু বর্বরবাহিনীর তাও সহ্য হল না। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে অথবা মে মাসের প্রথম দিকে তারা মন্দিরটা ভেঙ্গে মাটির সহিত মিশিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মন্দিরের ইট ও সমস্ত গাছ সবকিছু বিক্রয় করে নিজেদের পকেট ভরেছে।

বর্তমানে স্ত্রী ও তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে এবং স্বামীজীর বড় বোন জীবিত আছেন। তাঁরা আসামের এক বাস্তুহারা আশ্রয়স্থানে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর আজ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম, রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই এখন স্বামীজীর পরিবারের লোকদের ফিরিয়ে এনে মন্দির পুনঃনির্মাণ করে সেখানে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমি জানতে পেরেছি, কিছু স্বার্থন্বেষী লোক নিজেদেরকে...

সেদিকে আমি বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন করছি, যাতে এই ঐতিহাসিক মন্দির পুনঃনির্মাণের কাজ সরকার যথাশীঘ্রই সম্ভব হাতে নেন এবং স্বামীজীর উত্তরাধিকারীদের হস্তে মন্দিরের দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং পরিবারকে সমূলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।'

এই প্রতিবেদনটি ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় 'রমনার সেই কালীবাড়ীটির কোন চিহ্ন আজ নেই' শিরোনামে অজিত কুমার মুখার্জীর লেখায় জানা যায়–

'... ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ দিবাগত রাত্র ১২টার পর বর্বর পাক বাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রমনা কালীবাড়ীর নিরীহ জনসাধারণের উপর পশুর মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তখন কালীবাড়ীর সমস্ত লোক প্রাণ ভয়ে মন্দিরে আশ্রয় নেয়। আশা ছিল বর্বর পাক বাহিনী মন্দিরকে কলুষিত করবে না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সে আশাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বর্বর পাক বাহিনী মন্দিরের চারদিক থেকে ঘেরাও করে সমস্ত লোককে উপর থেকে নামিয়ে আনে। তখন স্বামীজী সবাইকে বলেন আর রক্ষা নেই। যে যেভাবে পার জীবন রক্ষা কর। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর নিজের জীবন বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে অন্যের জীবন বাঁচাবার জন্য সর্বাগ্রে লাইন এ দাঁড়ান। পাক বাহিনীর লোকেরা সিংহ দরজার নিকট সকলকে নিয়ে গিয়ে বলে তোমলোক আওয়ামী লীগ করতা হায়, শেখ মুজিবকো ভোট দিয়া, তোমলোককো হিন্দুস্থান ভেজ দেগা। তখন স্বামীজী বলেন এরা সব নিরীহ লোক এদের ছেড়ে দাও মারতে হলে আমাকে মার। কিন্তু বর্বর পশুদের এ সমস্ত কথা শুনবার মত মন বা ধৈর্য্য ছিল না। তারা সর্বপ্রথম স্বামীজীকে প্রথমে কপালে গুলী করে পরে আর একটা গুলী করে পেটে। এইভাবে শহীদ হলেন একজন দেশভক্ত সাধক। এরপর লাইনের অন্য সকলকেও বর্বর বাহিনী নির্মমভাবে গুলী করে হত্যা করে। কত লোককে বর্বর বাহিনী হত্যা করে, তাহা এখনই বলা কঠিন কারণ এই দুঃখময় ঘটনার পর যারা কোন প্রকারে জীবন রক্ষা পেয়েছেন তারা কে কোথায় আছেন জানিনা। তবে লাইনে যাঁরা ছিলেন তাদের আনুমানিক সংখ্যা ছিল ৫০/৬০ জন এবং এদের মধ্যে কেহ বেঁচেছেন কিনা জানি না। এরপর বর্বর পাক বাহিনী কালীবাড়ীর সমস্ত ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরে ঢুকে মায়ের মূর্তি লাথিমেরে ফেলে দেয়। মন্দিরের দামি দামি জিনিসপত্র সবকিছু লুট করে এবং মন্দিরেও আগুন ধরিয়ে দেয়। এইভাবে সারারাত্র ধরে তারা ধ্বংসলীলা চালায়, স্বামীজীর স্ত্রী ও এক নাবালিকা কন্যা ও এক নাবালক ছেলে এবং তাঁর বড় বোন কোন প্রকারে রক্ষা পান। আমি ও আমার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নিয়ে মন্দিরের নীচেই একটা অন্ধকার কক্ষে লুকিয়ে থেকে র্বর বাহিনীর হাত থেকে কোন প্রকারে রক্ষা পাই। এই ঘটনার পরও পোড়া মন্দিরটা ধ্বংসের চিহ্ন লয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু বর্বরবাহিনীর তাও সহ্য হল না। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে অথবা মে মাসের প্রথম দিকে তারা মন্দিরটা ভেঙ্গে মাটির সহিত মিশিয়ে দিয়েছে শুধু তাই নয় এই মন্দিরের ইট ও সমস্ত গাছ সবকিছু বিক্রয় করে নিজেদের পকেট ভরেছে। বর্তমানে স্ত্রী ও তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে এবং স্বামীজীর বড় বোন জীবীত আছেন। তাঁরা আসামের এক বাস্তুহারা আশ্রয়স্থলে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর আজ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম, রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি পেয়েছে তাই এখন স্বামীজীর পরিবারের লোকদের ফিরিয়ে এনে মন্দির পুনঃনির্মাণ করে সেখানে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমি জানতে পেরেছি কিছু স্বার্থান্বেষী লোক নিজেদের মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক বলে পরিচয় দিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

সেদিকে আমি বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন করছি, যাতে এই ঐতিহাসিক মন্দির পুনঃনির্মাণের কাজ সরকার যথাশীঘ্রই সম্ভব হাতে নেন এবং স্বামীজীর উত্তরাধিকারীদের হস্তে মন্দিরের দায়িত্বভার অর্পণ করে এই পরিবারকে সমূলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।'

পত্রিকায় শিরোনাম ছিল 'রমনার সেই কালীবাড়ীটির কোন চিহ্ন আজ নেই'। সেখানে বইয়ে প্রকাশ হয়েছে, পত্রিকায় 'রমনার সেই কালীবাড়ীটির কোন চিহ্ন আর নেই'। পত্রিকার আরেকটি বাক্যে দেখা যায়, 'পাক বাহিনী মন্দিরের চারদিক থেকে ঘেরাও করে সমস্ত লোককে উপর থেকে নামিয়ে আনে।'... সেখানে বইয়ে প্রকাশ হয়েছে 'পাক বাহিনী মন্দিরের চারদিক থেকে নামিয়ে আনে।'... বইয়ে 'ঘেরাও করে সমস্ত লোককে উপর থেকে' এই শব্দগুলো পাওয়া যায়নি। এছাড়া এই প্রতিবেদনে শব্দ ও বানানের পরিবর্তনও হয়েছে।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক যুগান্তর

পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের ওপর চাপ

সাইফুল সামিন

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব বাংলা'র মানুষের জন্য এই রাষ্ট্র ছিল নিছক প্রভু বদল মাত্র। শাসনক্ষেত্রে ব্রিটিশ থেকে পাকিস্তান–এ ছিল অনেকটা এক শকুনের মুখ থেকে আরেক শকুনের মুখে পড়া। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। ব্রিটিশ বেনিয়ারা রাজদণ্ডের কশাঘাতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরুদ্ধ করেছিল। আর পাকিস্তানি শাসকরা বন্দুকের নলের মুখে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করতে সদা সক্রিয় ছিল।

মুখোশ উন্মোচন

> *ভাষা আন্দোলন প্রশ্নে তৎকালীন সংবাদপত্রের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ ছিল। বাংলাভাষা আন্দোলনের পক্ষের পত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দৈনিক মিল্লাত*

পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। সদ্য জন্ম নেওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক চেহারা ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়। পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনের খবর বেশ গুরুত্ব পেতো। এ কারণে পত্রিকাটি সরকারের রোষানলে পড়ে। ১৯৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি অবজারভার পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় সরকার। অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম ও মালিক হামিদুল হক চৌধুরী গ্রেফতার হন।

ভাষা আন্দোলন প্রশ্নে তৎকালীন সংবাদপত্রের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ ছিল। বাংলাভাষা আন্দোলনের পক্ষের পত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দৈনিক মিল্লাত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তস্নাত ঘটনা নিয়ে মিল্লাত ব্যানার শিরোনাম করে। শিরোনামে লেখা হয়: 'রাতের আঁধারে এত লাশ যায় কোথায়?' সেই সময় এমন বলিষ্ঠ শিরোনাম করে দারুণ সাহসের পরিচয় দেন মিল্লাত সম্পাদক মো. মোদাব্বের। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। তবে নূরুল আমিন হস্তক্ষেপ করলে গ্রেফতারি পরোয়ানা থেকে রেহাই পান মোদাব্বের।

সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ঘটনার সঠিক বিবরণ প্রকাশ হওয়ার পরিণতি নিয়ে পাকিস্তান সরকার ভীত ছিল। তাই এ ব্যাপারে শুধু সরকারি প্রেসনোট ছাপার নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সমর্থক পত্রিকাগুলো এই নির্দেশ অমান্য করে। সাপ্তাহিক সৈনিক ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে সৈনিক অফিস ঘেরাও করে পুলিশ। পরে সম্পাদক আবদুল গফুর ও প্রকাশক প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমকে গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হয়। এতে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটির প্রকাশনা।

ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক চাষী ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে একটি বিশেষ সংখ্যা বের করে। এদিন সন্ধ্যায় চাষী অফিস ঘেরাও করে পুলিশ। তারা পত্রিকাটির মুদ্রণ সরঞ্জাম নিয়ে যায়।

সামরিক বিধি

পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রথম সামরিক শাসন জারি হয়। জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। সংবাদপত্রে সামরিক শাসনের সমালোচনা প্রথমদিন থেকেই পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন পরিচালক মেজর জেনারেল ওমরাও খান। তিনি ৮ অক্টোবর ৩৫নং সামরিক আইনবিধি জারি করেন। বিধিতে বলা হয়: কোনো ব্যক্তি লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে জনগণের মধ্যে হতাশা, আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া হবে। সেনাবাহিনী বা পুলিশের প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টার ক্ষেত্রেও একই সাজার বিধান রাখা হয়।

আইয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে ২৪নং সামরিকবিধি জারি করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর প্রাদেশিক সামরিক আইনবিধি রহিত হয়। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ২৪নং সামরিকবিধি ছিল ৩৫নং প্রাদেশিক সামরিক আইন বিধিরই মতো।

> *পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসনের কঠোর বিধিবিধানের কারণে এখানকার সংবাদপত্রগুলো অসম্ভব রকমের চাপে পড়ে। এই চাপে সংবাদপত্রগুলো একদমই দমে যায়*

এছাড়া আইয়ুব খানের জারি করা ৩৪নং সামরিক বিধিতে বলা হয়: 'যে কোনো ব্যক্তি মুখের কথায় অথবা লিখিতভাবে অথবা যে কোনোভাবে প্রাদেশিকতা, শ্রেণিগত ভিত্তিতে এইরূপ গুজব বা বিবরণ প্রচার করিবে–যাহার দ্বারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অথবা শাসনকার্যের ব্যাপারে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে পারে, সেক্ষেত্রে তাহার ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে।'

পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসনের কঠোর বিধিবিধানের কারণে এখানকার সংবাদপত্রগুলো অসম্ভব রকমের চাপে পড়ে। এই চাপে সংবাদপত্রগুলো একদমই দমে যায়। ১৯৫৯ সালের ২৮ অক্টোবর ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া গ্রেফতার হন। তাঁর বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সমালোচনার অভিযোগ করা হয়। একই বছরের অক্টোবরের শেষদিকে মানিক মিয়া মুক্তি পান।

১৯৫৮ সালের ২৮ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে দেন আইয়ুব খান। এবার সব ক্ষমতা তাঁর দখলে যায়। এই পদক্ষেপ সংবাদপত্রের জন্য আরো ভয়ের সঞ্চার করে। আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে তৎপর হন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হন তিনি। আইয়ুব খানের কঠোর আইনের আওতায় আসে সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের ওপর সরকারি বিধিনিষেধ ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এ সময় সংবাদপত্রের সংখ্যা কমে যায়। ১৯৫৭ সালে পূর্ব বাংলা'য় ১৫টি দৈনিক ছিল। অর্ধ-সাপ্তাহিক সাতটি। সাপ্তাহিক ৮৭টি। ১৯৬১ সালে দৈনিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি। অর্ধ-সাপ্তাহিক চারটি। সাপ্তাহিক ৬৭টি। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার হয়। এরপর সংবাদপত্রের সংখ্যা আবার বাড়তে শুরু করে।

১৯৬০ সালের ২৬ এপ্রিল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশটি ছিল ব্রিটিশ আমলের প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট ১৮৬৭ ও সংবাদপত্র (জরুরি ক্ষমতা) আইন ১৯৩১-এর সম্মিলন। অধ্যাদেশের ৬৩ ধারায় সংবাদপত্রের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কে সম্পর্কিত অন্যান্য আইনের বিধি-নিষেধগুলোও কার্যকর রাখা হয়। অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন প্রেস মালিক ও প্রকাশকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জামানতের অর্থ দাবি এবং তা আদায় আইনসিদ্ধ করা হয়। অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকার নিষিদ্ধ সংবাদপত্রের সন্ধানে যে কোনো স্থানে খানা তল্লাশি চালানোর আইনগত অধিকার পায়। কঠোর এই অধ্যাদেশের বিষয়ে ১৯৬০ সালের ২৯ মে পাকিস্তান সংবাদপত্র পরিষদ বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়: এই আইন মত প্রকাশ এবং সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে।

পূর্ব বাংলা'য় ক্রমেই আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব বাংলা'য় আসেন। এ সময় ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভ হয়। মিছিলকারীদের ওপর কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। এ সংক্রান্ত প্রেসনোট ছাড়া অন্য কোনো সংবাদ এখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে দেয়নি পাকিস্তান সরকার। ৬ ফেব্রুয়ারি ইত্তেফাকে মুদ্রিতব্য সব সংবাদের ওপর আরোপ করা হয় সেন্সরশিপ। এই আদেশ ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ৬ ফেব্রুয়ারি 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মানিক মিয়া দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার হন। একই বছরের মে মাসে তিনি মুক্তি পান।

কণ্ঠরোধ অব্যাহত

পাকিস্তানে ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়। কিছুদিন পরে কিছু সংবাদ পরিবেশন নিয়ে সরকারের তথ্য বিভাগের সঙ্গে পূর্ব বাংলা'র বহুল প্রচারিত তিনটি সংবাদপত্রের বিরোধ দেখা দেয়। সংবাদপত্র তিনটি হলো দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজারভার। সংবাদপত্রগুলোর বিরুদ্ধে সরকারি ভাষ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে 'কাঙ্ক্ষিত আচরণ' না করার অভিযোগ তোলা হয়। এ কারণে ১৯৬২ সালের শেষের দিকে পত্রিকা তিনটিকে 'ব্ল্যাকলিস্ট' করা হয়। সরকারি ও আধা-সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার সুবিধা থেকে পত্রিকাগুলোকে বঞ্চিত করা হয়।

১৯৬২ সালের অক্টোবরে পরিস্থিতি বদলে যায়। এ সময় বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পত্রিকা তিনটিকে অধিক বিজ্ঞাপন দিতে থাকে। এতে পত্রিকা তিনটির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। তবে এই ঘটনার জেরে সরকারের সঙ্গে পত্রিকা তিনটির সম্পর্কের অবনতি হয়। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯৬৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর সরকার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস (সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশে সরকারি প্রেসনোট ও তথ্যবিবরণী হুবহু ছাপার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। ব্যত্যয় ঘটলে প্রেস ও সংবাদপত্রের কপি বাজেয়াপ্ত এবং সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়।

অধ্যাদেশে প্রেস মালিকের জামানতের অর্থ ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা হয়। এছাড়া সংবাদপত্র বা প্রেসের অর্থ প্রাপ্তির সূত্র এবং মালিক-সাংবাদিক-কর্মচারী বিরোধের মতো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য সরকারকে কমিশন নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। সরকার গঠিত কমিশন চাইলে সংবাদপত্রের প্রকাশনা অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে পারবে। কিংবা অন্য কাউকে সংবাদপত্রের দায়িত্ব দিতে পারবে।

সংবাদপত্র জগৎ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে অধ্যাদেশটি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সংবাদপত্রগুলো একযোগে এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা জোরালো বিরোধিতা শুরু করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অধ্যাদেশটি সমালোচিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের তৎকালীন চেয়ারম্যান এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানান।

আজাদ পত্রিকা প্রতিবাদ হিসেবে প্রতিদিন কালো বর্ডার দিয়ে বক্স করে দু'টি স্লোগান ছাপাত। স্লোগান দু'টি হলো: 'প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার কর', 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা চলবে না'।

১৯৬৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সমগ্র পূর্ব বাংলা'য় সাংবাদিকরা ধর্মঘট পালন করেন। ঐতিহাসিক এই ধর্মঘটের উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন। সাংবাদিকদের আন্দোলনে সরকার পিছু হটে। ১১ সেপ্টেম্বর এক মাসের জন্য উল্লিখিত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করে সরকার।

অধ্যাদেশটির বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের ১০ অক্টোবর সংশোধিত প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার। আগের অধ্যাদেশের সমালোচিত অধিকাংশ ধারা সংশোধিত অধ্যাদেশে বাদ দেওয়া হয়।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এই ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে পূর্ব বাংলা'য়ও দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বরূপ উদঘাটনের অভিযোগে সরকার অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করে। তবে এই মামলায় তাঁদের শাস্তি পেতে হয়নি।

ছয়দফা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দেয় ইত্তেফাক। ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে একাধিক লেখা লেখেন। এই কারণে ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো মানিক মিয়া গ্রেফতার হন।

১৯৬৬ সালের ১৬ জুন নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৭ জুন থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ থাকে। একই বছর ২৭ জুলাই ফের ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অসুস্থতার কারণে ১৯৬৭ সালে ২৯ মার্চ মানিক মিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির আগ পর্যন্ত ইত্তেফাককে আর প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়নি।

ভেসে গেল সামরিক বিধি

গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের পতন হয়। জারি হয় সামরিক আইন। ২৬ মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে সামরিক আইনবিধি জারি হতে থাকে। সামরিক আইনবিধির মধ্যে ৬ ও ১৯নং ধারা সংবাদপত্রের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এই ধারায় সামরিক আইনের সমালোচনা; কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ বা উত্তেজনা সৃষ্টি; জনমনে আতঙ্ক বা বিচ্ছিন্নতার চেষ্টার জন্য বিভিন্ন মেয়াদের সাজার বিধান রাখা হয়। সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে পাকিস্তান সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সারা বাংলা'য় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনে এখানকার সব পত্রিকা সমর্থন জানায়।

তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তান সরকার ১১০নং সামরিকবিধি জারি করে। এতে বলা হয়: পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রগুলোকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

পাকিস্তান সরকারের জারি করা এই সামরিকবিধি উপেক্ষা করতে সংকল্পবদ্ধ হয় বাংলা'র সাংবাদিক সমাজ। অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানান সাংবাদিকরা। অসহযোগ আন্দোলনের দুর্বার তরঙ্গে সামরিকবিধি ভেসে যায়।

হানাদারের কবলে কলমসৈনিক

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তারা চালায় গণহত্যা। এ দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপরও পড়ে হানাদারের হিংস্র থাবা।

পরদিন প্রকাশের জন্য '*দ্য পিপল*' ব্যানার প্রস্তুত করছিল। ব্যানারটি ছিল: 'Remain Prepared for Suprime Sacrifice'। প্রায় সব সাংবাদিক-কর্মচারী অফিসে ছিলেন। এমন সময় পত্রিকাটি আক্রান্ত হয়। পেট্রলবোমার আগুন ও গোলাবর্ষণে '*দ্য পিপল*' অফিস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ঘটনাস্থলে ছয়জন সাংবাদিক-কর্মচারী নিহত হন। ২৬ মার্চ বিকেলে পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাবর্ষণে '*ইত্তেফাক*' অফিস বিধ্বস্ত হয়। ২৮ মার্চ পুড়িয়ে দেওয়া হয় '*সংবাদ*' অফিস। একই সঙ্গে পুড়ে মারা যান সাংবাদিক শহীদ সাবের।

২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৭৭নং সামরিক বিধি জারি করেন। এই বিধিতে বেশকিছু বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়। যথা:

* পাকিস্তানের অখণ্ডতা বা সংহতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনা বা সমালোচনার চেষ্টা।
* সামরিক শাসন প্রয়োগ এবং তা অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনা।
* জনমনে আতঙ্ক বা হতাশা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচারণা।
* সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, সরকার অথবা তার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা।
* পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কিংবা কোনো অঞ্চলের বিরুদ্ধে অথবা পাকিস্তানে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা।
* প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম ধর্মের অবমাননার চেষ্টা এবং কায়দে আজমের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবমাননার চেষ্টা।

একই সামরিক বিধিতে সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিষয় সংবাদপত্রে মুদ্রণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই আদেশ লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস ঢাকা থেকে সংবাদ, দ্য পিপল ও হলিডে প্রকাশিত হয়নি। ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২১ মে।

৭৭নং সামরিক বিধির কার্যকারিতার ওপর নজর রাখার জন্য ঢাকায় সেন্সরশিপ হাউস স্থাপন করা হয়। সব খবর, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, নিবন্ধ ছাপার আগে তা অনুমোদনের জন্য এই সেন্সরশিপ হাউসে পাঠাতে হতো।

সেন্সরশিপ হাউসটি কেন্দ্রীয় তথ্য দপ্তরের অধীনে ছিল। তখন ঢাকায় দু'টি তথ্য দপ্তর ছিল। একটি তথ্য দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের, অন্যটি প্রাদেশিক সরকারের। তবে গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রে সরকারের দুই তথ্য দপ্তরের চেয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস বিভাগের কর্তৃত্ব বেশি ছিল। বিভাগটির দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর সালেক। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে এখানকার সংবাদপত্রের জন্য ত্রাস ছিলেন। সংবাদপত্র অফিসের পাশাপাশি সেন্সরশিপ হাউসের ওপরও কড়া নজর রাখতেন তিনি।

ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস বিভাগ একপর্যায়ে পত্রিকার সম্পাদকীয় বিষয়ও নির্ধারণ করে দিতে শুরু করে। ছিল প্রি-সেন্সরশিপেরও ব্যবস্থা। এছাড়া মাঝে-মধ্যে পত্রিকা অফিসে প্রেস অ্যাডভাইস পাঠানো হতো। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত সাধারণ প্রেস অ্যাডভাইস আসত টেলিফোনে। কিন্তু ১০ জুলাই থেকে সংবাদপত্র অফিসে লিখিত প্রেস অ্যাডভাইস আসতে শুরু করে।

১ সেপ্টেম্বর ৭৭নং সামরিক বিধি সংশোধন করে সংবাদপত্র সম্পর্কিত ৮৯নং সামরিকবিধি জারি হয়। ফলে সংবাদপত্রে রাজনৈতিক, রাজনৈতিক দল ও নেতা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের চরম নৃশংসতার শিকার হয়েছেন অনেক সাংবাদিক। তৎকালীন পিপিআই চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হককে ১০ ডিসেম্বর রাতে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। তিনি আর ফেরেননি। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সৈয়দ নাজমুল হককে মুক্তিযুদ্ধকালে দু'বার রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সাক্ষ্য দেননি।

১০ ডিসেম্বর ইত্তেফাক পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রথিতযশা রাজনৈতিক ভাষ্যকার সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তাঁর চামেলীবাগের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এ দেশীয় দোসররা। তাঁর আর খোঁজ মেলেনি।

১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে তাঁর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানের দোসররা। তিনি আর ফেরেননি।

মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ হয়েছেন দৈনিক পয়গামের ফিচার সম্পাদক এবং এককালের সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতা খোন্দকার আবু তালেব, পূর্বদেশের জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক এবং সাহিত্য সম্পাদক আ ন ম গোলাম মোস্তফা, পাকিস্তান অবজারভারের ক্রীড়া সম্পাদক শেখ আবদুল মান্নান, অবজারভারের সহ-সম্পাদক শিবসাধন চক্রবর্তী ও সাংবাদিক সেলিনা পারভীন।

সহায়ক গ্রন্থ

ধর, শংকর সুব্রত, (১৯৮৫)। **বাংলাদেশের সংবাদপত্র**। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

লেখক: সাংবাদিক, প্রথম আলো

স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সাংবাদিকতা: এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

মার্চ বাঙালি জাতির স্বাধীনতার মাস। এ মাস বাঙালিত্বের জাগরণের ডাক দিয়ে যায়। মার্চেই বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ১০ লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম... জয় বাংলা'। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঔপনিবেশিক পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একদিকে পূর্ব বাংলার জনগণকে সচেতন করা এবং অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করে দেওয়ার কাজটি সেদিনকার সংবাদপত্রগুলো যথাযথভাবেই পালন করেছিল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে জনগণের বিপুল রায়ের পর আওয়ামী লীগপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কারসাজিতে যখন এ দেশ অগ্নিগর্ভ, তখন ইত্তেফাক লিখেছিল: 'আবার আগুন লইয়া খেলা শুরু হইয়াছে। আবার দুর্ভাগা বাংলার বুকে রক্তঝরানো আরম্ভ হইয়াছে। '৬৯-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চের মতো একাত্তরের মার্চেও আবার গুলি চলিয়াছে। কার্ফু হইয়াছে, আবার আগুন জ্বলিয়াছে, আবার জনতা পথে নামিয়াছে, জনসমুদ্রে আবার জাগিয়াছে প্রবল জলোচ্ছ্বাস আর উত্তাল ঊর্মিমালা। ...অতীতে আমরা বহুবার বলিয়াছি, আজও বলিতেছি, মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের দাবী দাবাইয়া রাখার ক্ষমতা বন্দুকের গুলি কেন, পারমাণবিক ক্ষমতার নাই। পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদীরা বহুবার ইহার পরখ করিয়াছে। গণদাবীকে তাহারা কুত্রাপি দাবাইয়া রাখিতে পারে নাই, বরং প্রতিক্ষেত্রে নিজেরাই বরবাদ হইয়াছে।'[১]

> *১৯৭১ সালে মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় দৈনিকগুলো জনগণের দাবিদাওয়ার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ৭ই মার্চ দৈনিক সংবাদে 'বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে লেখা হয়*

১৯৭১ সালে মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় দৈনিকগুলো জনগণের দাবিদাওয়ার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ৭ই মার্চ দৈনিক সংবাদে 'বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন' শিরোনামে

সম্পাদকীয়তে আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে লেখা হয়, 'পূর্ব বাংলার বীর জনতা গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের যে আপোষহীন সংগ্রামী পতাকা তুলে ধরিয়াছেন, উহাকে কোন অবস্থাতেই অবনমিত হইতে দিবেন না। পরিষদের অধিবেশন বসুক আর নাই বসুক এই আন্দোলন বন্ধ হইবে না। জনগণের যে কোন দাবী একমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হইতে পারে, আপোষ বা আত্মবিক্রয়ের পথে নয়।'

অসহযোগ আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আন্দোলনের খবর ছাপা হয়েছে আজাদে। ১৪ই মার্চ আজাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'আর সময় নাই' শিরোনামে লেখা হয়েছিল: 'ক্ষমতায় যাঁহারা আজ সমাসীন আর ক্ষমতাসীনদের সহিত কানাকানি করার সুযোগ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের ব্যর্থতাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই অবনতির কারণ। বহিরাক্রমণ হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হইল সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ গ্রহণ করা তাঁহাদের কোন দায়িত্বের আওতায় আসে না। জনগণের সংগ্রাম যাতে অহিংস পথেই পরিচালিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁহাদের হস্ত শক্তিশালী করাই আজ প্রয়োজন।' অসহযোগ আন্দোলনের আরেক প্রবল সমর্থক পত্রিকা ছিল আবিদুর রহমান সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পিপল'। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভূমিকাকে সম্ভবত সবচেয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয় এই পত্রিকায় এবং দ্য পিপলেই প্রথম পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে 'অকুপেশন আর্মি' বলে অভিহিত করা হয়।[২]

শুধুই দেশ ও জনগণের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য সাংবাদিকতার সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ সালে এদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে। এজন্য অনেক সংবাদপত্র ও সাংবাদিককে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্মমতার শিকারও হতে হয়েছিল। ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে ঢাকার নিরস্ত্র জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী। ব্যাপক গণহত্যা ছাড়াও তাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল সংবাদপত্র অফিসগুলো। এ বিষয়ে সুব্রত শংকর ধর আরও লিখেছেন: 'সামরিক জান্তার কঠোর সমালোচক দ্য পিপলে পরদিন প্রকাশের জন্য ব্যানার প্রস্তুত করা হচ্ছিল– 'Remain Prepared for Supreme sacrifice'। প্রায় সব সাংবাদিক এবং কর্মচারী অফিসে থাকা অবস্থাতেই আক্রান্ত হলো দ্য পিপল অফিস। কিছুক্ষণের মধ্যেই পেট্রলবোমার আগুনে আর প্রচণ্ড গোলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো অফিসটি। ঘটনাস্থলেই নিহত হন ছয়জন সাংবাদিক ও কর্মচারী। ২৬শে মার্চ বিকালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত হলো ইত্তেফাক অফিস। ২৮শে মার্চ যখন দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে দাবি করা হচ্ছিল, তখন পুড়িয়ে দেওয়া হলো সংবাদ অফিস।'[৩]

২৬শে মার্চ ইয়াহিয়া খান ৭৭ নম্বর সামরিক বিধি জারি করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বা সংহতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনা নিষিদ্ধসহ বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একই বিধিতে সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড় না নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিষয় সংবাদপত্রে মুদ্রণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এ আদেশ লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি ঘোষণা করা হয় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। মূলত এই নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকেই সাংবাদিকতা দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, না পাকিস্তানি সামরিক জান্তার প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ হতে থাকে। তবে নির্দিষ্ট একজন সাংবাদিক বা নির্দিষ্ট কোনো একটি পত্রিকার নিরীক্ষা এই দায়বদ্ধতার মাপকাঠিতে বিচার করা খুবই কঠিন। কেননা সাংবাদিকদের অনেকেই তখন দেশ থেকে ভারতে গিয়ে অথবা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। আবার অনেকে ভারতে যাননি, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে এমনকি রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করে পত্রিকা অফিসে গিয়েছেন, কাজ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কাজ করেছেন। আর এভাবে দেশ ও জনগণের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য তাঁদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল ডিসেম্বরে– মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের চূড়ান্ত লগ্নে। দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক শহিদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, বিবিসির সংবাদদাতা শহিদ সাংবাদিক নিজামুদ্দীন আহমেদ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে সুব্রত শংকর ধর আরও লিখেছেন: 'দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে– এটি প্রমাণ করার জন্য সামরিক জান্তা দিন তিনের মধ্যেই পত্রিকা মালিকদের কাছে অলিখিত নির্দেশ পাঠালো– সব পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। ২৯ মার্চ থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করলো প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা মর্নিং নিউজ, হামিদুল হক চৌধুরীর বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পূর্বদেশ ও পাকিস্তান অবজারভার। ট্রাস্টের অপর পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশিত হলো ৩০ মার্চ।[৪]

সংবাদপত্রের পাতাজুড়ে তখন শুধু থাকত এপিপির সংবাদ। দৈনিক পাকিস্তান ৩০শে মার্চ থেকে প্রকাশিত হলেও এর প্রথম নিজস্ব প্রতিবেদন ছাপা হলো ২৭শে এপ্রিল, 'আজ শেরেবাংলার মৃত্যুবার্ষিকী'। ...১২ সেপ্টেম্বর থেকে ইত্তেফাকের পাতায় নিয়মিতভাবে বেশকিছু দিন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় কতগুলো রাজনৈতিক ভাষ্য। ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'অজ্ঞ নিরক্ষ জনতা ও জাতীয় রাজনৈতিক দল' শীর্ষক রাজনৈতিক নিবন্ধে তিনি নির্বাচনে পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলোর পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেন যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে। বাংলাদেশে তখন এই রাজনৈতিক দলগুলোর দোর্দণ্ডপ্রতাপ। সিরাজুদ্দীন হোসেন সেই সাহসের মূল্য দিয়েছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। স্বাধীনতা লাভের মাত্র কয়েক দিন আগে ১১ই ডিসেম্বর গভীর রাতে একদল উর্দুভাষী লোক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তাঁর চামেলীবাগের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবরোধকালের এই শ্বাসরুদ্ধকর দীর্ঘ নয় মাসে পাকিস্তানি হানাদার ও তার বশংবদদের রুদ্ররোষের শিকার হয়েছেন অনেক সাংবাদিক।[৫]

> *অসহযোগ আন্দোলনের আরেক প্রবল সমর্থক পত্রিকা ছিল আবিদুর রহমান সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পিপল'। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভূমিকাকে সম্ভবত সবচেয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয় এই পত্রিকায়*

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং মুজিবনগর ও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা

'৭১-এর ২৫ মার্চ রাতের ভয়াবহতার পর একদিকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ এবং অপরদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে দেশ ও হতবিহ্বল জনগণের মুক্তির উপায় বের করতে রাজধানী ঢাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না অনেক সাংবাদিকের কাছে। দেশ ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এই সাংবাদিকদের কেউ কেউ সরাসরি প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে ওই সময় সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীরা সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত একটি জাতির মনোবল ধরে রাখতে এবং একই সঙ্গে দেশপ্রেমের চেতনাকে শানিত রাখতে সেদিন বিশেষ করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে ভূমিকা পালন করেছিল, তা মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে।

বস্তুতপক্ষে, দেশ ও মাটির কাছে দায়বদ্ধ থেকে তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ ও লালন করেছিল বলেই সেদিন স্বাধীন বাংলা বেতারটি ছিল মুক্তিপাগল জনতা ও যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণের কণ্ঠস্বর। একটি সংবাদমাধ্যমকে সত্যিকার অর্থে যে কারণে গণমাধ্যম বলা যায়, তার সব বৈশিষ্ট্যই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ছিল। এ বেতার কেন্দ্রটির প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে এবং এ কেন্দ্র থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পর পর কয়েকবার পঠিত হয়েছিল। এই বেতার কেন্দ্রটিকে এ দেশের তৎকালীন মুক্তিপাগল মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে যেসব সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে তাঁরা হলেন– বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দীপ, আবদুল্লাহ-আল-ফারুক, কাজী হাবিবউদ্দিন আহমদ মনি, আমিনুর রহমান, রশিদুল হোসাইন, এ এম

শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস শাকের, মুস্তফা মনোয়ার প্রমুখ। ...স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অনুষ্ঠান ছিল 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার'। 'জল্লাদের দরবার'-এ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অমানবিক চরিত্র ও পাশবিক আচরণকে তুলে ধরা হতো। চরমপত্র সিরিজটির স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন এম আর আখতার মুকুল, যিনি নিজেই এর উপস্থাপক ছিলেন। এ ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানটি জনগণের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। এতে একই সঙ্গে ছিল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও জাতীয়তাবোধের প্রকাশ, যা জনগণের নৈতিক মনোবল দৃঢ়ীকরণে ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অস্থায়ী সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর স্বাধীন দেশের বেতার কেন্দ্র হিসেবে এর নতুন নাম হয় 'বাংলাদেশ বেতার'।[৬]

অপরদিকে মুক্তাঞ্চল, অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকি ঢাকা শহর থেকেও গোপনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বের হতো এবং এগুলোর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, তারা তখন শুধু দেশ ও বাঙালি জাতির প্রতিই দায়বদ্ধ ছিলেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কেউ কেউ তখন পত্রিকা বের করেছেন। এসব পত্রিকা প্রকাশের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল মানুষের মনে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমতকে শানিত করে রাখা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের মুখপত্র হিসেবে যেসব পত্রিকা বের হতো, সেগুলোর সঙ্গে জড়িত সাংবাদিকরাও ছিলেন তাঁদের দল, দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। এ সম্পর্কে সুব্রত শংকর ধরের বিস্তারিত বর্ণনায় ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের একটি চিত্র: 'মানুষের মনে মুক্তিযুদ্ধের দুর্জয় চেতনাকে শানিত করে রেখেছিল যেসব পত্রপত্রিকা, তার মধ্যে ছিল শ্বাশত বাংলা, জয় বাংলা, স্বরাজ, বিপ্লবী বাংলাদেশ, বাংলার বাণী, দুর্জয় বাংলা, সংগ্রামী বাংলা, হাতিয়ার, সাপ্তাহিক অভিযান, সাপ্তাহিক বাংলার মুখ, সাপ্তাহিক একতা, সাপ্তাহিক দাবানল, সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলা, সাপ্তাহিক বাংলা, অগ্রদূত, রণাঙ্গন, মুক্তি, জাগ্রত বাংলা, সাপ্তাহিক বঙ্গবাণী, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, মুক্তবাংলা, সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলাদেশ, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, সাপ্তাহিক আমার দেশ, পাক্ষিক অক্ষৌহিনী, সাপ্তাহিক বিপ্লবী আন্দোলন, সাপ্তাহিক রাষ্ট্রদূত, পাক্ষিক চাবুক, পাক্ষিক স্বদেশ, রুদ্রবীণা, দর্পণ, ওরা দুর্জয়, ওরা দুর্বার, লড়াই, দ্য পিপল, দ্য নেশন, মুক্তিযুদ্ধ, নতুন বাংলা, স্বাধীনতা, দেশ বাংলা, আমোদ, জনতা, সাপ্তাহিক প্রতিনিধি, সপ্তাহ, জন্মভূমি, মায়ের ডাক, কালান্তর এবং আরও অনেক পত্রিকা।

... সুন্দর-পরিপাটি ছাপার টেবলয়েড আকারের পত্রিকা ছিল 'জয় বাংলা'। এটি ছিল আওয়ামী লীগের মুখপত্র। 'জয় বাংলা'র একটি সংখ্যায় সব পাতাজুড়ে ছাপা হয়েছিল ইয়াহিয়ার মুখের হিংস্র ছবি, যার ক্যাপশন ছিল– 'এই জানোয়ারটাকে হত্যা করতে হবে।'

ঢাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী 'দ্য পিপল'-এর অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার পর সম্পাদক আবিদুর রহমান মুজিবনগর থেকে সাপ্তাহিক হিসেবে 'দ্য পিপল' প্রকাশ করেন ১৯৭১-এর মে মাসে। দেশের ভেতর এবং বাইরে পত্রিকাটির প্রচার ছিল যথেষ্ট। বস্তুত বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের খবর পৌঁছে দেওয়ায় এবং বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনে অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছে 'দ্য পিপল'। ...স্বাধীনতা যুদ্ধকালে একটি অন্যতম সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত পত্রিকা ছিল 'বাংলার বাণী'। প্রথম প্রকাশিত হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। এ সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় প্রেস ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ার প্রধান অমিতাভ চৌধুরীর ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এশীয় প্রেস ফাউন্ডেশনের সম্মেলনে প্রদত্ত একটি বিবৃতি। এ বিবৃতি থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে মোট ৫৮ জন সুপরিচিত সাংবাদিক দেশত্যাগ করেছিলেন। ...আঙ্গিকে প্রতিবেদন লিখনে, সম্পাদনায় কিংবা মুদ্রণ-সৌকর্যে এসব পত্রিকার অধিকাংশই মানোত্তীর্ণ ছিল না। ... এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার জন্মযন্ত্রণার মুহূর্তগুলো এসব পত্রিকায় চিত্রিত করা হয়েছে যথেষ্ট বিশ্বস্ততার সঙ্গে। পরিবেশিত সংবাদের সঠিকত্বের বিচারেই শুধু নয়, একটি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত যে আবেগ, তার প্রতিফলনেও সেই বিশ্বস্ততা বিচার্য।[৭]

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর থেকেই দেশের জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২৫শে মার্চের কালরাত্রে ঢাকায় সংঘটিত হয় ইতিহাসের বর্বরোচিত গণহত্যা। বঙ্গবন্ধুর 'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'– এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। আর সেই সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণকে সার্বিকভাবে প্রস্তুত করতে এবং তাঁদের মনোবল দৃঢ় রাখতে একটি গণমাধমের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। তাই দেখা যায়, চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পঠিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা জাতিকে নিদারুণভাবে শক্তি জুগিয়েছিল। দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ তৎকালীন ছাত্র, শিক্ষক, যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে ও সংবাদপত্র প্রকাশে এগিয়ে আসেন। যেমন– '৭১-এর ১১ই মে কলকাতা থেকে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক জয় বাংলা প্রকাশিত হওয়ার আগেই নওগাঁ থেকে ৩১ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত জয় বাংলা একটি দৈনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। জয় বাংলা: স্বাধীন বাংলার আদি পর্যায়ে নওগাঁ থেকে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্রাকার দৈনিক পত্রিকা। সম্পাদক: রহমতউল্লাহ এম এ। সম্পাদক দাবি করেন, জয় বাংলাই সে সময়ে স্বাধীন বাংলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা এবং স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণের একমাত্র মুখপত্র।[৮]

নওগাঁ থেকে প্রকাশিত এই জয় বাংলার সম্পাদকীয়তে ফুটে উঠেছিল দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও এর জনগণের প্রতি পত্রিকাটির দায়বদ্ধতার কথা। পত্রিকাটির ২য় সংখ্যার সম্পাদকীয়: 'ইংরেজিতে একটি কথা আছে, Man does not live by bread alone. অর্থাৎ, মানুষ শুধু আহার করিয়াই বাঁচিয়া থাকে না। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমাদের বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রাম উহার প্রমাণ। স্বৈরাচারী আমলে জনসাধারণ ভুট্টা, গম, চাউল ইত্যাদি, মোটামুটি খাইতে পাইত। 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা' বলিয়া চিৎকার না করিলে 'বাসমতী' চাউলও কিছু খাইতে পাইত। শুধু ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধ্যায়টির ইতি হইয়াছে। ভাতের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাও চাহিয়াছি– এবং আমরা পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে সফলতা অর্জন করিয়াছি।

আমরা মনে করি, ভাতের সঙ্গে মানুষের মনের খোরাকেরও প্রয়োজন আছে। 'জয় বাংলা' সেই চাহিদা কিঞ্চিৎ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

'জয় বাংলা' জনসাধারণ, সংগ্রাম পরিষদ ও সেনাবাহিনীর সমর্থন ও উৎসাহ পাইয়াছে। সেজন্য আমরা সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। বাংলা মুক্তিবাহিনী, পুলিশ, আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। মনে রাখিবেন, হয় আমরা জয়ী হইব, নতুবা ধ্বংস হইব। মাঝামাঝি কোনো পথ আর নাই।

'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ...ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'

–বঙ্গবন্ধু, ঘোড়দৌড় মাঠ, ঢাকা ৭ই মার্চ।

'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাও' –মওলানা ভাসানী, পোলো গ্রাউন্ড, চট্টগ্রাম –২১শে মার্চ।[৯]

৯ এপ্রিল ১৯৭১ জয়বাংলার আরেকটি সম্পাদকীয়: আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করিতেছি, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার দূর করিয়া স্বাধীনভাবে শির ও স্বদেশের পতাকাকে সমুন্নত রাখিয়া বিশ্বের বুকে বিচরণ করিবার জন্যই লড়াই করিতেছি। আল্লাহর মেহেরবাণীতে জয় আমাদের হইবেই। আমাদিগকে ঠেকাইবার শক্তি (এক আল্লাহ ছাড়া) আর কাহারও নাই। যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য নিরস্ত্র লোক বর্বরদের হাতে নিহত হইয়াছেন তাহাদের সকলের আত্মার শান্তির জন্য আমরা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি।

...পশ্চিমা বর্বরদের বেতার কেন্দ্র কেহ ধরিবেন না। আমরাও তাহা শোনা অনেক পূর্বেই বাদ দিয়াছি। নিজস্ব একটি বেতার কেন্দ্র যতদিন আমাদের চালু না হইতেছে, ততদিন বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানাদি শুনিতে পারেন। পূর্বেই একটি সংখ্যায় অমরা উত্তরাঞ্চলে একটি বেতার কেন্দ্রের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম।[১০]

---

১. *বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সুব্রত শংকর ধর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৬*
২. *পূর্বোক্ত*
৩.
৪. *পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০১*
৫. *পূর্বোক্ত*
৬. *বাংলাপিডিয়া (জাতীয় জ্ঞানকোষ) ১০, পৃষ্ঠা ৩১৫-৩১৬*
৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২*
৮. *পূর্বোক্ত: পৃষ্ঠা ৩-৪*
৯. *পূর্বোক্ত: পৃষ্ঠা ১৬, ১০*
১০. *পূর্বোক্ত: পৃষ্ঠা ১৭*

লেখক: রিসার্চ অফিসার, পিআইবি

এক নিভৃতচারী অবাঙালি ভাষাসৈনিক জয়নুল আবেদীন

শাহনাজ পলি

খ্যাতির আড়ালের একজন অবাঙালি ভাষাসৈনিকের নাম জয়নুল আবেদীন। একাধারে তিনি ছিলেন একজন উর্দুভাষী বাংলাদেশি, কবি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র কাহিনিকার, সিনিয়র সাংবাদিক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন ও স্থায়ী সদস্য এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

সবার কাছে তিনি প্রিয় জয়নু ভাই। নিজে উর্দুভাষী হয়েও বায়ান্নতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছিলেন সোচ্চার, বাংলাদেশের টানে এখানে থেকে গেছেন স্বজনদের ছেড়ে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যকর্মেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। জনপ্রিয় অনেক চলচ্চিত্রের কাহিনিও তাঁর লেখা।

> *একুশ সম্পর্কে জয়নুল আবেদীনের অনুভূতি ছিল, মাতৃভাষার জন্য এরকম রক্ত দেয়ার ঘটনা বিশ্বে আর কখনো ঘটবে না। এজন্যই সারাবিশ্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বিলম্বে হলেও স্বীকৃতি দিয়েছে*

জয়নুল আবেদীন জন্মসূত্রে তিনি উর্দুভাষী হয়েও ছিলেন বাংলাদেশি। পাসপোর্টে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে লেখা ছিল জাতীয় প্রেস ক্লাবের ঠিকানা, ১৮/তোপখানা রোড। বাস্তবতা মেনে চললে তাঁর ঠিকানা হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানে, নিজের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রেমে, বাংলাদেশের রূপে তিনি এতটাই মজে ছিলেন যে, আপন শেকড়, আত্মীয়-পরিজন বাদ দিয়ে পুরো জীবনটাই বাংলাদেশে কাটিয়েছেন। বাংলা ভাষার সমর্থনে উর্দুতে ব্যানার, পোস্টার লিখে ঢাকায় বসবাসরত উর্দুভাষীদেরকে বুঝিয়েছেন বাংলা ভাষার মাহাত্ম্য, চেষ্টা করেছেন তাদেরও সমর্থন আদায় করতে।

জয়নুল আবেদীন আর সব উর্দুভাষী বিহারিদের মতো ছিলেন না। তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেননি। বরং ১৯৫২ সালে যেমন তারা বাংলা ভাষার জন্য গলা ফাটিয়েছেন, রাজপথ কাঁপিয়েছেন, তেমনি ১৯৭১ সালে নির্যাতিত বাঙালিদের পাশে দাঁড়িয়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছেন।

ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা কলেজে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন জয়নুল আবেদীন। তখন ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাস ছিল ফুলবাড়িয়ায়। বামপন্থী

রাজনীতিতে যুক্ত থাকার কারণে দেয়াল লিখনে হাত পাকিয়েছিলেন তখনই। ঘনিষ্ঠরা তাকে বলতেন, 'মাস্টার অব ওয়াল রাইটার'।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে জয়নুল আবেদীন যকৃতের জটিলতাজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে পড়লে তাঁকে প্রথমে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে অবস্থার অবনতি হলে ২০১৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পিজি হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে গুরুতর অসুস্থতার মধ্যে জয়নুল আবেদীন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত এবং শেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময়কার কথা জানতে চাইলে তিনি আগের মতোই সজীব হয়ে ওঠেন। 'হামারি জবান বাংলা জবান' (আমার ভাষা বাংলা ভাষা), জুলুম ফের জুলুম হ্যায়, বারতা হ্যায় তো থাব জাতা (জুলুম সেটাই জুলুম যেটা বাড়তে বাড়তে থমকে যায়) এসব স্লোগান লেখার কথা জানান তিনি।

তাঁর সম্পর্কে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তার 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি অবাঙালি হয়েও বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারির আগে পুলিশ যখন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে, তখন তমদ্দুন মজলিশের ডাকা বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ভাষাসৈনিকদের মাঝে তিনিও ছিলেন একজন।'

একুশ সম্পর্কে জয়নুল আবেদীনের অনুভূতি ছিল, মাতৃভাষার জন্য এরকম রক্ত দেয়ার ঘটনা বিশ্বে আর কখনো ঘটবে না। এজন্যই সারাবিশ্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বিলম্বে হলেও স্বীকৃতি দিয়েছে। বারবারই বলেছেন, 'যে দেশের মানুষ ভাষার জন্য জীবন দেয় সে দেশের মানুষের সাথে আছি, চলতে পারছি এটাই তো ভাগ্যের ব্যাপার।'

পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা জয়নুল আবেদীনের বিছানার কাছে এসে বিস্ময়ের সাথে দেখেছেন একজন অবাঙালি ভাষাসৈনিককে। চিকিৎসক এবং নার্সরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁর পুরোনো বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠজনরাও ছুটে এসেছেন। ভিডিও কল করে করাচিতে তাঁর ছোটভাই সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, ছেরাজ আজাও ভাই। মেই ঠিক হু। এই ছোটভাইয়ের সঙ্গেই প্রতিদিন রাতে একবার কথা বলে ঘুমুতে যেতেন জয়নুল আবেদীন। ওই দিনই ছিল তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে শেষ কথা। সে রাতে ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, যে তারিখে বাংলা ভাষাকে মায়ের ভাষা করার দাবিতে জয়নুল আবেদীন ঢাকার রাস্তায় সোচ্চার হয়েছিলেন, সেই ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখেই তিনি চিরতরে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

যে মানুষটা উর্দুভাষী হয়েও বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশকে ভালোবেসে, পরিবারপরিজন ছেড়ে এ দেশেই সারাটা জীবন উৎসর্গ করলেন, জীবদ্দশায় গুটিকয়েক লোক বাদে তাঁর খোঁজ কেউ নেয়নি। অকৃতদার এই মানুষটির একমাত্র আশ্রয় বলতে ছিল জাতীয় প্রেস ক্লাব। প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ছিলেন। প্রেস ক্লাবেই থাকতেন। অন্য সদস্যদের জন্য প্রেস ক্লাব দ্বিতীয় আবাস হিসেবে পরিগণিত হলেও তাঁর কাছে প্রেস ক্লাবই ছিল প্রথম আবাস। ভাষা আন্দোলনে অবদানস্বরূপ একমাত্র প্রেস ক্লাবই তাঁকে জানিয়েছিল সম্মান, ২০১৪ সালে। প্রাপ্তি বলতে ওইটুকুই। এভাবে চলতে চলতে হয়তো একসময় অভিমান জন্মে তাঁর মনে। শেষে হয়তো ওই অভিমান সঙ্গে নিয়েই ২০১৭ সালের ৯ মার্চ বাংলাদেশপ্রেমী জয়নুল আবেদীন পাড়ি জমান না-ফেরার দেশে, নিঃশব্দে।

পরিবারের সবাই পাকিস্তানে চলে গেলেও তিনি বাংলায় থেকে গেছেন বাংলার টানে, একা। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়ো। দুই ভাই পাকিস্তানের করাচিতে থাকেন। একমাত্র বোন চার বছর আগে মারা যান। জয়নুল আবেদীনের অসুস্থতার খবর পেয়ে ছোটভাই সিরাজ যখন ঢাকায় ছুটে আসেন, তখন জয়নুল আবেদীন বাকরুদ্ধ অবস্থায় পিজি হাসপাতালের আইসিইউ'তে। দু'চোখের অশ্রু আর হাতের উষ্ণতা দিয়ে ছোটভাইয়ের হাত জড়িয়ে জয়নুল আবেদীন তাঁর অব্যক্ত কণ্ঠে বললেন, সে এদেশ থেকে যাবেন না। এখানেই থাকবেন। বাবা মোস্তফা ও মা জয়তুন বিবি'র কবর বাংলাদেশের সৈয়দপুরে। আর সে কারণে হয়তো জয়নুল আবেদীন বাংলার মাটিকেই তাঁর শেষ ঠিকানা করে নিয়েছেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে পাকিস্তান সরকার টের পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে সদ্য প্রকাশিত স্যুভেনিয়রে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল একটি ছবি ছাপা হলে অনেকেই তাঁর এই ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি জানতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু 'বিহারি জয়নু'র কাছে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন এবং কিছু দরকার আছে কিনা জানতে চান। জয়নুল আবেদীন স্বভাবসুলভ মৃদু হাসি দিয়ে করাচিতে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা করতে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু পাসপোর্টের ব্যবস্থা করেন। আর এভাবেই তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে যান।

জয়নুল আবেদীন ১৯৩৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ও মা জয়তুন চার পুত্র-কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর বাবা একজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন। মহররম মাসে জন্মেছিলেন বলে বাবা তার নাম রেখেছিলেন জয়নুল আবেদীন। বাবা ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের হেড ড্রাফটসম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন বিধায় তার শৈশব কেটেছে বিহারে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর তার বাবা পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়েতে যোগ দেন। নতুন কর্মস্থল হয় সৈয়দপুরে।

মেট্রিকুলেশন পড়ার সময়ই মাকে হারান জয়নুল। বাবা অধিকাংশ সময় কাজে থাকায় ছোটভাইদের দায়িত্ব নিতে হয় নিজ কাঁধে। স্কুলে থাকা অবস্থাতেই জয়নুল তখনকার গোপন কমিউনিস্ট পার্টিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫০ সাল থেকে জয়নুল আবেদীন ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আইকম ও জগন্নাথ থেকে বিকম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন। এ সময়ে তিনি পড়াশোনার খরচের জন্য টিউশনি করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দু সাহিত্যে এমএ পাস করেন।

১৯৫৭ সালে উর্দু দৈনিক 'জং' পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে তাঁর। পরে বাংলাদেশের বেশকিছু জনপ্রিয় দৈনিক যেমন, মর্নিং নিউজ, বাংলাদেশ টাইমস, চিত্রালী, ওয়াতন ও সংবাদ সংস্থা এনা'য় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি 'জং' এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন ।

একশ'র বেশি চলচ্চিত্র কাহিনির রচয়িতা জয়নুল আবেদীনকে রুপালি জগতের অনেকে 'গুরু' বলে মানেন। পরিচালক এহতেশাম, মুস্তাফিজ, শিবলী সাদেক, অভিনেতা রহমানের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কথা সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস 'খোয়াবনামা' উর্দুতে অনুবাদ করেন জয়নুল আবেদীন।

যে কোনো কারণেই হোক, বিয়ে করেননি জয়নুল আবেদীন। পরিবারের অন্যরা পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় বাংলাদেশে কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল না তাঁর। জয়নুল আবেদীনের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ টাইমসের কনিষ্ঠ সহযোগী সাংবাদিক আবদুর রহমান খান। জয়নুল আবেদীন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জয়নুল আবেদীন আমাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতো ছিলেন। খেতে ভালোবাসতেন। হাজির বিরিয়ানি খুব পছন্দ করতেন। আমি তার কাছ থেকে উর্দু গজলের অর্থ বুঝে নিতাম আর মীর্জা গালিবের গজল,বাহাদুর শাহের গজলসহ ক্লাসিক্যাল গজলের তালিম নিতাম। নিয়ম করে ল্যাপটপে সিডি বাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গজলের মর্মার্থ শিখতাম। অসাধারণ মানবিক গুণাবলির অধিকারী জয়নুল আবেদীন বাংলাদেশ, বাংলাভাষা, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। তিনি বাংলাদেশকে নিজের মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। জয়নুল আবেদীন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন ভালো বন্ধুকে হারালো আর আমি হারালাম একজন শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যকে।

জয়নুল আবেদীন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শফিকুর রহমান বলেছিলেন, জয়নুল আবেদীন বাংলাদেশকে নিজের দেশ হিসেবে মনে করতেন। তাঁর চলে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জয়নুল আবেদীনের আরেক বন্ধু আমানুল্লাহ বললেন, জয়নুল এত ভালো মানুষ ছিলেন যে, আমার মনে হয় সে ছিল মহামানব।

উর্দু-বাংলা সাহিত্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তাঁর স্মরণসভায় বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও একুশে টিভি'র সিইও মনজুরুল আহসান বুলবুল জয়নুল আবেদীনকে একজন নীতিবান সাংবাদিক এবং মহামানব বলে প্রশংসা করেছেন।

প্রবীণ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী বলেন, জয়নুল আবেদীন যে একজন ভাষাসৈনিক ছিলেন তা অনেক পরে জানতে পারি। বাম রাজনীতি করার কারণে তিনি অনেকটাই প্রচারবিমুখ ছিলেন।

তাঁর একজন গুণগ্রাহী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শাবানা এক বাণীতে তাঁর এই গুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, জয়নুল আবেদীনকে তাঁর অবদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মরণোত্তর সম্মাননা জানানো উচিত।

নিভৃতচারী এই মানুষটির সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানেন না। অবাঙালি এই ভাষাসৈনিকের স্মৃতি রক্ষার্থে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতীয় প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানান ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র নেতৃবৃন্দ। রিপোর্টার্স ইউনিটির পক্ষ থেকে জয়নুল আবেদীনের নামে সাংস্কৃতিক পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়।

'জয়নু ভাই' নামে পরিচিত বাংলাদেশের অকৃত্রিম এই বন্ধু ২০১৭ সালের ৯ মার্চ না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। বাংলাদেশকে ভালোবেসে এ দেশের মাটিতে (১০ মার্চ) মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে হয়ে যায় তাঁর শেষ ঠিকানা।

লেখক: সাংবাদিক

‘মাহে-নও’ পত্রিকায় নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা

ড. শিল্পী ভদ্র দীপা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালে নজরুল অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন কলকাতায়। তিনি ছিলেন ভারতের নাগরিক, কিন্তু তাকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উচ্ছ্বাসের কমতি ছিল না। একদিকে তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ও প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি, অপরদিকে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে রচিত অসংখ্য গান-কবিতা-গজল পূর্ব পাকিস্তানে তাকে করেছিল অসাধারণ জনপ্রিয়।[১] স্বভাবতই ‘মাহে-নও’ পত্রিকায় নজরুলকে নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। নজরুলকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছিল, স্মৃতিকথা রচিত হয়েছিল এবং নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল। সবমিলিয়ে ১৯৪৯-৫৮ সাল পর্যন্ত নজরুল সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছিল ৪০টি। তন্মধ্যে কবিতা ১৫টি, স্মৃতিকথা সাতটি, গানবিষয়ক দুটি এবং নজরুল-সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা নিম্নলিখিত ১৭টি:

১. আবদুল মওদুদ, নজরুলসাহিত্য প্রসঙ্গ (২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা)।
২. মীজানুর রহমান, পাকিস্তানের পটভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা)।
৩. ডাক্তার এ. খাতুন, নারী জাগরণে নজরুলের দান (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা)।
৪. অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, নজরুলকাব্যে ‘পুরাণ’ (ঐ)।
৫. মোহাম্মদ মোদাব্বের, শিশুসাহিত্যে নজরুল (৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)।
৬. অধ্যাপক আবুল ফজল, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল (৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)।
৭. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ (ঐ)।
৮.মীজানুর রহমান, আমাদের আজাদী ও কবি নজরুল (৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা)।
৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজরুলের আগে ও পরে (ষষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা)।
১০. অধ্যাপক আবুল ফজল, নজরুলকাব্যে প্রেম (ষষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা)।
১১. অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, নজরুলসাহিত্যে নতুন ধারা (ষষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা)।
১২. সৈয়দ আলী আশরাফ, নজরুলকাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ (ঐ)।
১৩. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, নজরুলকাব্যে ইসলামি ভাবধারা (ঐ)।
১৪. সৈয়দ আলী আশরাফ, নজরুলের প্রেমের কবিতা (৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)।
১৫. ইব্রাহীম খাঁ, নজরুল ইসলামের অধ্যাত্ম-ধারা (ঐ)।
১৬. আবদুল কাদির, নজরুলের গল্প (ঐ)।
১৭. অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, নজরুল-সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ (৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

> *নারীজাগরণের অগ্রদূত কাজী নজরুল নারীকে স্বমহিমায় আত্মজাগরণে পথ দেখিয়েছেন, এ বিষয়টি ডাক্তার এ. খাতুন ‘নারীজাগরণে নজরুলের দান’ প্রবন্ধটিতে তুলে ধরেছেন*

আবদুল মওদুদ রচিত 'নজরুল সাহিত্য প্রসঙ্গ' এ ধারার প্রথম প্রবন্ধ। প্রথম লেখা বলে শুধু এটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, বক্তব্যের কারণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে পাকিস্তান-পূর্ব যুগে যে তর্কবিতর্ক হয়েছিল, তার উপসংহার এতে পাওয়া যায়। বিতর্ক হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামের পক্ষে না বিপক্ষে, তিনি বড়ো কবি না চড়া গলার কবি প্রভৃতি প্রসঙ্গে। একদল মুসলমান সমালোচক তাকে কাফের পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেননি। ফলে ইসলামের আদর্শ অঙ্গীকার করে সৃষ্ট পাকিস্তানে তার কী অবস্থান হবে, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। বিচারপতি আবদুল মওদুদ লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক নজরুলকে সানন্দে তাদের জাতীয় কবি হিসেবে বরণ করে নেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম 'সমকালে নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, তার মধ্য দিয়ে নজরুল-বিতর্কের অবসান ঘটে এবং '১৯৫০-এর মধ্যেই নজরুল ইসলাম মত, বিশ্বাস, ধ্যানধারণা নির্বিশেষে সর্বজনীন মানসে অধিষ্ঠিত।'

তারপর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল-সমালোচনা একটি নির্দিষ্ট গতি ও প্রকৃতি লাভ করে; বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে। সে পটভূমিতে 'মাহে-নও'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি রচিত হয়েছে।

আবদুল মওদুদ এ বিস্তৃত প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের সঙ্গেও তার তুলনা করেছেন এবং বিপ্লবী-কবি, দরদি কবি, করুণ রসের কবি, গানের রাজা, শিশুসাহিত্যিক, অনুবাদক, সাংবাদিক, আত্মপ্রত্যয়ের কবি, আজাদীর কবি, সমাজ-সংস্কারের কবি, সাম্যবাদের কবি, পাকিস্তানের কবি প্রভৃতি শিরোনামে নজরুল-সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করেছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ মীজানুর রহমানের 'পাকিস্তানের পটভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম'। পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনে কবির কবিতা ও গান যে অবদান রেখেছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন সমালোচক। এ প্রবন্ধটিও দীর্ঘ। তিনি বলেন, নজরুলের বাণীর উৎসমূল হচ্ছে আল্লাহ অর্থাৎ ইসলাম। তিনি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য নজরুলের রাজনৈতিক জীবনকে (ক) পটভূমিকা (খ) বিদ্রোহের ভূমিকায় (গ) পাকিস্তানের অবদান– তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন। 'পটভূমিকা'য় ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়, ১৮৫৭'র সিপাহি বিদ্রোহ, ১৮৭০-৭১'র আলীগড় আন্দোলন, ১৯১৪ সালে বিশ্বসমর, ১৯১৯'র জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড থেকে ১৯১৭ সালে '১৮ বছরের তরুণ যুবক নজরুল ইসলামের স্কুল থেকে পালিয়ে' ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগ দেয়া এবং ১৯১৯ সালে ফিরে এসে ধূমকেতুর মতো সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভাবের ঘটনাগুলো এসেছে। 'বিদ্রোহের ভূমিকা' অংশে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভের ২০ বছর শোষণ, নিপীড়ন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহী কণ্ঠ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। লেখকের ভাষায়– 'এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। সকল স্তরের মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে কাজী নজরুল ইসলামকে পাকিস্তান ও ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলতে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।' 'পাকিস্তানের অবদান' অংশে তিনি বলেন, 'নজরুল ইসলাম সাক্ষাৎভাবে লীগ বা কংগ্রেসে' যোগ দেননি, তবে 'মুসলিম লীগের আজাদী ও অত্মনিয়ন্ত্রণের বাণী নজরুলের মুক্তিপাগল প্রাণ-চাঞ্চল্যে-শিহরিত মুসলিম বাংলার স্তরে স্তরে সহজেই অভূতপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার করল।' পাশাপাশি তিনি হিন্দু সমাজকেও জাগাতে চেয়েছেন। নজরুলের সাম্যবাদ ও সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শের মূল ভিত্তি ইসলাম, যা পাকিস্তানেরও মূল ভিত্তি। আর এজন্যই 'ইসলামের সেই শাশ্বত শিক্ষা ও আদর্শের আবেদন প্রতিফলনেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে নজরুলের প্রায় সমস্ত কবিতায়, গানে ও গজলে।'

নারীজাগরণের অগ্রদূত কাজী নজরুল নারীকে স্বমহিমায় আত্মজাগরণে পথ দেখিয়েছেন, এ বিষয়টি ডাক্তার এ. খাতুন 'নারীজাগরণে নজরুলের দান' প্রবন্ধটিতে তুলে ধরেছেন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারী অপমূল্যায়নের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে এ প্রবন্ধে। রচনার শুরুতে লেখক বলেছেন, 'নারী আসিয়াছিল নরের সঙ্গিনীরূপে, দাসীরূপে নয়' কিন্তু মধ্যযুগেই নারী 'নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবে' পরিণত হলো। লেখক বৈদিক যুগ, মুসলিম যুগ এবং খ্রিষ্ট যুগের তুলনামূলক আলোচনা করে মুসলিম সমাজে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা বেশি ছিল বলে উল্লেখ করেন। তিনি উদ্ধৃতি হিসেবে খোদেজা, ফাতেমা, রহিমা, সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ বিবি, জাহানারা, জেবুন্নেসা প্রভৃতি মুসলিম নারীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির বিষয় তুলে ধরেন। কিন্তু কালক্রমে ধর্মীয় গোঁড়ামি, নারীর এ অধিকার ও প্রতিপত্তিকে নিঃশেষ করল। লেখকের ভাষায়, 'ধর্মান্ধ সমাজ পাপের কণ্ঠরোধের উৎসাহাধিক্যে তাহার উৎস হিসেবে নারীর গতিবিধির পরিধি সীমাবদ্ধ করিল। নারীকে করিল বন্দী, দিল তাহার চারিপাশে প্রাচীর তুলিয়া। সুযোগ-বিহীন, অধিকার-বিহীন নারী সমাজ হইল কর্ম্মহীন, হইল উদ্দেশ্য-বিহীন, হইল বিভ্রান্ত। কাল-ক্রমে তাহারা শুধু ভোগবিলাসের বস্তুতে পর্যবসিত হইল, হইল পুরুষের ক্রীড়নক।' এ অপব্যবস্থা থেকে নারীমুক্তির গুরুভার নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে এলেন নজরুল। তিনি নারীমুক্তি ঘোষণা করলেন সাম্যের বাণীতে এবং তিনিই প্রথম নারীর অধিকারকে পুরুষের পাশাপাশি স্বীকৃতি দিলেন–

'কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?'

লেখক বলেন, শুধু নারী-প্রতিষ্ঠা নয়, নজরুল 'আত্ম-প্রবঞ্চিত, অনাদৃত-অবহেলিত' নারী-আত্মা, তার চিত্ত-চিন্তার ক্ষেত্রকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, যাতে তারা সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে পুরুষের পাশে স্বমহিমায় দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ কবি নজরুল নারীর পূর্ণ আত্মিক বিকাশ চেয়েছেন। কবি আশাও করেছেন:

'সেদিন সুদূর নয়–
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!'

বিভিন্ন যুগের লেখনীতে প্রাচীন কাহিনি বা পুরাণ, উপমা, রূপক, চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু নজরুল-কাব্যে তা পেয়েছে সুন্দর রূপ। অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ 'নজরুল কাব্যে পুরাণ' প্রবন্ধে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বস্তুত পুরোনো কাহিনি ও ধর্মকাহিনি থেকে পুরাণের উদ্ভব হলেও পরবর্তীকালে তা নতুন অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে। লেখকের ভাষায়, 'এককথায় পুরাণ আর পুরাণ রইল না, বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতীক হয়ে দেখা দিল।' তিনি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে ক্লাসিকাল যুগ থেকে পুরাণের ব্যবহার আধুনিককালে আরো ব্যাপক হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করেছেন টি এস এলিয়ট। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখায় প্রথম পুরাণের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নয়। রবীন্দ্র-কাব্য, জীবনানন্দ দাসের কাব্যেও পুরাণ এসেছে, তবে নজরুল-কাব্যে তা এসেছে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে। তিনি 'সর্বজনীন ভাবের বাহন' হিসেবে পুরাণকে ব্যবহার করেছেন এবং তা হয়েছে 'আধুনিককালের ভাবের একটা প্রতীক মাত্র।' লেখক মনে করেন, পুরাণের এ সর্বজনীন রূপ ও ভাব-প্রতীক এবং রূপ-প্রতীক সম্পর্কে অনেক সমালোচকই অজ্ঞাত। ফলে সাহিত্য ও শিল্প বিচারেও তাদের অজ্ঞতাই থেকে যাচ্ছে। লেখক বলেন, নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের কাহিনি থেকেই পুরাণের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ দুই সমাজের ঐতিহ্য, ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনি মিলে বাংলা সাহিত্য 'বাংলাদেশের স্বভাবের পথ অনুসরণ করেই সার্থক হয়েছে।' অসীম প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা-কাব্যে আধুনিকতার অগ্রদূত মাইকেলের কাব্যেও বাংলার দুই প্রধান ঐতিহ্যের সমন্বয় নানা কারণে সম্ভব হয়নি, কিন্তু নজরুল-কাব্যে পুরাণের ব্যবহার সুন্দর, শিল্পসম্মতরূপ পেয়েছে। এদিক থেকে লেখক বলেছেন, 'নজরুল ইসলামই আধুনিককালে বাংলা কাব্য সৃষ্টির এই নতুন পথের অগ্রদূত।'

শিশু সম্পর্কে নজরুল ইসলামের মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরেছেন মোহাম্মদ মোদাব্বের 'শিশুসাহিত্যে নজরুল' প্রবন্ধে। লেখক বলেন, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় এবং নজরুল শিশুবিষয়ক কবিতা লিখেছেন উল্লেখযোগ্য হারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো 'হজম করার মতো সূক্ষ্ম রসবোধ শিশুদের না থাকা স্বাভাবিক' বলে তিনি মনে করেন। সুকুমার রায় সার্থক স্রষ্টা হলেও আনন্দ ব্যতীত তার শিশুসাহিত্যে অন্য কিছু নেই। এক্ষেত্রে নজরুল মতাদর্শকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। নজরুলের শিশু সাহিত্যে আনন্দের সঙ্গে কল্যাণ-ধর্মিতার সমন্বয় ঘটেছে। এতে আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে শিশুর চারিত্রিক গঠন সুন্দর হয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি দেখিয়েছেন, নজরুল-সাহিত্যে অনুসন্ধিৎসু শিশুমনের খোরাক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন–

'দেখবো এবার জগৎটাকে–
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।'

নজরুল বিশ্বাস করেন, প্রাণবান জাতি গড়তে হলে 'প্রতিটি শিশুকে এক একটি অগ্নিগিরি করে গড়তে' হবে। নিষ্কলুষ, প্রাণবন্ত নতুন জাতি গঠন করতে চেয়ে তিনি শিশুর চরিত্র গঠনে নীতিবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। শিশুদের প্রতি নজরুলের মমত্ববোধ লেখককে বিস্মিত করেছে। তাই প্রবন্ধের উপসংহারে দেখি, 'যার বুকভরা আগুন, তাহার অন্তরে এত বেগবান প্রস্রবণ– মমতার প্রস্রবণ লুকাইয়া থকিতে পারে এ কথা কে বিশ্বাস করিবে।'

প্রবন্ধটির শিরোনাম 'ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল' হলেও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রবন্ধে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলা সাহিত্যের এ তিন দিকপালের জীবন ও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনজনের নানা সাদৃশ্যকে অধ্যাপক আবুল ফজল তুলে ধরেছেন।

লেখক বলেন, নজরুল ও মাইকেলের জীবন, শারীরিক গঠন, রচনার অন্তর্নিহিত সুর, বিদ্রোহী মনোভাব, আজীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের কশাঘাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। এ 'ত্রি-সূর্যের' আবির্ভাব প্রসঙ্গে লেখক বলেন, 'এই তিনজন বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনিবার্য ধারা। এঁদের একজন না জন্মালেই সে ধারার বিপর্যয় ঘটত এবং এই ত্রি-সূর্যের যেসব উপগ্রহ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে 'শূন্যস্থান পূরণ' করেছেন– তাঁরা যেভাবে আলো দিয়েছেন, সেইভাবে আলো দিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের লেখার ধরন ও মনের গড়ন যেমন হয়েছে, কখনো কি তেমন হতো যদি না জন্মাতেন এই তিনজন?'

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মনে যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, মধুসূদন ছিলেন সে ঐতিহাসিক উন্মাদনার অগ্রদূত। মধুসূদনের উন্মাদনা রবীন্দ্রনাথে এসে শান্ত, সমাহিতরূপ পরিগ্রহ করে। লেখকের ভাষায়, 'বাঙালি হিন্দুর সে এক নবজাগরণ বা রেনেসাঁর যুগ– শান্ত ধ্যান-গম্ভীর ভবিষ্যতের আশা-উজ্জ্বল যুগ। সেই রেনেসাঁর সন্তান রবীন্দ্রনাথ।' রবীন্দ্রনাথের একদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার বিচিত্র রূপ, অন্যদিকে 'হিন্দু সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনবোধ ও আত্মোপলব্ধির সাধনা পরিণতি লাভ' করে। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধ নিয়ে এলো মানবতার এক নতুন চেতনা ও নতুন বাণী। এ যুগেই এলেন নজরুল। যেখানেই সমাজের অন্যায়, অবিচার, জুলুম, পরাধীনতা– সেখানেই তার বজ্রকঠোর বাণী ধ্বনিত হলো।

লেখক বলেন, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, নজরুল দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন; কিন্তু নজরুল দেশের সঙ্গে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের মানুষকে ভালোবেসেছেন। তাই হিন্দু-মুসলমান নিয়ে তার রচনায় কোনো প্রভেদ থাকেনি। এ বিষয়টিকে লেখক যুক্তিযুক্ত উদাহরণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বলেছেন, 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ তূর্য।' লেখক বলেন, 'যুগ-প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রণ-তূর্য আর যুগাতীত হিসেবে তিনি 'বাঁশের বাঁশরী' বাজিয়েছেন। উভয় ভূমিকাতেই তিনি সার্থিকভাবে অভিনয় করেছেন। তাঁর এই উভয় ধারার বহু রচনাতেই যুগ ও যুগাতীতের সংযোগ ঘটেছে।'

'নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারতের তিন বিখ্যাত কবিকে, একে-অপরের পরিপূরকরূপে দেখিয়েছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক বলেন, ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন করে, এজন্যই হিন্দু-ধর্মাবলম্বী রবীন্দ্রনাথকেও তারা সহজেই আপন ভাবতে পারে। বাংলা সাহিত্যের সৌরাধিপতি রবীন্দ্রযুগে নজরুল নিজেও একটি যুগ। নজরুলের বিশেষত্ব, অভিনবত্ব বিদ্রোহের প্রলয় নাচনে। রবীন্দ্র-কাব্যে দেশপ্রেম, মানবতার প্রতি সমবেদনা, সমাজের বিবিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ– সবই আছে তবে তার বিদ্রোহের রূপে নজরুলের মতো ভয়াল, ভীষণ্নতা নেই, আছে মৃদুতা। লেখক মনে করেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য নজরুলের কবি মানসে যোগ করেছে বেগ ও আলোড়ন।

'আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!'

তখন লেখক একে রবীন্দ্রনাথেরই জন্মান্তর বলেন। তিনি 'নজরুলের বারুদ-স্তূপে রবীন্দ্রনাথের অনুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ সংযুক্ত হওয়াতেই দেশের মনে আগুন ধরেছিল' বলে মনে করেন।

লেখক নজরুল, রবীন্দ্র ও ইকবালের ভেতর অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। প্রথমত, তিনজনই অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু আবেগের পরিমাণ ও প্রকারে। নজরুল চান ক্ষুধার জোরে সুধার জগৎ জয় করতে, রবীন্দ্রনাথ শাসান বিধাতার রুদ্র-রোষ দেখিয়ে, ইকবাল জিব্রিলের বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁদের তিনজনের ভেতরই রুদ্রের আসনে বসে থাকে গভীর ও সুন্দর। আপাতদৃষ্টিতে অনেকে মনে করেন, নজরুলে 'গভীর ও সুন্দর' নেই, আছে কেবল বিদ্রোহ; কিন্তু নজরুলের পরিণত অবস্থার কাব্যগুলো সে ভুল সহজেই ভাঙায়। অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাঁরা তিনজনই সৃষ্টিতে স্রষ্টাকে অনুভব করতে সচেষ্ট। তবে এ সাধনায় পৃথিবীর প্রতি তাদের বৈরাগ্য নেই। উপসংহারে লেখক বলেন, 'পাশ্চাত্যের কর্মবাদ ও প্রাচ্যের প্রেমবাদের সমন্বয় ঘটেছে এই তিনজন কবিতে। এই জন্য আধুনিকপন্থী জীবনের প্রতি তাঁদের আবেদন প্রাচ্যে এতোখানি সহজ-গ্রাহ্য হয়েছে।'

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আজাদীর প্রকৃত অর্থ, স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের আজাদীতে নজরুলের অবদান কতটুকু 'আমাদের আজাদী ও কবি নজরুল' প্রবন্ধে লেখক মীজানুর রহমান সে সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। আজাদী অর্থ স্বাধীনতা; কিন্তু লেখক বলেন, ইসলাম মতে, 'মুসলমান তথা মানুষ শুধু আল্লাহর দাস– অন্য কারো নহে।' ইসলামের আসল কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নেই– আমরা এ অগ্নিবাণীর দীক্ষা ইসলাম থেকেই পেয়েছি। লেখক মনে করেন, আল্লাহর এ গোলামি পার্থিব গোলামির চেয়ে অনেক বেশি গৌরবের।

লেখক বলেন, নজরুল ইসলাম, ইসলামের এ আজাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আজীবন পাকিস্তান-ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। এ নজির পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে আছে কি না, সে সম্পর্কে লেখক জানেন না। তার এ বক্তব্যের সমর্থনে নজরুলের 'অগ্রপথিক' থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

জীবনের সবক্ষেত্রে জোর কদম চলার নজিরবিহীন শক্তি ও সাহস নিয়ে নজরুল এগিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন সংগ্রামী, স্বদেশের মুক্তির আশ্বাসে তিনি ১৯১৭ সালে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগ দেন। এরপর ১৯১৯ সালে করাচি থেকে ফিরে এসে বজ্রকঠোর কণ্ঠে ঘোষণা দেন:

'বল বীর–
বল উন্নত মম শির! ...
আমি বিশ্বতোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।'

সে চেতনাই পরবর্তীকালে রচিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে তিনি জাতীয় জাগরণ আনতে সচেষ্ট হন। প্রায় আট বছর তিনি দেশকে জাগানোর গভীর সাধনা করেন। নজরুলের ভাষায়: 'এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। লিখেছি, বলেছি, চারণের মতো পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নেই কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হইনি।' কবি পাশ্চাত্য কবি হুইটম্যানের মতো দেশ ও জাতির মানবতার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

এরপর কবির উদ্দামতা থেমে গেল। আবেগে শান্ত, স্নিগ্ধ ও পূর্ণতা এলো– এ শান্ত, সুন্দরের মহিমা প্রকাশ পেল তার গানে। তিনি রোগগ্রস্ত হওয়ার অব্যবহিত আগে অধ্যাত্ম সাধনায় নিমজ্জিত হলেন। লেখকের বর্ণনায়, 'পার্থিব জীবনের হট্টগোলের মহারাজ, ভবঘুরে সম্রাট, সেরা বাউন্ডুলে ও বিদ্রোহী নজরুল আত্ম-গোপন করলেন।' ১৯৪২ সালের আগস্টে কবি দুরারোগ্য শিরপীড়ায় আক্রান্ত হলেন। ১৯৩৫ সালে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হলো জিন্নাহর নেতৃত্বে। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হলো। ফলে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কোন্দল-কলহে নজরুলের সাধনার 'হিন্দু-মুসলমান মিলন-তরী' ডুবে গেল। লেখক মনে করেন, পাকিস্তান প্রস্তাব পাসের ফলে 'জীবন্মৃত মুসলিম লীগের মরা গাঙে আসলো নতুন জীবনের সয়লাব– উন্মাদনা'। এ সময় নজরুল অধ্যাত্ম সাধনায়, সুন্দরের ধ্যানে সমাধিমগ্ন; কিন্তু লেখক তুলে ধরেন– সমাধির এ অতল গহ্বর থেকেও নজরুল জানালেন–

'কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?'

এ কবিতাংশে নজরুল নির্ভীক মুসলমানের প্রাণের আবির্ভাব চেয়েছেন। তবে কাব্যাংশটুকু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈত রয়েছে।

'নজরুলের আগে ও পরে' নামের সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে নজরুলের আবির্ভাবের আগে এবং নজরুল-পরবর্তীকালে পাকিস্তান-ভারতের মুসলমানদের সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের অবস্থানকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছেন।

প্রবন্ধের শুরুতে নজরুল-মানসে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরিতে পারিবারিক আবহ এবং লেটোর দলের প্রভাবের কথা লেখক বলেন। নজরুলের কাব্য সাধনায় হিন্দু-ঐতিহ্য, হিন্দু-ভাবধারা এবং চিন্তাধারণার প্রভাবের কারণ হিসেবে তিনি তার প্রথম জীবনের সংস্কৃতি-চর্চাকে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীকালে সৈনিক জীবনাবসানে কলকাতায় হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব, বৈবাহিক আত্মীয়তার সূত্রে হিন্দু মহল্লায় বসবাস প্রভৃতি বিষয়কে উল্লেখ করেন।

লেখক প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন, নজরুলের পূর্ববর্তী ১০০ বা ৫০ বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের অবস্থান ছিল দুর্বিষহ। লেখকের ভাষায়, 'এককথায়, মুসলিমদের মুসলিম সত্তা সব হারিয়ে নিঃস্বের বেশে মানব-সভার এক কোণে পড়ে ছিল– হয়তো বা পরিপূর্ণ মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।' সে সময় উর্দু কবি হালির জাগরণী গান, কবি ইকবালের ইসলামি জোশ, সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন, ১৯১২ সালে ইসলামি রাজশক্তির পতন তেমনভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি, কারণ 'তাঁরা বাংলা তরজমা ও বাংলার নিজস্ব আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ব্যাপকভাবে বঙ্গভাষী মুসলিমের জীবন-মনকে' আকৃষ্ট করতে পারেনি। এরপর নজরুল এলেন সর্বত্র 'প্রাণকে জাগাবার' মন্ত্র নিয়ে। কবির অসাম্প্রদায়িক বা আন্তর্জাতিক মানবতাবোধ, দেশ, সমাজ ও মানুষের ওপর অত্যাচারে তার বজ্রকঠোর কণ্ঠ, এ সবেরই উৎসভূমি ইসলাম বলে তিনি উল্লেখ করেন। তারই ব্যাখ্যায় ইসলাম মানবীয় ব্যাখ্যা পেল। সবকিছু মিলিয়ে লেখক মনে করেন অতিরঞ্জন না করেই বলা যায়, বাঙালি মুসলিমের আসল ঋণ নজরুল ইসলামের কাছে যত ও যেমন, ততখানি ও তেমনটা আর কারোর কাছেই নয়। চার-পাঁচ কোটি মুসলিমের প্রাণদাতা যিনি, দুনিয়ার সব মুসলিমেরই তিনি অতি আপনজন, কোরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করলে এ কথা বারংবার ঘোষণার যোগ্য হয়ে দাঁড়ায় না কি?' এজন্য তিনি বলেন, 'পড়ো : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আত্মার উৎসমূল থেকে যে দিন আমাদের রসনায় উদ্‌গত হবে, কবি নজরুল ইসলামের সাধনা সেই দিনই আমাদের জন্য সার্থক হবে।'

মানষের হৃদয়বৃত্তিগুলো শাশ্বত, তাই এরা অজর, অমর, চির নতুন ও চির মধুর। এ শাশ্বত, মধুরকে নজরুল তার কাব্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন। অধ্যাপক আবুল ফজল 'নজরুল কাব্যে প্রেম' প্রবন্ধটিতে এ বিষয়েই আলোকপাত করেছেন। তিনি মনে করেন, দুঃখ-বেদনার কবি নজরুল, তার হৃদয়-বেদনার সঙ্গে স্বদেশের (বাংলাদেশের) প্রকৃতিকে একান্ত করে দিয়েছেন, তাই 'তাঁর প্রেম-বিরহের সংগীতের ছন্দ ও ভাষা হয়েছে চোখের জলে সিক্ত ও পুষ্প-কোমল'। তার এ সিক্ত, কোমলতাই মানুষের মর্মকে স্পর্শ করেছে। নজরুলের বিদ্রোহ, নজরুলের দেশপ্রেম, নজরুলের সাহিত্য– সবক্ষেত্রেই তিনি সবল মানুষ বা মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। প্রেমেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। লেখক বলেন, 'তার প্রেমও সবল মানুষের প্রেম। তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ আছে; কিন্তু ন্যাকামি নেই। মান, অভিমান, রাগ, দ্বেষ কিছুই তার প্রেম থেকে বাদ পড়েনি; কিন্তু এসবকেই রূপ দিয়েছেন তিনি সবল মানুষের মতোই।' নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলো অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের রচনা। এতে গভীরতর আত্মজিজ্ঞাসা ও সুস্থির প্রেমের সুস্নিগ্ধ স্পর্শের সৌন্দর্য নেই। লেখক বলেন, কবিতাগুলো রচনার অনেক পরে তার অসংখ্য গানে প্রেমের সুস্নিগ্ধ ও মধুর স্পর্শ-মহিমা লাভ করে। তিনি আরো বলেন, 'এই সব গান শুধু পড়ে গেলেও যাকে বলা হয় 'কাব্য-সুধা-রস'– জোর করে বলতে পারি তাঁর অনির্বচনীয় আনন্দ থেকে কোনো পাঠকই বঞ্চিত হবে না।' সব শিল্পের মূলেই রয়েছে প্রেমের প্রেরণা। নারীপ্রেমই এর উৎসভূমি।

যুগ ও জাতির সমস্যায় সচেতন হয়ে কবি নজরুল বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে নতুন ধারার সূত্রপাত করেন, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই 'নজরুল সাহিত্যে নতুন ধারা' প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কবি-সাহিত্যিক দেশের সচেতন ব্যক্তিত্ব; যুগ, জাতির সমস্যায় তারাই আলোড়িত হন বেশি। জাতীয় জীবনের দুর্দিনে তাঁরাই কাণ্ডারির ভূমিকা নেন। লেখক এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সচেতন প্রয়াসে মহাবিপ্লব সাধনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নজরুলের কবি-মানস গড়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ, খেলাফত আন্দোলন– রাজনৈতিক এ সমস্যাগুলো নজরুলের স্পর্শকাতর প্রাণে আলোড়ন তোলে। তিনি কখনো সৈনিক, কখনো বিদ্রোহী, কখনো জাতির অগ্রনায়ক, কখনো পথপ্রদর্শকরূপে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। নজরুল মনে করেন, সংগ্রামে জয়ী হতে হলে জনশক্তি ও আর্থিক সুবিধা সর্বাগ্রে

প্রয়োজন। তাই হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে সাম্যের গানে এক সুরে বেঁধে মহাবিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মাটির সুষ্ঠু চাষ ও সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। লেখক বলেন, মুসলিম জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নজরুলের হাতেই জীবন্ত রূপ পায়। এক্ষেত্রেও তিনি নবযুগের প্রবর্তক। তিনি আরো বলেন, 'যুগ ও জাতির সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যের নূতন ধারার সূত্রপাত করেন নজরুল। তাঁর পরবর্তী কয় বছরের বাংলা সাহিত্যের খতিয়ান নিলেই মনে হবে যে, সেই পথ ধরেই বাংলা কাব্য-সাহিত্য এগোচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এগোবে।'

সৈয়দ আলী আশরাফ 'নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ' প্রবন্ধে বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের কৌশলকে তুলে ধরেছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যে বিশেষ মুসলমানি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নজরুলের অব্যবহিত আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন, তবে নজরুল কাব্যে প্রথম ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার শুরু হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক উল্লেখ করেছেন, প্রথম জীবনের রচনায় 'ভাষা ও ভাবধারায় হিন্দু প্রভাবই প্রবল' ছিল। তিনি উদাহরণস্বরূপ 'পূজারিণী' ও 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রসঙ্গ আনেন। তিনি বলেছেন, পূজারিণীতে মাত্র দুটি আরবি-ফারসি শব্দ এসেছে। যথা : আরাম ও বেদরদি। তবে 'আরাম' বাংলা ভাষায় এত প্রচলিত যে, এর উৎসস্থল অন্য ভাষায় রয়েছে বলে বোধ হয় না। বিদ্রোহীতেও তিনি নয়টি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন, অথচ হিন্দু উপকথা থেকে উপমা এসেছে ত্রিশটি। এটিকে লেখক নজরুলের হিন্দু উপকথার পরিবেশে স্বচ্ছন্দ বিহারের ফল বলেছেন। তিনি লিখেছেন, নজরুলের শেষজীবনের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে বেশি। এ ঐতিহ্য নজরুল-কাব্যে স্থান পেয়েছে দু'ভাবে, দু'জায়গায়। প্রথমত, মুসলিম জীবনের ঘটনা বর্ণনে অথবা মুসলিম ইতিবৃত্ত থেকে রূপাঙ্কনে পরিবেশ সৃজনের জন্য যথেষ্ট আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের ঘরে ঘরে যেসব শব্দ প্রচলিত অথচ হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত– এমন অনেক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন স্বাভাবিক যে কোনো অনুভূতি প্রকাশের জন্য, যেমন– 'পানি', 'তুফান', 'দরদি', 'জবেহ', 'আতশি', 'সেরেফ' প্রভৃতি।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক নজরুলের 'ঈদ মোবারক', 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়', 'নও-রোজ', 'চিরঞ্জীব', 'জগলুল', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দাহাম', 'মহররম' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করেন।

'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়' কবিতায় ব্যবহৃত 'বুঢ়ঢা পীর' শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বুঢ়ঢা পীর' কথাটি মুসলমান মানসে যে ভাবের ঢেউ খেলে, 'বুড়ো পুরোহিত' কথাটি তেমন নয়। কারণ মুসলমানদের বিশ্বাস পীরের হাত ধরে তারা বেহেশতে যাবে। মুসলিম জীবনের এ বিশ্বাসকে অর্থাৎ ইসলামি পরিবেশকে তুলে ধরতে নজরুল তাই 'পীর' ফারসি শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'পাপ' কবিতায় 'পাপ মুলুকে' না বলে 'পাপ জগৎ' বলতে পারতেন, কিন্তু লেখক বলেন, 'মুলুকে' শব্দটি দিয়ে যে ঘৃণার ভাব প্রকাশ পায়, তা সম্ভব হতো না। তিনি মনে করেন, 'পাপ মুলুকে' বলার সঙ্গে সঙ্গেই 'মগের মুলুকের' কথা মনে আসে এবং 'মগের মুলুকের' বিশৃঙ্খলার সঙ্গে এ 'পাপ মুলুকের' বিশৃঙ্খলার সামঞ্জস্য রয়েছে। এছাড়া কল্পলোক ও অবস্থানুযায়ী অনুভূতি সঞ্চারের জন্য তিনি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। নজরুল অনেক অপ্রচলিত ফারসি ও উর্দু শব্দ থেকে কতগুলো নতুন শব্দ আমদানি করেছেন। যেমন– 'মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ' অংশে 'হ্যায়' শব্দটি উর্দু ক্রিয়াপদ, তাই বাংলায় এ শব্দটি চলবে না। কিন্তু নজরুল তাকে ব্যবহারের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন অনুভূতির বৈশিষ্ট্যে। যদি বলি 'হর্দম আছে হর্দম ভরপুর মদ'– তবে তাতে কথার মত্ততা ম্লান হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে নজরুল বাংলা শব্দের ব্যবহার না করে ব্যবহার করেছেন স্বল্প পরিচিত আরবি-ফারসি শব্দ। লেখক উদাহরণ হিসেবে কবির 'চাঁদনি রাতে' ও 'মানুষ' কবিতার উল্লেখ করেছেন এ রীতির জন্য।

লেখক বলেন, নজরুলের কৃতিত্ব হচ্ছে, সংস্কৃতজাত শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের সহজ ব্যবহারে। এক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন দুই-এক জায়গা ছাড়া। তার এ কৃতিত্বের কারণ হিসেবে লেখক দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন– (ক) সংস্কৃতজাত শব্দের সংগীতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার, (খ) ছন্দ ও অনুভূতির তীব্রতায় ভাষার বৈষম্য ঢেকে যায়। যেমন :

'গাহি তাহাদের গান–
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে-ফলে।'

এখানে ছন্দে বেগ ও আবেগ সঞ্চারের জন্য কবি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এতদ্ব্যতীত মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ নজরুল এত ব্যবহার করেছেন, লেখকের ভাষায় 'যা নজরুলের পূর্বে কেউ ব্যবহার করেননি, নজরুলের পরেও আজ পর্যন্ত তার সার্থক ব্যবহার হয়নি।' উপসংহারে লেখক বলেন, নজরুল হিন্দু-মুসলিম 'উভয় সমাজের ঐতিহ্যবাহী শব্দ একত্রে ব্যবহার করতে সক্ষম হননি। দুই সমাজের ভাবধারা ও ঐতিহ্য মূলত কখনো মিলিত হয়নি গঙ্গা-যমুনার ধারার মতো। ফলে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলন লক্ষ করি, উপমা ও ঐতিহ্যবাহী শব্দে সে মিলন সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করে থাকি যা হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত। যেমন– 'পানি', 'তশতরি', 'শিরনি', 'ফিরনি', 'খাঞ্চা', 'বিবি', 'বাঁদি', 'গোলাম', 'তশরিফ'। এগুলো মুসলিম পরিবেশ রচনা করতে পারে, কিন্তু হিন্দু পরিবেশ রচনা করবে না। যেখানে যেই পরিবেশ রচনার প্রয়োজন নেই, সেখানে এসব শব্দ ব্যবহার অহেতুক। কিন্তু পরিবেশের খাতিরে ও মুসলিম-মানসের সঙ্গে সংযোগের জন্য আরবী-ফারসীবহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করা সংগত। নজরুল-কাব্য থেকে আমরা সেই কথারই সাক্ষ্য পেয়ে থাকি।'

নজরুলের রচনায় ইসলামি ভাবধারা কোন দৃষ্টিতে, কী আদর্শে রূপ পেয়েছে, 'নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা' প্রবন্ধে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন সে নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

লেখক মনে করেন, কবিতার মূল্যায়ন কোনো জাতীয়, ধর্মীয় বা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে করা ঠিক নয়। কারণ লেখকের বা পাঠকের মন যদি বিশেষ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করে, তাহলে সে রচনা কাব্য-রস সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবেই। তিনি বলেন, 'নজরুল ইসলাম কাব্য-রস ক্ষুণ্ন না করেও মানবীয় ভাবধারার যে বিশেষ অংশকে সচরাচর ইসলামি ভাবধারা বলে থাকি, তার বলিষ্ঠ অথচ সুন্দর পরিচয় দিতে পেরেছেন।'

লেখক নজরুল কাব্যে ইসলামি ভাবধারা প্রসঙ্গে প্রথমেই তার শব্দচয়নের কৃতিত্বের কথা বলেন। তিনি বাংলার পাশাপাশি আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করে ইসলামি ভাব ফুটিয়ে তুলতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। লেখক বলেন, 'ভাব-ই বিশেষভাবে ইসলামী হতে পারে শব্দকে ইসলামি বা অন-ইসলামি বলা বড়জোর আংশিক সত্য।' যেমন–

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া–,
'আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া!'
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে।
(অগ্নিবীণা)

এখানে নজরুল কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দ (সিয়া, আসমান, লা'ল, দুনিয়া, আম্মা, তেরি, খুন, খুনিয়া, কারবালা, ফোরাত, আসু) ব্যবহার করে কারবালা প্রান্তরের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির অনুপম কাব্য সৌন্দর্যে রক্তস্নাত কারবালায় সীমারের ছোরার আঘাতে ফাতেমা-নন্দন হুসায়েনের নৃশংস খুনের চিত্র ফুটে উঠেছে। লেখক মনে করেন, 'মহররম' কবিতার উপরিউক্ত উদাহরণটি শুধু ইসলামী ভাব বা পরিবেশ সৃষ্টি করেনি বরং এর আবেদন সর্বজনীন। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সব দেশের অন্যায়-অত্যাচারের রিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম-চিত্র ফুটে উঠেছে। কবির ব্যক্তি উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাগুলোরও ('কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'চিরঞ্জীব', 'জগলুল', 'আমানুল্লাহ্', 'উমর ফারুক') একটি সর্বজনীন আবেদন আছে। দুনিয়ার 'যে কোনো স্বাধীনতাপ্রিয় অত্যাচার-প্রতিরোধকামী সংস্কারমুক্ত সজ্জনের' চিত্র কবিতাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। লেখক বলেন, লেখার উপকরণ লেখক যেখান থেকেই নিন বা যে পাত্রেই পরিবেশন করুন, প্রকৃত কাব্য তখনই সৃষ্টি হবে, যখন স্রষ্টা তাকে প্রাণবন্ত করতে পারবেন। তাছাড়া 'ইসলাম একটা মহান জীবন্ত আদর্শ, কোনো দেশে বা সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ নয়।' এতে 'লোক-হিত, মানবপ্রেম, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা, সমদর্শিতা এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে জান-মাল কোরবানি করার মতো সাহসের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।' তবে তিনি মনে করেন, 'ইসলামিক কালচারের মর্মকথা কী, আর কেমন করে তা কাব্য ও সাহিত্যে পরিবেশন করতে হয়, কবি নজরুলের রচনায় তার একটা উন্নত আদর্শ পাওয়া যায়। বর্তমানে ইসলামি সাহিত্যের বা ইসলামি কবিতার নাম দিয়ে কেউ কেউ এমন প্রোপাগান্ডামূলক রচনা ছাপছেন, যা রসাশ্রিত না হওয়ায় সাহিত্য বা কাব্য নামে পরিচিত হতে পারে না।'

লেখক তাই আন্তরিকভাবে চেয়েছেন, 'কৃতী সাহিত্যিক ও কবিরা নজরুলের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই ধারাকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলতে চেষ্টা করবেন।'

নজরুল সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় প্রেম, বিরহে প্রেম এবং বিদ্রোহেও প্রেম। এ প্রেমিক কবির বিচিত্রধর্মী কবিতা নিয়ে সৈয়দ আলী আশরাফ 'নজরুলের প্রেমের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। নজরুলের জীবনের প্রেম ভাবনাকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে বা জীবনে তিনি ব্যক্তিবিশেষের রূপ ও ভালোবাসার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে তৃপ্তি পেতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে বা মধ্য বয়সে তিনি নব নব প্রেমিকার মধ্যে তার অনামিকা প্রিয়াকে খুঁজেছেন। লেখক বলেন, 'এ প্রেম পরিণত বয়সের বেদনা-দুঃখ সহ্য করতে সক্ষম নয়, এ প্রেম বাস্তব জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতরে জেগে থাকা, অব্যর্থ ধ্রুবতারার মতো এক লক্ষ্য কম্পাস কাঁটার মতো প্রেম নয়। এ প্রেমে মত্ত হয়ে স্বপ্ন রচনা চলে, কিন্তু জীবনযাপন করা চলে না।' তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ নজরুল জীবনের শেষদিকে সে প্রেম বাস্তব জীবনে বন্দি থাকেনি। 'মানুষকে ছাড়িয়ে অনন্ত প্রেমিকার সন্ধানে তার দুরন্ত বোরাক ছুটে চলেছে।' নজরুলের প্রেম রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার কাছে প্রেম নিবেদনের মতো দার্শনিক তত্ত্ববহুল প্রেমের কাব্যে পরিণত হয়নি। বরং নজরুলের প্রেমিকা রক্তমাংসের গড়া সজীব মানুষ, হাসি-কান্নায় আন্দোলিত মানুষ। কবি প্রিয়া-বিরহে তাই 'দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তাঁর চোখ দিয়ে পানির নহর বয়ে যায়, তিনি শীর্ণ শুষ্ক হয়ে ওঠেন।' প্রেয়সীর নিষ্ঠুরতা, ব্যথা, কবি-প্রাণে অস্থিরতা আনে। তিনি বিক্ষুব্ধ হন আবার প্রেয়সীকে ব্যথিত দেখে খুশি হন। এ পর্বে মানবীয় প্রেমের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। তৃতীয় পর্বের উদাহরণে বলা যায়–

'কার অনুরাগ নাহি পেয়ে তুমি লাল হয়ে ওঠ রাগে?
প্রভাত-সূর্যে, সৃষ্টিতে সেই রাগের বহ্নি লাগে।
কাহার বিরহ-জ্বালায় জ্বালাও বিশ্ব, পরম স্বামী?
সে কি আমি? সে কি আমি?
(সে যে আমি– নতুন চাঁদ)

এখানে লেখক কবির এ ভাবধারার সঙ্গে ইকবাল ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব লক্ষ করেছেন। তবে লেখক বলেন, 'নজরুলের ভাবধারায় পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যের হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের ও সুফি মতবাদের প্রভাবই বেশি লক্ষ করার বস্তু। তবে এক্ষেত্রে ইকবালের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।' ইকবালের অনুভূতির মূলে 'আমিত্বকে বড়ো করে তোলার যে আদর্শ তাঁর কাব্য ও দর্শনে রয়েছে, লেখক বলেন, সে-ই 'আমিত্ব'ই নজরুলকে বিস্মিত, সচকিত ও শক্তিমন্ত করেছে। এই আমিত্ব শেষে বড়ো হয়ে উঠেছে স্রষ্টার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নির্ণয়কালে।' অর্থাৎ 'প্রণয় ব্যক্তিবিশেষের গণ্ডি এবং কামনা-বাসনার গণ্ডি ছাড়িয়ে যখন পরম সুন্দরের প্রতি আকর্ষণরূপে অভিব্যক্ত তখন আমিত্ব যেমন বিসর্জন দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগল, তেমনি জাগল নিজের প্রতি অসীম আত্মার প্রেম সম্বন্ধে সচেতনতা।'

নজরুল ইসলামের বংশানুক্রমে রয়েছে অধ্যাত্ম সাধনার ঐতিহ্য। ছেলেবেলা থেকেই তিনি এ পরিবেশে বেড়ে উঠেন। ইব্রাহীম খাঁ 'নজরুল ইসলামে অধ্যাত্ম-ধারা' প্রবন্ধে সে ধারারই কিছু পরিচয় তুলে ধরেছেন। ১০ বছর বয়স থেকেই নজরুল 'হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজারে খাদেমগিরি ও ওই মসজিদে ইমামতি করতে থাকেন।' এ সময় কবির অধ্যাত্ম-জীবনের উন্মেষ ঘটে বলে লেখক উল্লেখ করেন। এরপর লেটোর দলের 'বাঁধনহীন সংগীতময়ী জীবন'-এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে মেসোপটেমিয়ার সৈনিক শিবিরে থাকাকালে কবি আরবদের আত্মার স্বাধীনতা-মুক্তির জন্য বিখ্যাত 'শাতিল আরব' কবিতাটি লেখেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে 'কবিতায়, গানে, গজলে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়' নতুন প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে দিলেন। লেখক বলেন, এসবের পশ্চাতে তার অধ্যাত্ম প্রেরণাই লুকিয়ে ছিল– 'কেবল মাঝে মাঝে তা বিজলির মতো চমকে দিয়ে যায়।'

'ওগো কাজী খামখা নীরস তত্ত্ব কথা কও কাকে?
ভাঙতে পারে প্রিয়ার ঈষৎ চাওয়া লাখো ও বাকে।'

কবির ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তার প্রকাশ মেলে। ১৯২৫ সালে লেখকের চিঠির জবাবে কবি লিখেছিলেন, 'আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ হতাশ্বাসে সেই নিশ্চিন্ত শান্তি– যার ধ্যানালোকে বসে আমি তপস্যা প্রোজ্জ্বল নেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব।' নজরুল ইসলামের কাব্য-জীবনের শেষদিকে তিনি পরম সুন্দরের সাধনায় সমাহিত হন গভীরভাবে। ১৯৪১ সালে ১৬ই মার্চ বনগ্রামের এক সাহিত্য সম্মেলনে কবির অভিভাষণে এ সুরেরই অনুরণন ঘটে।

'আমি কখন যে গভীর সমাধির অতল গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, তা আজও স্মরণাতীত। ... ঐ সমাধির মাঝে শুনতাম, অনন্ত প্রকাশ-জগৎ যেন আমায় ঘিরে কাঁদছে, 'ফিরে আয়, ফিরে আয়!' কেন যেন মনে হতো, এ নিথর নির্বিকার শান্তির পথ আমার নয়। সমাধির তৃষ্ণা যখন মিটল, পরম একাকীর পরম শূন্য সেদিন যেন আমার সাথীহীন একাকিত্বের বেদনায় কেঁদে উঠল। সেই রোদনের অসীম প্রবাহ-কূলে দেখা পেলাম আমার চির-চাওয়া পরম সুন্দরের। ... যদি তাঁর অনন্ত শ্রীর একটি রূপ-রেণুকেও আমার কাজে, গানে, সুরে আজ রূপ দিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি ধন্য হব– পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হবে। ... আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন-মরণ, তার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। ... আমার পরম মধুময় অস্তিত্বের প্রেম শক্তিতে আত্মসমর্পণ করে আমি বেঁচে গেছি, আমার অনন্ত জীবনকে ফিরে পেয়েছি।'

কবি দেশ ও সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য এ সাধন-পথে পা দিয়েছিলেন। কবির ভাষায়– 'তাই এবার সাগরের পানে চলেছি– দেখি মেঘ হয়ে ফিরে এসে ঢল হয়ে ঝরে পড়ে এ-কে সুজলা-সুফলা করতে পারি কি না।' কবি চেয়েছিলেন অধ্যাত্মলোক থেকে অমৃতের ভাণ্ড এনে তার মৃত ভাইদের দেহে নবপ্রাণ সঞ্চার করতে। কিন্তু তার ধ্যান আর ভাঙেনি। তার ধ্যান ভাঙছে না দেখে লেখক প্রবন্ধের শেষাংশে তাই রেখেছেন এক মর্মভেদী জিজ্ঞাসা– 'আমাদের কবি কি তাঁর পরম প্রিয় পরম সুন্দরের রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাদের কথা ভুলে গেলেন? না, তাঁর আঁচল এখনও ভরে নাই, তাঁর অমৃত ভাণ্ড এখনো পূর্ণ হয় নাই বলে তিনি ফিরতে দেরি করছেন?'

'নজরুলের গল্প' প্রবন্ধটি রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে প্রচারিত হয়। আবদুল কাদির এ প্রবন্ধে নজরুল রচিত নয়টি গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। নজরুলের যে গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, গল্পের পাত্রপাত্রী সবাই মুসলিম এবং মুসলিম সামাজিক ও পারিবারিক আবহে গল্পগুলো রচিত হয়েছে। 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি গল্পে সৈনিক নজরুলের আত্মজীবনীর আভাস পাওয়া যায়। 'রিক্তের বেদন', 'ব্যথার দান' গল্প দুটোতে আবেগপ্রবণতা বিশেষ করে 'তরুণ প্রেমের উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও বিরহী চিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এগুলোকে করেছে রসমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। এ গল্প দুটি থেকে নজরুল যে পরবর্তীকালে বিখ্যাত সুরস্রষ্টা হবেন, তার পূর্বাভাস মেলে। 'অতৃপ্ত কামনা', 'ঘুমের ঘোরে', 'মেহের নিগার', 'স্বামী হারা', 'শিউলী মালা' প্রভৃতি গল্পে মানবীয় হৃদয়বৃত্তিজাত আবেগ, অনুভূতি, দুঃখ-বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী গল্প হচ্ছে 'রাক্ষুসী'। স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদে স্বামীকে হত্যা। গল্পের নায়িকা বিন্দির এ পদক্ষেপ নামকরণের সঙ্গে যথার্থ হয়েছে। লেখক 'শিউলী মালা' গল্পের তৃতীয় গল্প 'অগ্নিগিরি'কে নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প বলেছেন। তিনি বলেন, 'এ গল্পটির আরম্ভ হাসির দীপ্তিতে আর সমাপ্তি অশ্রুর কুয়াশায়।' কৈশোরে নজরুল ময়মনসিংহের দরিরামপুর গ্রামে কিছুদিন পড়ালেখা করেন। গল্পগুলোয় 'তাঁর তৎকালীন জীবনের যৎকিঞ্চিত ছায়া' আছে বলে লেখক প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন 'নজরুল সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ' প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ', 'চিত্তনামা', 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থগুলোর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বহু পূর্ব থেকেই বাংলাভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দু লেখকরাও তাদের লেখায় 'বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন।' এক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দেন। লেখক একসময় রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন। এবং 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার এক সংখ্যায় এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ছেপেছিলেন। অন্যদিকে মুসলমানদের রচিত পুঁথি সাহিত্যেও বিস্তর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে ব্যাপক কোনো কাজ হয়নি। সর্বপ্রথম অস্ট্রিয়ার পাদ্রী William Goldsack 'Mussalmani Bengali English Dictionary' নামে পুঁথি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি অভিধান তৈরি করেন। কলকাতা থেকে বইটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। অভিধানটিতে Goldsack প্রত্যেক মূল (আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং উর্দু) শব্দের উল্লেখ করেন। নজরুল ইসলামের প্রথমদিকের আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবে তার বিখ্যাত কবিতা 'শাতিল আরবে' প্রভূত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নজরুল ইসলামের ২২টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বলেন, তার কিছু কিছু কবিতা এখনও অসংগৃহীত ও অপ্রকাশিত রয়েছে– 'বিশেষ করে তিনি ব্যক্তিবিশেষের নামে আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ যেসব কবিতা লিখেছিলেন, তা এখনও অধিকাংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। এখানে-সেখানে মাঝেমধ্যে এই ধরণের কবিতা ছাপা হতে দেখেছি। সেগুলো এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।' তিনি মনে করেন, নজরুল ইসলামের কবিতাগুলোর একটি Concordance বা বর্ণনাক্রমিক সূচি থাকা আশু প্রয়োজন। যেমনটি কোরআন শরিফের অভিধান এবং বাইবেলে থাকে। তিনি নজরুলের অন্যান্য বইয়ে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের তালিকা প্রকাশের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সংখ্যায় তিনি তালিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা দেননি এবং কোন সংস্করণ ব্যবহার করেছেন, তা উল্লেখ করতে পারেননি। তিনি মনে করেন, বিষয়ানুযায়ী শব্দগুলোর বিভাগ করতে পেলে জীবন ও জগতের কোন কোন পর্যায়ে কবি কোন কোন আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা বোঝা যেত। যার মাধ্যমে নজরুলের অন্তর্জীবনের বিকশিত জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যেত।

তথ্যসূত্র

১. মুক্তিযোদ্ধাদেরও প্রধান অস্ত্র ছিল নজরুলের কবিতা ও গান। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে, স্বাধীনতাসংগ্রামে মুক্তিসৈনিকদের প্রতিমুহূর্তে উদ্দীপিত করেছে নজরুলের সংগ্রামী গান আর কবিতা।' (রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৭২) পৃ. ৬০২)

২. আবদুল মওদুদ, নজরুল সাহিত্য প্রসঙ্গ (২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা), সম্পাদক, জনাব আবদুর রশিদ।

৩. মীজানুর রহমান, পাকিস্তানের পটভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা), সম্পাদক, মীজানুর রহমান।

৪. ডাক্তার এ খাতুন, নারী জাগরণে নজরুলের দান (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা), সম্পাদক, মীজানুর রহমান।

৫. অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, নজরুল কাব্যে 'পুরাণ' (ঐ), সম্পাদক, মীজানুর রহমান।

৬. মোহাম্মদ মোদাব্বের, শিশুসাহিত্যে নজরুল (৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা), সম্পাদক, মীজানুর রহমান।

৭. অধ্যাপক আবুল ফজল, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল (৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

৮. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ (ঐ), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

৯. মীজানুর রহমান, আমাদের আজাদী ও কবি নজরুল (৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

১০. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজরুলের আগে ও পরে (৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

১১. অধ্যাপক আবুল ফজল, নজরুল কাব্যে প্রেম (৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

১২. অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, নজরুল সাহিত্যে নতুন ধারা (৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

১৩. সৈয়দ আলী আশরাফ, নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ (ঐ), সম্পাদক, জনাব আবদুল কাদির।

১৪. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা (ঐ), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

১৫. সৈয়দ আলী আশরাফ, নজরুলের প্রেমের কবিতা (৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

১৬. ইব্রাহীম খাঁ, নজরুল ইসলামের অধ্যাত্ম-ধারা (ঐ), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

১৭. আবদুল কাদির, নজরুলের গল্প (ঐ), সম্পাদক, জনাব আবদুল কাদির।

১৮. অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, নজরুল-সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ (৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা), সম্পাদক, আবদুল কাদির।

লেখক: গবেষক

প্রবীণ সাংবাদিকদের সামগ্রিক অবস্থা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

ডা. মহসীন কবির

বাংলাদেশে সাধারণত যাদের বয়স ৬০ বছর, তারাই প্রবীণ ব্যক্তি। আধুনিক যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের অবদানে চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলপ্রসূ উন্নতি সাধিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি এবং মানুষের নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে দিচ্ছে আয়ু। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ সাফল্যে বর্তমান বিশ্বে মানুষ প্রায় ১২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বয়স বৃদ্ধির এ হারে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর। দিন দিন বাড়ছে প্রবীণের সংখ্যা। সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সিনিয়র সিটিজেন মর্যাদায় ঘোষিত করেছেন। তথ্যসূত্র অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ প্রবীণ বা সিনিয়র সিটিজেন। ২০২৫ সাল নাগাদ প্রবীণের সংখ্যা হবে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ, ২০৫০ সালে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি এবং ২০৬১ সালে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি। ২০৫০ সালের দিকে এদেশের ২০ শতাংশ নাগরিক প্রবীণ হবেন এবং শিশুসংখ্যা হবে ১৯ শতাংশ। আরও লক্ষণীয় তথ্য হলো, বিশ্বের সর্বত্র অতিপ্রবীণের (৮০ বছরের ওপরে) সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে। একসময় বার্ধক্যজনিত সমস্যা উন্নত বিশ্বের সমস্যা মনে করা হলেও বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এ ইস্যুতে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করেছে। ১৯৯০ সালে সর্বপ্রথম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত এক প্রস্তাবে ১৯৯১ সাল থেকে বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর অর্থ হলো, জাতিসংঘের ১৯৩টি দেশ এ দিবসটি গুরুত্ব সহকারে পালন করবে। তাই বিশ্বে যথাযথভাবেই একটি দায়বদ্ধতা চলে আসে প্রবীণদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের। বাংলাদেশে ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত বার্ধক্য বা প্রবীণজনিত সমস্যাটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে আগামী দিনে প্রবীণের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে বলে ভাবা হয়। ১৭ বছর পর তৎকালীন গবেষণার আলোকপাতগুলোই বর্তমানে সত্যি হচ্ছে। এ মুহূর্তে কেমন আছেন আমাদের দেশের প্রবীণরা? বর্তমানের নানা গবেষণা বলছে, তাঁরা ভালো নেই। বিশ্বায়নের এ যুগে আমাদের দেশের যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে তৈরি হচ্ছে একক পরিবার।

> *সারা দেশে প্রেস ক্লাবগুলো বাদে প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য সময় কাটানো বা বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রেস ক্লাবগুলোয়ও প্রবীণদের জন্য কার্যকরী কোনো বিনোদনমূলক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে*

এতে করে পরিবারগুলোয় প্রবীণরা ছিটকে পড়ে অসহায় হয়ে পড়ছেন। রাষ্ট্রও প্রবীণদের দেখভালের দায়িত্ব নিচ্ছে না। একটি মানুষের যে সময়টিতে প্রয়োজন পড়ে পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা, ঠিক তখনই আমাদের দেশের একটি বিশাল সংখ্যক প্রবীণ বিপদে পড়ে যাচ্ছেন। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় তাঁরা নিজেদের অনেকটাই বোঝা ভাবতে শুরু করেন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল বাংলাদেশে প্রবীণদের অবস্থা, সমস্যা, প্রবীণদের প্রতি সমাজ ও পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবীণ জনসংখ্যার আকৃতি-প্রকৃতি এবং তাঁদের কল্যাণে পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি প্রস্তুতি প্রায় সর্বাংশেই ভিন্ন ধরনের। এদেশের প্রবীণদের বেশির ভাগই হচ্ছে গ্রামীণ, দরিদ্র, নিরক্ষর, কৃষিজীবী, সনাতনী মনোভাবাপন্ন। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির কারণে এদেশের প্রবীণরা এখনও অনেকটাই সম্মানিত হচ্ছেন; কিন্তু উল্টো চিত্রে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রবীণদের প্রধান সমস্যা হলো দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। শরীরবৃত্তীয় কারণে প্রবীণ বয়সে কর্মক্ষমতা লোপ পায়। তাই চাকরিজীবীরা অবসরে চলে যান আর অন্যান্য শ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত যারা, তাঁরা ধীরে ধীরে তাঁদের কর্মপরিধি গুটিয়ে ফেলেন। তাই একসময় তাঁদের উপার্জনের আর কোনো পথই খোলা থাকে না। বার্ধক্যে তাই দরিদ্রতায় আক্রান্ত হন বেশির ভাগ প্রবীণ। ২০১৩ সালের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, আমাদের দেশে দুই-তৃতীয়াংশ প্রবীণই দরিদ্র, ৫৮ ভাগ প্রবীণের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য নেই। এ ছাড়াও বার্ধক্যকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে প্রবীণরা নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক রোগে ভোগে থাকেন। সবকিছু বিবেচনা করলে আমাদের দেশের প্রবীণরা এ মুহূর্তে ভালো নেই। তারা অনেকটা মানবেতরভাবেই দিন পার করছেন।

কেমন আছেন বাংলাদেশের প্রবীণ সাংবাদিকরা?

সমাজের কোনো উন্নয়নের কথা ভাবতে গেলে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা আসবেই। সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হলো গণমাধ্যম। রাষ্ট্রের শক্তিশালী একটি স্তম্ভ হিসেবে সংবাদমাধ্যমকে বিবেচনা করা হয়। শক্তিশালী গণমাধ্যম রাষ্ট্রযন্ত্রকে সঠিকভাবে পরিচালনার চালিকাশক্তি। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমাজের যে কোনো বিষয়ের সমস্যা, অর্জন, চাহিদা, জনমত সৃষ্টি ও সমাজের ভালোমন্দ সব তুলে ধরা হয়। শুধু তা-ই নয়, শিশুসহ বড়োদের নৈতিকতা শেখাতে, জ্ঞান বৃদ্ধিতে এবং বিনোদন প্রদানে গণমাধ্যমের বিকল্প নেই। গণমাধ্যমকে যে কোনো সমাজের বিষয়ের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রতিনিধি বলা যায়। আর গণমাধ্যমের প্রধানতম প্রাণ হলো সাংবাদিক। একজন সাংবাদিক হলেন সমাজের প্রধানতম নির্মাতা। সংবাদকর্মীরা সমাজের সংকট, সম্ভাবনাগুলো খুঁজে বের করে তা দেশ ও দশের সামনে তুলে ধরেন। একটি অবহেলিত জনগোষ্ঠী বা জনপদের খবর লেখনীর মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দিতে ও সমাধান খুঁজে বের করতে গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সমাজের হাতিয়ার এই সাংবাদিকরাই যখন বার্ধক্যে পৌঁছান, তখন তাঁরা কেমন থাকেন? প্রবীণ বন্ধুর জরিপ বলছে, তারা খুব একটা ভালো নেই। বার্ধক্যকালীন বয়সকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়– ইয়ং ওল্ড বা তরুণ প্রবীণ (৬০ থেকে ৭০ বছর), মিডল ওল্ড বা মধ্যম প্রবীণ (৭০ থেকে ৮০ বছর) এবং ওল্ড ওল্ড বা অতিপ্রবীণ (৮০ বছরের ঊর্ধ্বে)। বাংলাদেশেও ওল্ড ওল্ড বা অতিপ্রবীণের সংখ্যা বাড়ছে। সাংবাদিকদের মধ্যেও এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবীণদের নিয়ে কাজ করছেন তরুণদের সংগঠন 'প্রবীণ বন্ধু'র সদস্যরা। তারা তিন মাসব্যাপী জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য, গাজীপুর প্রেস ক্লাবের সদস্য, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, সাংবাদিক অধিকার ফোরাম এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট থেকে প্রবীণ সাংবাদিকদের সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করে বের করেছেন মধ্যম প্রবীণ ও অতিপ্রবীণ সাংবাদিকদের নানা দুর্দশার চিত্র। সাধারণত এই কলমসৈনিকরা বার্ধক্যে এসে খুবই অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তুলে ধরা হলো–

* হিসাব বলছে, সাংবাদিকদের মধ্যে প্রায় ১১ শতাংশই প্রবীণ এবং ৬ শতাংশ অতিপ্রবীণ (জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ঢাকার বাইরের প্রেস ক্লাবগুলোর তালিকাভুক্ত সদস্যদের বর্তমান তথ্যানুযায়ী)।
* তরুণ প্রবীণ সাংবাদিক কিছু কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলেও মধ্যম প্রবীণ ও অতিপ্রবীণ সাংবাদিকদের প্রায় সবাই কর্মহীন।
* ১১ শতাংশ প্রবীণ সাংবাদিকের মধ্যে প্রায় ৮ শতাংশই অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন পার করছে।
* অনেক প্রবীণ সাংবাদিকের এখনও কর্মশক্তি ও কর্মোদ্যম থাকলেও তাঁরা কোনো কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পাচ্ছেন না বা চাকরি পাচ্ছেন না।
* রাষ্ট্র তথা সরকার সামগ্রিক প্রবীণ সাংবাদিকদের কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি বা তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে না।
* দুস্থ-অসহায় প্রবীণ সাংবাদিকদের কেউ কেউ সরকার বা বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক কিছু কিছু আর্থিক সহযোগিতা পেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
* সারা দেশে প্রেস ক্লাবগুলো বাদে প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য সময় কাটানো বা বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রেস ক্লাবগুলোয়ও প্রবীণদের জন্য কার্যকরী কোনো বিনোদনমূলক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।
* প্রায় ৯ শতাংশ প্রবীণই সঠিক চিকিৎসাসেবা নিতে পাচ্ছেন না, সর্বোপরি চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
* বেশির ভাগ প্রবীণ সাংবাদিকই অসংক্রমিত রোগ যেমন– ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, দুশ্চিন্তাজনিত রোগ এবং বাত-ব্যথায় ভুগে থাকেন।
* জেলা ও উপজেলা শহরগুলোয় প্রবীণ সাংবাদিক বিশেষ করে মধ্যম প্রবীণ ও অতিপ্রবীণ সাংবাদিকের মধ্যে অনেকেই মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন।
* মোটকথা, সর্বোপরি সামগ্রিক চিত্র বিবেচনা করলে বাংলাদেশে প্রবীণ সাংবাদিকরা ভালো নেই।
* বর্তমানে সমস্যায় জর্জরিত প্রবীণ সাংবাদিকদের স্বস্তিময় জীবন দিতে রাষ্ট্র, গণমাধ্যমকর্মীসহ অন্যান্য পেশাজীবীকে অবশ্যই আজ থেকে কাজ শুরু করতে হবে। প্রবীণদের জন্য কাজ করা মানে দেশের জন্য কাজ করা। একজন কলমযোদ্ধা সারা জীবন দেশ গড়তে কাজ করেছেন, কিন্তু শেষ বয়সে তিনি আসলে কী পাচ্ছেন? কারও যদি আকস্মিক মৃত্যু না ঘটে, তবে প্রত্যেক সাংবাদিককে বার্ধক্যকালীন বয়সটি অতিক্রম করতেই হবে। প্রবীণ সাংবাদিকদের স্বস্তিময় বার্ধক্য দিতে আমরা যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারি–
* জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে স্বল্পমূল্যে প্রবীণ সাংবাদিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।
* জাতীয় বাজেটে প্রবীণ সাংবাদিকসহ অন্য প্রবীণদের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে।
* কর্মক্ষম প্রবীণ সাংবাদিকের জন্য কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে প্রত্যেকটি মিডিয়া হাউসে প্রবীণ সাংবাদিকের জন্য কোটা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
* বিশ্বায়নের এ যুগে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে গড়ে উঠছে একক পরিবার প্রথা। এতে করে পরিবারের প্রবীণ সদস্য অসহায় হয়ে পড়ছেন। তাই এ মুহূর্তে প্রতিটি জেলায়ই প্রবীণ নিবাসের প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে সমবয়সি প্রবীণরা একসঙ্গে আনন্দে বসবাস করতে পারেন। প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য প্রতিটি বিভাগে সরকার কর্তৃক একটি করে 'প্রবীণ সাংবাদিক নিবাস' তৈরি করা যেতে পারে।
* সরকার এদেশের প্রবীণদের 'সিনিয়র সিটিজেন' ঘোষণা করেছে এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে প্রবীণরা তাঁদের সেসব অধিকার পাচ্ছেন না। সরাকার ঘোষিত সিনিয়র সিটিজেন সুবিধাগুলোয় প্রবীণ সাংবাদিকের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
* সমাজে প্রতিষ্ঠিত সম্পদশালী ব্যক্তিকে প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য হিতৈষীমূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
* সরকারি ও বেসরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের নিয়ে কাজ করছে, তাদের কর্মকাণ্ডে প্রবীণ সংবাদিকদের বিষয়টি আলাদাভাবে পরিলক্ষিত হতে হবে।
* প্রবীণ সাংবাদিকদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে কার্যকরী করার সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গণমাধ্যম মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।
* প্রবীণ সাংবাদিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোয় প্রবীণবান্ধব স্কিম বা বিমা ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রস্তাব প্রদান করা যেতে পারে।
* জাতীয় প্রেস ক্লাবসহ সারা দেশের প্রেস ক্লাবগুলো থেকে প্রবীণ সাংবাদিককে আলাদা করে কার্ড প্রদান করা যেতে পারে এবং সেই কার্ডের আলোকে নানা সুযোগ-সুবিধা যেমন– মাসিক হেলথ ক্যাম্প, প্রবীণ সাংবাদিকের জন্য আলাদা বসার জায়গা, বিনোদন, প্রেস ক্লাবগুলোয় স্বল্পমূল্যে খাবারের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।
* সাংবাদিকদের নানামুখী সংগঠনগুলো থেকে প্রবীণ সাংবাদিকদের সস্তিময় জীবন দিতে ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে বাস্তবতার আলোকে আলাদা করে পরিকল্পনা করা যেতে পারে।
* সারা দেশের অসহায় প্রবীণ সাংবাদিকদের জীবনের গল্প প্রকাশের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্রটি গণমাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরে একধরনের সামাজিক আন্দোলন তৈরি করতে এবং নবীনদের প্রবীণ কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রবীণ সাংবাদিকদের সমস্যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সবার সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। আমাদের সদিচ্ছা এবং বাস্তবমুখী নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবীণ সাংবাদিকদের সমস্যার ব্যাপকতা কমিয়ে আনা অনেকাংশেই সম্ভব। তাই এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। সব গণমাধ্যমকর্মী সারা দেশের প্রবীণ কল্যাণে তথা নিজ গোষ্ঠী প্রবীণ সাংবাদিকদের সমস্যা সংকট মোকাবিলায় জোরালো ভূমিকা পালন করবেন এবং সেই সঙ্গে আমরা সবাই আজ থেকেই নিজেদের স্বস্তিময় বার্ধক্যকালীন প্রস্তুতি নিতে শুরু করব– এ প্রত্যাশাই করি।

লেখক: বার্ধক্যবিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকর্মী, প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ বন্ধু

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মিত্ররা

শামসুজ্জামান শামস

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক অনন্য ঘটনা। কেননা বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশ, যে দেশটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হলেও ঠাণ্ডাযুদ্ধের কারণে সেটি আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়। এর বড়ো প্রমাণ হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের পক্ষে তথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রকাশ্যে অবস্থান গ্রহণ, অন্যদিকে মুক্তিকামী বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সুস্পষ্ট সমর্থন জানায়। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ ভারত। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকারের থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে কূটনৈতিক স্বীকৃতি। বেলা ১১টায় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' মারফত ঘোষণা করা হলো যে, ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তখনকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'বাংলাদেশের সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ এবং সেই সংগ্রামের সাফল্য এটা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট করে তুলেছে যে, তথাকথিত মাতৃরাষ্ট্র পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।' লোকসভায় দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশাল বাধার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার পর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য শেষ না হতেই ভারতের সংসদ সদস্যদের হর্ষধ্বনি আর 'জয় বাংলাদেশ' ধ্বনিতে ফেটে পড়েন তারা। ৪ ডিসেম্বর

> *সেদিনের অনুষ্ঠানে জর্জ হ্যারিসন হাজার হাজার শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরুতেই বলেছিলেন, ভারতীয় সংগীত আমাদের চেয়ে অনেক গভীর। তারপর তিনি পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খান ও সহশিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দেন*

আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যুগ্মভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র পাঠান। বাংলাদেশ সরকারের ৪ ডিসেম্বরের পত্রের জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে যে পত্র প্রেরণ করেন তার আংশিক বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

'সত্যের জয় হোক প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লি ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১ প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আপনি ৪ ডিসেম্বর আমাকে যে বাণী পাঠিয়েছেন তাতে আমি ও ভারত সরকারের আমার সহকর্মীরা গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। এই পত্র পাওয়ার পর আপনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে পরিচালিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি দেয়ার অনুরোধ ভারত সরকার ফের বিবেচনা করেছে। আমি সানন্দে জানাই যে, বর্তমানে বিরাজিত পরিস্থিতির আলোকে ভারত সরকার স্বীকৃতি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি একটি অনুলিপি সংযুক্ত করছি। আপনার বিশ্বস্ত ইন্দিরা গান্ধী।'

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশ ভুটান। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর মতান্তরে ৭ ডিসেম্বর একটি তারবার্তার মাধ্যমে দেশটি বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

কারো মতে, ভুটান ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আবার কারো মতে, ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এর একদিন পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভুটান।

একাত্তরের ডিসেম্বরে ভুটানের ওই তারবার্তায় দেশটির তৎকালীন রাজা জিগমে দর্জি ওয়াংচুক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন, বিদেশি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের মহান এবং বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম অদূরভবিষ্যতে সাফল্য লাভ করবে। ভুটানের জনগণ এবং তার প্রত্যাশা, সৃষ্টিকর্তা বর্তমান বিপদ থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করবেন, যেন তিনি দেশের পুনর্গঠন এবং উন্নয়নের মহান কর্তব্যে দেশ ও দেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ ইরাক। ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই তৎকালীন ইরাকের প্রেসিডেন্ট আহমেদ হাসান আল বকরের শাসনকালে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ সেনেগাল। সেনেগাল সরকার ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তখন সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেনঘর।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব দেশ মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়াও বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালে। দিনটি ছিল ২৫ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপের দেশ পোল্যান্ড। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি পোল্যান্ড সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবেও নাম আছে পোল্যান্ডের।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আমেরিকান দেশ কানাডা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার কোনো সহযোগিতা বাংলাদেশ পায়নি, বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী দেশই ছিল আমেরিকা। তবে আমেরিকান দেশ হিসেবে প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল কানাডা। ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। এ সময় কানাডার প্রাইমমিনিস্টার ছিলেন পিয়েরে ট্রুদেয়াও।

১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ৯৮ দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যার আগ পর্যন্ত ১০৪ দেশ (প্রায় সব দেশ সৌদি আরব ও চীন এবং ওমান ছাড়া) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

অবশেষে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৯৭৫-এ সৌদি আরব ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীন স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট। সৌদি আরবের না দেয়ার কারণ হিসেবে 'হিন্দু দেশের মদদে দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো মুসলিম দেশকে ভাঙার' আর 'অখণ্ড পাকিস্তান নীতি' চীনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ওমান স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এ অঞ্চলের বাঙালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাঙালি জনগণ হাজার হাজার বছর পরাধীনতার শেকলে বন্দি ছিল। বাঙালিদের মরণপণ আন্দোলন, সংগ্রাম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাখ লাখ মানুষের জীবন উৎসর্গ ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের এই চরম এবং পরম পাওয়া স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহস ও নেতৃত্বের সততায় বাঙালিরা স্বাধীনতা পেয়েছে। আমেরিকা, চীন ও যুক্তরাজ্য–এই সব শক্তিধর দেশের চরম বিরোধিতার মুখে ভারত, রাশিয়া, এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা– সবার অকুণ্ঠ সমর্থন ও মুক্তিযুদ্ধের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার কারণে এই বিশাল অর্জন ও প্রাপ্তি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভ ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে আমরা ভৌগোলিক সীমানা পেয়েছি। বাংলা হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা নৃশংসতা হিটলার-নাদির শাহকেও হার মানায়। এত মৃত্যু, এত বীভৎসতা, এত বেদনা আমরা অতীতে কখনো দেখিনি। ভবিষ্যতেও এতটা কখনো দেখব বলে মনে হয় না। তবু একাত্তর আমাদের গর্বের, গৌরবের, আনন্দের। কারণ স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো কিছু আর কি হতে পারে। দেখতে দেখতে আমরা মহান বিজয়ের ৪৬ বছরে পদার্পণ করেছি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের সে বর্বরোচিত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। এর ভিতরে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের এ দেশীয় দালালদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ডের মতো লোমহর্ষক কর্মকাণ্ড ঘটেছিল দেশব্যাপী।

১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের সামরিক বাহিনী তথা যৌথ বাহিনী পূর্ববাংলায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে স্পষ্টভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় আসার আগেই ভারত ৬ ডিসেম্বর প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের দেশে আশ্রয় দেয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া, মুক্তিযুদ্ধে সেনা সহায়তা দেয়াসহ সব ধরনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদত দিয়েছিল ভারত। ভারতের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের সেনাবাহিনী স্পষ্টভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। আর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের পরই বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতের পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো মিত্রশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়া সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণে রাশিয়ার অনেককে জীবন দিতে হয়েছে। কেবল আমাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেই নয়, বাংলাদেশের পুনর্বাসন কাজেও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আট দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭১-এর ৩ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে লেখা সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোনির চিঠিটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। সে চিঠিতে শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের খবরে উদ্বেগ, শক্তি ব্যবহার না করে রাজনৈতিক পথেই সংকট মোকাবিলার পরামর্শ ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার কথা ছিল। ২৫ মার্চ গণহত্যার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল ভারত। দ্বিতীয়টি সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলোও বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে বাতিল করে দেয়। জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বঙ্গোপসাগরে অষ্টম নৌবহর পাঠাবে বলে হুংকার দিয়ে আমেরিকাকে সতর্ক করে দেয়। বিশ্বের আরও বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান যেমন- কিউবা, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং যুদ্ধকে সমর্থন করেছে। ইংল্যান্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম বন্ধু ছিল। নিরাপত্তা পরিষদে ইল্যান্ড ভোটদানে বিরত থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচারমাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন, প্রতিরোধ বাঙালিদের সংগ্রাম, ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনতাকে জাগ্রত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। উল্লেখ্য,

লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রাণকেন্দ্র তাছাড়া লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সংগীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও দান সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ৪০ হাজার লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডভিত্তিক গান পরিবেশন করেন।

তাছাড়া, ইংল্যান্ড বিচারপতি আবু সাইয়িদ চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করতে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের ভূমিকাও বেশ জোরালো ছিল। ব্রিটেনের ডেইলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান, নিউ স্টেটসম্যান, টাইমস, ইকোনমিস্ট, সানডে টাইমস, অবজারভার, বিবিসিসহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা, নির্যাতন ও বাঙালিদের দুর্দশা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের সংবাদগুলো ছিল বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর পরপরই ৩১ মার্চ 'ম্যাসাকার ইন পাকিস্তান' ('পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড') শিরোনামে গার্ডিয়ান সংবাদ ছেপেছিল। এপ্রিল মাসের ২ তারিখে নিউ স্টেটসম্যান 'উইপ ফর বাংলাদেশ' ('বাংলাদেশের জন্য কাঁদো') শিরোনামে একটি হৃদয়স্পর্শী সংবাদ প্রকাশ করে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিভিন্ন হৃদয়স্পর্শী ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করেছিল।

অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচার মাধ্যমগুলো পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচার মাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। মুসলিম এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দিকের রাষ্ট্রগুলোর একটি মিসর। মিসরের মিডিয়াতেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে লিখেছেন অনেকেই। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে কায়রোর আধাসরকারি সংবাদপত্র আল আহরামে সম্পাদক ড. ক্লোভিস মাসুদ ভারত থেকে শরণার্থীদের নিরাপদ এবং নিঃশর্তভাবে দেশে ফেরার একটি ব্যবস্থা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাগিদ দেন। এর পাশাপাশি একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের কথাও বলেন।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ: পণ্ডিত রবিশঙ্করের অনুরোধেই জর্জ হ্যারিসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর পুরো দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সেই কনসার্টই মানবতার জন্য সঙ্গীতের প্রথম সফল বড়ো আয়োজন।

সেদিনের অনুষ্ঠানে জর্জ হ্যারিসন হাজার হাজার শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরুতেই বলেছিলেন, ভারতীয় সংগীত আমাদের চেয়ে অনেক গভীর। তারপর তিনি পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খান ও সহশিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেদিন কনসার্টের শুরুতেই পণ্ডিত রবিশঙ্কর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেছিলেন, 'প্রথম ভাগে ভারতীয় সংগীত থাকবে। এর জন্য কিছু মনোনিবেশ দরকার। পরে আপনারা প্রিয় শিল্পিদের গান শুনবেন। আমাদের গানে শুধুই সুর নয়, এতে বাণী আছে। আমরা শিল্পী, রাজনীতিক নই। বাংলাদেশে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশের পল্লীগীতির সুরের ভিত্তিতে আমরা বাজাব "বাংলা ধুন"।' 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর জন্যই পণ্ডিত রবিশঙ্কর বিশেষভাবে 'বাংলা ধুন' নামের এই সুর সৃষ্টি করেছিলেন। সেটা দিয়েই ওস্তাদ আলী আকবরের সঙ্গে যুগলবন্দিতে কনসার্ট শুরু হয়েছিল। তাদের সঙ্গে তবলায় ওস্তাদ আল্লারাখা আর তানপুরায় ছিলেন কমলা চক্রবর্তী। ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে সেদিন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে প্রায় ৪০-৫০ হাজার দর্শক অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত ২,৪৩,৪১৮.৫০ ডলার ইউনিসেফের বাংলাদেশের শিশু সাহায্য তহবিলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রবিশঙ্কর ভেবেছিলেন ২৫ থেকে ৫০ হাজার ডলার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কিন্তু জর্জের ভাবনায় বিটলসের দর্শন, অর্থাৎ যা করব তা বড়ো করে করব। এবং সেটাই হয়েছিল।

লেখক: সাংবাদিক

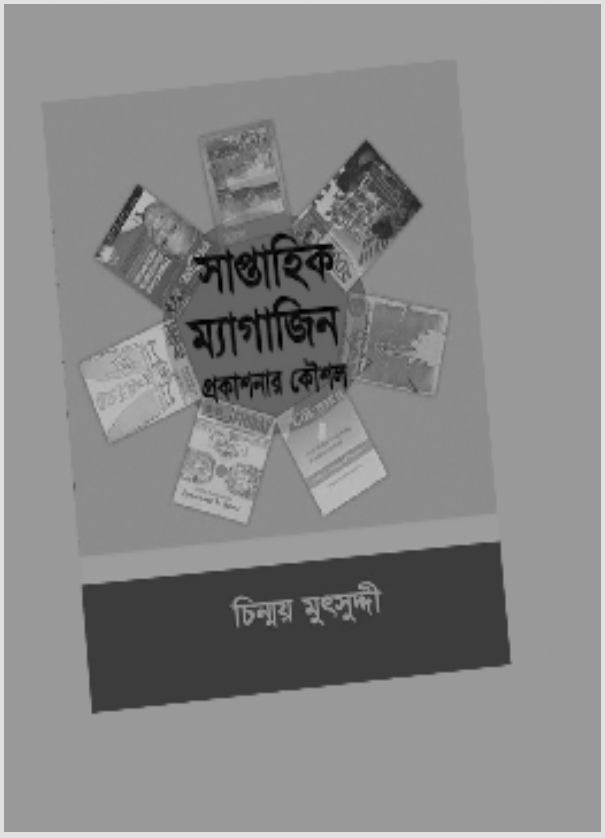

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ভুয়া খবরের ঠিকুজি

সাকী আহ্সান

অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ইন্টারনেটের এই সময়ে 'ভুয়া খবর' মানবজীবনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করছে। অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম বাই প্রোডাক্টে পরিণত হয়েছে ভুয়া খবর। এর জন্ম কবে, কোথায়, কীভাবে– খবরের অতীত ইতিহাস ঘেঁটে কোনো গবেষক হয়তো বের করতে পারবেন এর ঠিকুজি-কোষ্ঠী। ভুয়া খবরের উদ্ভব নিয়ে সম্প্রতি আগ্রহোদ্দীপক কথা বলেছেন ক্যাথলিক চার্চ-এর প্রধান ধর্মগুরু ২৬৬তম পোপ ফ্রান্সিস। বাইবেলের নিদর্শন দিয়ে তিনি বলেছেন, ইভকে যখন সাপ নিষিদ্ধ ফল খেতে প্ররোচিত করেছিল, তখনই ভুয় খবরের জন্ম হয়েছিল।

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, আদম ও ইভকে স্বর্গের জ্ঞাণবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেন ঈশ্বর। ইভকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে প্ররোচিত করে সাপ বলে যে, এই ফল খেলে তোমরা ভালো-মন্দ বিষয়ে জ্ঞান পাবে। সাপের প্ররোচনায় ইভ নিজে সেই ফল খায় এবং আদমকেও খেতে প্ররোচিত করে। ঈশ্বর যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, কেন তার নিষেধ অমান্য করে তারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে তখন ইভ বলেছিলেন, সাপটা তাদেরকে মিথ্যে বলে প্ররোচিত করেছে। ইভ-এর সেই উত্তর ঈশ্বরের মনঃপুত হয়নি। জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খাওয়ার আদেশ অমান্য করায় মানুষকে স্বর্গচুত্য করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন তিনি। সাপের সেই মিথ্যেকেই ভুয়া খবরের সঙ্গে তুলনা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। ভুয়া খবর কতটা গর্হিত অপরাধ সে কথাও বলতে ভোলেননি তিনি। তার মতে, ভুয়া খবর হচ্ছে– আদমকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর মতো।

> *বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে ভুয়া খবর বা ফেইক নিউজ এখন বহুল আলোচিত শব্দবন্ধ। সর্বশেষ মার্কিন নির্বাচনে ভুয়া খবরের ছড়াছড়ি দেখা যায়*

কে ছড়ায় ভুয়া খবর

ধর্মগুরু থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত ভুয়া খবর নিয়ে কথা বলেছেন। বিশ্বনেতাদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই এ বিষয়ে বেশি সোচ্চার। বাইবেলের বিবরণ বিবচনায় নিলে বলতে হবে– সাপ-এর মতো কূটিল চরিত্রের কেউই ছড়ায় এই ভুয়া খবর। অবশ্য ট্রাম্পের মতে, গণমাধ্যমগুলোই ভুয়া খবর ছড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে থেকেই দেশটির সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ভুয়া খবর ছড়ানোর অভিযোগ আনছেন। সংবাদমাধ্যমকে

অসৎ আখ্যা দিয়ে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, সংবাদমাধ্যমগুলো কোনো সূত্র ছাড়াই একের পর এক ভুয়া খবর দেয়। সংবাদমাধ্যম 'সত্য তুলে ধরতে' চায় না, তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে। তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকেরা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থারই অংশ। ট্রাম্পের ঢালাও অভিযোগ শুনে মনে হতে পারে, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ নয় বরং রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনে সদাতৎপর অশুভ এক মাধ্যম। আর সাংবাদিকরা হচ্ছেন বাইবেল বর্ণিত সেই সাপের মতো কুটিল চরিত্রের কেউ।

নির্বাচিত হওয়ার পর ট্রাম্প ২০১৮ সালের ১৭ জানুয়ারিতে 'ফেইক নিউজ অ্যাওয়ার্ড' ঘোষণা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির কয়েকটি গণমাধ্যমকে তিনি 'সবচেয়ে অসৎ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সংবাদমাধ্যম' হিসেবে আখ্যা দেন। তার তথাকথিত ফেইক অ্যাওয়ার্ডজয়ী শীর্ষ ১০টি সংবাদমাধ্যমের একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকার শীর্ষে ছিল *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস*, দ্বিতীয় স্থানে ছিল *এবিসি নিউজ* এবং তৃতীয় স্থানে ছিল *সিএনএন*।

গণমাধ্যমে যে কখনো ভুয়া খবর বের হয় না বা কোনো কোনো সাংবাদিক যে ভুয়া খবর ছড়ান না, তা নয়। ভুয়া খবর সৃষ্টির জন্য মার্কিন মুল্লুকে কুখ্যাত ছিলেন প্রয়াত সাংবাদিক পাউল হর্নার। তার ছড়ানো অনেক মিথ্যে সংবাদ ইন্টারনেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বিশেষ করে সর্বশেষ মার্কিন নির্বাচনের সময় তিনি অনেক ভুয়া খবরের জন্ম দিয়েছেন। এসব খবরের বেশির ভাগই ট্রাম্পের পক্ষে গিয়েছে। হর্নার অবশ্য দাবি করতেন, তিনি ভুয়া খবর প্রকাশ করেন না, বরং মশকরা করেন। কেউ যদি তার মশকরাকে গুরুত্বসহকারে নেয় এবং শেয়ার করে, তবে তাদের নিন্দাই করতে হবে বলে তিনি মনে করতেন।

সব দেশেই কমবেশি এই অভিযোগ আছে যে, কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম বা কোনো কোনো সাংবাদিক ইচ্ছে করেই ভুয়া খবর ছড়ান। একেই বলে হলুদ সাংবাদিকতা। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে কোনো কোনো গণমাধ্যমকে ভুয়া খবর ছড়াতে দেখা গেছে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের একটি গণমাধ্যম ভুয়া খবর ছড়ায় যে, ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙায় ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায় মিষ্টি বিতরণ করেছে। এই খবরের জের ধরে দেশে সেসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা হয়।

ভুয়া খবর ছড়ানোয় এগিয়ে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যম

ভুয়া খবর কেবল সংবাদ মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় না। কেবল হলুদ সংবাদমাধ্যম বা হলুদ সাংবাদিকরাই ভুয়া খবর ছড়ায় এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। ভুয়া খবর ছড়াতে পারে যে কেউ। প্রতিটি ভুয়া খবরের পেছনেই রয়েছে কোনো না কোনো স্বার্থান্বেষী মানুষ। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক মিথ্যা খবর ছড়ায় সাধারণত কট্টরপন্থী মনোভাবসম্পন্ন লোকেরা। আর সেটা ছড়াতে পারে যে কোনো যোগাযোগমাধ্যমে। বাস্তবে দেখা যায়, ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই ভুয়া খবর বেশি ছড়াচ্ছে। অনেক সময় সংঘবদ্ধ চক্র ভুয়া খবর তৈরি করে ফেসবুক, টুইটার বা রেডিটের মতো জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। এর পেছনে কাজ করে লাখ লাখ ভুয়া অ্যাকাউন্ট। বিশ্বের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের নিয়ে তৈরি একটি গবেষণা দল 'পলিটিক্যাল বটস' শীর্ষক রিপোর্টে জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া টুইটারে অন্তত ৩ কোটি ভুয়া অ্যাকাউন্ট রয়েছে। গবেষক দল জানিয়েছে, মার্কিন নির্বাচনের আগে ট্রাম্পপন্থি বট প্রো-ক্লিন্টন বটের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি ছিল। উভয় শিবিরের বটসেরই কাজ ছিল ভুয়া সংবাদ ছড়ানো।

ভুয়া খবরের প্রভাব

সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে ভুয়া খবর যে কত ভয়াবহ প্রভাব রাখতে পারে দেশে দেশে তার বহু নজির রয়েছে। ভুয়া খবর অনেক সময় সমাজে বিদ্বেষ উসকে দেয়। যে বিদ্বেষ কখনো কখনো সহিংস রূপ ধারণ করে। যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির অস্ট্রেলিয়ান মনোবিজ্ঞানী স্টিফেন লেভেনডোভেস্কির মতে, 'সামাজিক পর্যায়ে রাজনৈতিক ইস্যুতে ধারাবাহিক ভুল তথ্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারে।'

বাংলাদেশে একাধিকবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ইসলাম অবমাননার ভুয়া খবর ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে। যার কারণে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটেছে। কক্সবাজারের রামু ও উখিয়ায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে, রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য ভুয়া খবর মূর্তিমান হুমকি। এটা রাজনৈতিক অস্থিরতাও সৃষ্টি করতে পারে, যা রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে অনেক ভুয়া খবর প্রচার করা হয়। খবর রটে যে, চাঁদে সাঈদীর ছবি দেখা গেছে। এমনও খবর রটে যে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে মক্কায় কাবা শরিফে মানববন্ধন হয়েছে। এসব গুজবকে কেন্দ্র করে যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের শক্তি দেশে ব্যাপক সহিংসতা চালায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি না হওয়ায় খবর রটে, সরকার যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে আঁতাত করেছে এজন্য তার ফাঁসি হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণজাগরণ মঞ্চ'র উদ্ভব হয়। আবার গণজাগরণ মঞ্চ ঘিরে খবর রটে– যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিকারীরা নাস্তিক ব্লগার। তাদের বিচারের দাবিতে হেফাজতে ইসলামী বাংলাদেশ নামক কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক ধর্মীয় সংগঠন একই বছর মে মাসে রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থান সমাবেশ করলে জাতীয় রাজনীতিতে চরম সংকট দেখা দেয়। সরকার অবশ্য সেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

ভুয়া খবরের খারাপ দিক হচ্ছে এর সত্যাসত্য যাচাই না করেই সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ চরম প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। খবরটি সত্য কি মিথ্যা সেটা বিচার-বিশ্লেষণ করার মতো সাধারণ বোধবুদ্ধির পরিচয় দিতে অধিকাংশ মানুষ ব্যর্থ হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপলের সিইও টিম কুক যথার্থই বলেছেন, ভুয়া খবর মানুষের চিন্তার মৃত্যু ঘটাচ্ছে।

ভুয়া খবরের শিকার কারা

ভুয়া খবরের কবলে পরতে পারেন যে কেউ। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্বনেতা পর্যন্ত এর শিকার হন। তবে যখন রাজনীতিবিদ, অভিনয়শিল্পী, খেলোয়াড় বা কোনো সেলিব্রেটি ভুয়া খবরের শিকার হন তখন হইচই পড়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুয়া খবরের শিকার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা সুখকর হয় না। বিশেষকরে জাতিগত সংখ্যালঘু বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য এটা বয়ে আনে দুর্ভোগ।

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে ভুয়া খবর বা ফেইক নিউজ এখন বহুল আলোচিত শব্দবন্ধ। সর্বশেষ মার্কিন নির্বাচনে ভুয়া খবরের ছড়াছড়ি দেখা যায়। সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অন্যতম নিয়ামক হয়ে ওঠে ভুয়া খবর। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অভিযোগ করেছে, রাশিয়া অনলাইনে ভুয়া খবর প্রকাশ করে নিজেদের পছন্দের প্রার্থী ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে হ্যাকিং-এর আশ্রয় নিয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর আরো অভিযোগ রয়েছে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়া 'ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেন' শুরু করে। ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেন হচ্ছে, অসৎ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ইচ্ছে করে মিথ্যা তথ্য দিয়ে অনলাইনে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করা। রাশিয়ার 'ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেন' ঠেকাতে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কাউন্টার প্রোপাগান্ডাবিষয়ক টাস্কফোর্স গঠন করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পর ভুয়া খবর নিয়ে জার্মান নির্বাচনেও হইচই হয়েছে। ফ্রান্স আর নেদারল্যান্ডসের নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও অনেক ভুয়া খবরের জন্ম হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বজুড়ে রাজনীতিকরাই বোধহয় ভুয়া খবরের শিকার হচ্ছেন বেশি। মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প ও হিলারিকে নিয়ে অসংখ্য ভুয়া খবর বের হয়েছে। ইউরোপে বিভিন্ন দেশের রাজনীতিকরা এর শিকার হচ্ছেন। ডয়েচে ভেলের এক খবরে বলা হয়, সাম্প্রতিককালে ইউরোপে ম্যার্কেলই সবচেয়ে বেশি ভুয়া খবর-এর শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে তার শরণার্থী নীতিকে ঘিরে বহু মিথ্যা খবর রটানো হয়েছে। ভুয়া খবরে থেকে রেহাই পাননি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও। গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর একটি বিদেশি টিভি চ্যানেল ও একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন পত্রিকার সূত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম খবর প্রকাশ করে যে, ২৪ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বাইরে ধারাবাহিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শেখ হাসিনাকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল নব্য জেএমবির জঙ্গিরা। খবরে আরো বলা হয়, জঙ্গিদের সেই হামলা প্রতিহত করতে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বিশেষ বাহিনীও যোগ দেয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই খবরকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিমূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করে।

ভুয়া খবরের দায় কেবলই সংবাদমাধ্যমের?

ভুয়া খবরের প্রতি সবচেয়ে বিরূপ হন বুঝি রাজনীতিবিদরাই। আর এ কারণেই দেশে দেশে রাজনীতিবিদদের দেখা যায় ভুয়া খবর নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন করতে চান। আর রাজনীতিবিদরা ভুয়া খবর বলতে যেন সংবাদমাধ্যমকেই বোঝেন। সংবাদমাধ্যমের ভুয়া খবরে তারা যতটা ক্ষিপ্ত হন অন্য কোনো মাধ্যমের ভুয়া খবরে ততটা ক্ষিপ্ত হতে তাদের দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প থেকে শুরু করে মিয়ানমারের ফার্স্ট স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চি পর্যন্ত সব রাজনৈতিক নেতাই ভুয়া খবর নিয়ে ত্যক্তবিরক্ত। আর তাদের কাছে ভুয়া খবর মানেই– এটা গণমাধ্যমের কাজ। মিয়ানমারের নোবেলজয়ী অং সান সু চি সম্প্রতি বিশ্ব গণমাধ্যমের সমালোচনা করেন। সিএনএন, বিবিসি, আলজাজিরা, চ্যানেল নিউজ এশিয়ার মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো 'ভুয়া খবর' প্রচার করে বহির্বিশ্বে আরো বেশি অসন্তোষ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

গণমাধ্যম যখন ভুয়া খবরের শিকার

সবদেশের গণমাধ্যমের বিরুদ্ধেই কমবেশি ভুয়া খবর ছড়ানোর অভিযোগ ওঠে। মজার বিষয় হচ্ছে গণমাধ্যমগুলোই কখনো কখনো ভুয়া খবরের শিকার হয়। বিবিসি বাংলার নাম ও লোগো ব্যবহার করে সম্প্রতি ভুয়া খবর তৈরি করা হয়েছে। সেই খবরে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামালের মেয়ের ভুয়া সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়। কাল্পনিক সেই সাক্ষাৎকারে সুলতানা কামালের লন্ডন প্রবাসী মেয়ে তার

মায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। বিবিসি বলেছে, এই সাক্ষাৎকারের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

অনেক সময় দেশের কোনো কোনো গণমাধ্যম ভুয়া খবরের শিকার হয়েছে। গত বছর ১৩ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা অস্ট্রেলিয়া যান। এর পর দিন প্রথম আলো'র মাস্টহেড ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'সরকারের চাপের মুখে প্রধান বিচারপতির দেশত্যাগ' শিরোনামে খবর পোস্ট করা হয়। সঙ্গে আরো একটি নিউজ ছাপা হয় যার শিরোনাম ছিল– 'ক্ষমতা দেখাল সরকার'। মুহূর্তেই খবর দুটি ভাইরাল হয়। পরে প্রথম আলো প্রতিবাদ করে বলে– দুটোই ভুয়া খবর। এই শিরোনামে তারা প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। বাস্তবে পত্রিকাটির সংবাদের শিরোনাম ছিল– 'আমি বিব্রত', বিদেশ যাওয়ার আগে প্রধান বিচারপতি। তাছাড়া উল্লিখিত শিরোনামের খবরটি সেদিনের লিড নিউজও ছিল না। একই দিনে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর মাস্টহেড এবং গেটআপ-মেকআপ নকল করে 'চিফ জাস্টিস এক্সপোজেস দ্য গভর্নমেন্ট' শিরোনামে ভুয়া প্রতিবেদন ছাপা হয়। 'এ ডিজগ্রেস টু বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি ভুয়া মন্তব্য প্রতিবেদনও দেখা যায়। বাস্তবে সেদিন পত্রিকাটির প্রধান শিরোনাম ছিল 'আই অ্যাম নট সিক'।

ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও ভুয়া খবরের শিকার হয়

সবচেয়ে বেশি ভুয়া খবর প্রচারিত হয় ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। গণমাধ্যমের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও ভুয়া খবরের কবলে পড়ে কখনো কখনো। সম্প্রতি 'উইকলি ওয়ার্ল্ড নিউজ' নামের একটি সংবাদ সংস্থায় ফেসবুক বন্ধের ভুয়া খবর ছাপা হয়। সেই খবরে ফেসবুকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ-এর কাল্পনিক সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়– মার্চের মাঝামাঝি নাগাদ ফেসবুক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ ফেসবুক নিয়ে জাকারবার্গ যারপরনাই বিরক্ত, এ কারণে তিনি ফেসবুক নামের অনলাইন উন্মাদনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সেই খবরকে 'ভুয়া' বলে উড়িয়ে দেয়।

ভুয়া খবর এবং সরকারের ভূমিকা

বিশ্বজুড়েই ভুয়া খবরের প্রতিকার খোঁজা হচ্ছে। বাংলাদেশে আলোচনা চলছে যে, ভুয়া খবর প্রতিরোধে আইন নাকি সেন্স সেন্সরশিপ বেশি কার্যকর। বাংলাদেশে যখন ভুয়া খবরের প্রতিকার নিয়ে আলোচনা চলছে উন্নত বিশ্ব তখন এটা প্রতিরোধে আইন করার কথা ভাবা হচ্ছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, নির্বাচনের সময় অনলাইনে ভুয়া খবর রোধে নতুন আইন করা হবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে ভুয়া খবরের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আইনি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। উন্নত বিশ্বের সরকারগুলোর মনোভাব প্রায় একই রকম। তারা মনে করে, ভুয়া খবরকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। ভুয়া খবর তৈরি এবং প্রচারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জার্মানির আইনপ্রণেতারা। জার্মান আইনপ্রণেতা প্যাট্রিক সেন্সবুর্গ বলেছেন, ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সময় এসেছে।

তবে ভুয়া খবরকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে সরকারি পদক্ষেপ নেয়ার কাজটি হয়তো সহজ হবে না। কেননা এ ধরনের উদ্যোগের সমালোচনা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে যে, একে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত বা গণ্য করলেই কি সমাধান মিলবে? অনেক বিশেষজ্ঞই উন্নত বিশ্বের সরকার বা রাজনীতিকদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, আইনি পদক্ষেপ নেয়া আর সেন্সর-শিপ আরোপ করা একই কথা।

অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ (ওএসসিই)-এর গণমাধ্যমের স্বাধীনতাবিষয়ক মুখপাত্র ডুঙ্গা মিজাতোভিকের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কারো যদি সহিংস কোনো পদক্ষেপের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকে বা কোনো বেআইনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া না যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়া ঠিক হবে না। তার মতে, ভুয়া খবরের মতো সমস্যাকে কঠোর বিধিনিষেধের মাধ্যমে নয় বরং শিক্ষার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। 'হুইসেল ব্লোয়ার' হিসেবে পরিচিত মার্কিন নাগরিক এডওয়ার্ড স্নোডেন-এর মতে, ভুয়া খবর প্রতিরোধে সেন্সরশিপ কোনো সমাধান হতে পারে না। এর পরিবর্তে মানুষের মধ্যে 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং' বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন তিনি।

ভুয়া খবর রোধে সরকারগুলোর ভূমিকা কী হবে সেটা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সমাধানে পৌঁছা যায়নি। তবে 'ভুয়া খবর' ঠেকাতে কোনো কোনো দেশ ইতোমধ্যে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। যুক্তরাজ্য জাতীয় নিরাপত্তা যোগাযোগ নামে নতুন একটি ইউনিট খোলার ঘোষণা দিয়েছে। নতুন এই ইউনিট অন্য রাষ্ট্রের ছড়িয়ে দেওয়া ভুয়া তথ্য চিহ্নিত ও মোকাবিলা করবে। ভুয়া সংবাদ রোধে 'সেন্টার অফ ডিফেন্স অ্যাগেইনস্ট ডিসইনফরমেশন' নামে একটি টিম গঠন করেছে জার্মানির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ভুয়া খবর রোধের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার যে তৎপরতা শুরু করেছে সেটাকে অনেকেই ভালোভাবে নেননি। সরকারি তৎপরতাকে ভালোভাবে না নেয়া মানুষদের একজন হচ্ছেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ কম্পিউটারবিজ্ঞানী স্যার টিম বার্নার্স-লি। তিনি মনে করেন, সরকারি নজরদারি কখনো কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ কখনো কখনো নিজেই সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করে দিচ্ছে অথবা অনেক খবর চেপে যাচ্ছে। তার মতে, ভুয়া খবরের বিস্তার রোধে সরকারের চেয়ে বরং সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম এবং সার্চ ইঞ্জিনগুলোর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

ভুয়া খবর প্রতিরোধের কাজে অনেকেই সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছেন। তবে সরকারি হস্তক্ষেপ চাওয়া লোকের সংখ্যাও কম নয়। কেউ কেউ মনে করেন ভুয়া খবর প্রতিরোধে সরকারের তথ্য অভিযান চালানো দরকার। এদের দলে আছেন মার্কিন টেক-জায়ান্ট অ্যাপলের সিইও টিম কুক। তার মতে, 'ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে সরকারি অভিযান চালানো হলে সত্যাশ্রয়ী বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রতিষ্ঠানই জয়ী হবে।' কুক-এর কথায় হয়তো যুক্তি আছে তবে এ ধরনের সরকারি অভিযানের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, ভুয়া খবর প্রতিরোধ করতে গিয়ে মতপ্রকাশ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা যেন খর্ব না হয়। গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হলে গণতন্ত্র ব্যাহত হবে।

ভুয়া খবর মোকাবিলায় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান

টিম বার্নার্স-লি ভুয়া খবর প্রতিরোধের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। ওয়েবের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এক খোলা চিঠিতে তিনি এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ব্লগ, টুইট, ছবি, ভিডিও প্রকাশ এবং ওয়েবপেজ তৈরির মাধ্যমে যারা ইন্টারনেটকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর জোর দেন তিনি।

ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা জিমি ওয়েলস। তিনি ভুয়া খবর ঠেকাতে 'উইকিট্রিবিউন' নামে অনলাইনভিত্তিক নতুন এক সংবাদমাধ্যম চালুর কথা জানিয়েছেন। এই সংবাদমাধ্যম পরিচালিত হবে পেশাদার সাংবাদিক ও স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের সমন্বয়ে। প্রমাণনির্ভর সাংবাদিকতা করাই তাদের লক্ষ্য। উইকিট্রিবিউনের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, 'সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, আর আমরাই এটি ঠিক করতে পারব।'

ফেসবুক সম্প্রতি ভুয়া খবর ছড়ানো রোধ করতে নতুন প্রযুক্তি হাতে নিয়েছে। এখন থেকে কোনো ইউজার কোনো খবর ভুয়া মনে হলে তিনি সেটি ফেসবুকে রিপোর্ট করতে পারবেন। এরপর ফেসবুক সেই খবরের যথার্থতা 'থার্ড পার্টি'র মাধ্যমে যাচাই করে দেখবে। যাচাইয়ের পর যদি খবরটি ভুয়া বলে প্রমাণিত হয় তাহলে ফেসবুকে লিংকটির সঙ্গে ট্যাগ লাগিয়ে দেয়া হবে। ফেসবুকের পাশাপাশি ইন্টারনেটে 'ভুয়া খবর' ছড়ানো রোধে উদ্যোগ নিয়েছে গুগল। ভুয়া নিউজ সাইটগুলো যেন ভুল তথ্য দিয়ে অর্থ আয়ের সুযোগ না পায় সেজন্য বিজ্ঞাপন গ্রহীতাদের কন্টেন্ট মূল্যায়নের ঘোষণা দিয়েছে তারা। তবে ফেসবুক বা গুগলের উদ্যোগ ভুয়া খবর কতটা প্রতিরোধ করতে পারবে সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

ভুয়া খবর রোধে করণীয়

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার, অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ হাসিল প্রভৃতি হীন লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ভুয়া খবরের বিস্তৃতি ঘটছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ভুয়া খবর কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়। ভুয়া খবর প্রতিরোধ করতে হলে এর স্বরূপ উন্মোচন করা জরুরি। স্বরূপ উন্মোচনের কাজটি করবে কে বা কারা? অনেকেই চান না, সরকার এই কাজ করুক। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার ইউজারদের সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই। কোন অনলাইন পেজ থেকে ভুয়া খবর ছড়ানো হয় সেটা তাদেরকে বুঝতে হবে। ভুয়া খবর ছড়ানো পেজগুলো এড়িয়ে চলতে হবে বা তাদের নিউজ যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। অনলাইন ইউজাররা সচেতন হলে ভুয়া খবরের উদ্যোক্তারা সুবিধা করতে পারবে না। তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা মনে করেন, যেসব অনলাইন পেজ থেকে ভুয়া খবর ছড়ায় সেগুলো চিহ্নিত করা কঠিন কাজ নয়। এ কাজে তাদেরকে সহায়তা করতে পারে ইউজারবান্ধব প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে অন্তত এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে ভুয়া খবরের পরিমাণ কমে আসে। গণমাধ্যমের পাঠকদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়– পাঠককে সচেতন হতে হবে। পাঠক ভুয়া খবর প্রত্যাখ্যান করলে হলুদ সাংবাদিকতা হালে পানি পাবে না।

যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক মানুষকে ভুয়া সংবাদ সম্পর্কে সজাগ করার লক্ষ্যে 'সাইকোলজিক্যাল ভ্যাকসিনের' কথা বলছেন। তারা মনে করছেন এই ধরনের ভ্যাকসিন ভুয়া খবর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে। তবে এমন ভ্যাকসিন কবে তৈরি করা সম্ভব হবে সেটা নিশ্চিত করতে পারেননি গবেষকরা।

ভুয়া খবর রোধে ভূমিকা রাখেতে পারেন পেশাদার সাংবাদিকদরাও। কোনো খবর জানলেই সেটাকে টিভি বা অনলাইন মিডিয়ায় ব্রেকিং নিউজ হিসেবে প্রচারের ফাঁদে পা দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে পেশাদার সাংবাদিকের দায়িত্ব হচ্ছে তথাকথিত হট নিউজটি যাচাই করে দেখা। যদি দেখা যায় যে তথাকথিত হট নিউজটি আসলে মিথ্যা তখন সেই সাংবাদিকের কর্তব্য হচ্ছে, যারা ভুয়া খবরটি ছড়িয়েছে বা প্রচার করেছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা। পেশাদার সাংবাদিকরা এগিয়ে এলে ভুয়া খবর ছড়ানোর প্রবণতা কমতে পারে। পেশাদার সাংবাদিকদের ওয়াচডগের ভূমিকা এবং সচেতন পাঠকের বিচার-বিবেচনাই হয়ে উঠতে পারে ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে কার্যকর সেফগার্ড।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ

আত্মহত্যার প্রতিবেদনে সামারিটানস গাইডলাইন

জয়শ্রী জামান

কোনো সাংবাদিক আত্মহত্যার প্রতিবেদন করবেন না, এমন কোনো পণ করতে পারেন না। আর এ কারণেই আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশনে নির্দেশনা তাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আত্মহত্যা অত্যন্ত জটিল বিষয় এবং একজন রিপোর্টারের জন্য এ বিষয়ে রিপোর্ট করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। বেশ কটি বিষয়ে তাকে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। জনগণের আগ্রহ কিসে এবং অনুরূপ ঘটনার ঝুঁকির কথা বিবেচনায় আনতে হবে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে যে, শোকাহতের শোক-দুঃখে যেন অনধিকার চর্চা না করা হয়। ইন্ডাস্ট্রির লিখিত ও অলিখিত নীতিমালার কথাও স্মরণ রাখতে হবে। আবার যে পরিবারে আত্মহত্যা হয়েছে, সেই শোকার্ত পরিবারের কথা ভাবতে হবে। কারণ প্রিয়জনকে হারানো যে কোনো ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুঃখের ভেতরে ফেলে দেয়। কিন্তু আত্মহত্যা-পরবর্তী দুঃখ-শোক যেন যে কোনো মৃত্যুর শোককে ছাড়িয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, এ শোক তুলনামূলক তীব্রতর। কারণ এ শোক যেন নির্মল আকাশকে আকস্মিক কালো মেঘে গ্রাস করার মতো একটা বিষয়। এ এমনই এক ঘটনা, যা ঘটার কথা কেউ কখনো চিন্তাই করেনি। এ দুর্ঘটনার আকস্মিকতার সঙ্গে লড়াই তার তাৎক্ষণিক আচরণে প্রকাশ পায়।

> *কোনো সাংবাদিক আত্মহত্যার প্রতিবেদন করবেন না, এমন কোনো পণ করতে পারেন না। আর এ কারণেই আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশনে নির্দেশনা তাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে*

প্রিয়জনের আত্মহত্যার শোকের ধাক্কার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, সেই সঙ্গে অপূরণীয় ক্ষতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়। বেদনাদায়ক অজস্র প্রশ্ন তখন তার মনে উদয় হয়। অনেকেই নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকে। মনে হয়, কেন এমন হলো? কী হলে এ ঘটনা প্রতিরোধ করা যেত? তবে বেশির ভাগ শোকই ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকলেও যখন তা গণমাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তখন তা গণমানুষের আকস্মিক শোকের বিষয়ে পরিণত হয়। অনেক সময় তা এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা শোকার্তকে বিপাকে ফেলে দেয়। শোকার্তের শোককে আরো

ঘনীভূত এবং তাকে আরো বেশি খারাপ অবস্থায় নিয়ে যায়। আত্মহত্যায় প্রিয়জন হারানো শোকার্ত ব্যক্তিকে গণমাধ্যমের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নেতিবাচক প্রভাব প্রচণ্ড শোকে নিক্ষেপ করে।

আত্মহত্যার সামাজিক আচরণ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। লজ্জার অনুভূতির জন্ম দিতে পারে, সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সাধারণত পরিবারের সদস্যরা হতবিহ্বল হয়ে একধরনের নীরবতা অবলম্বন করতে পারে। এর অর্থ এমন, ভাবতে হবে যে তারা কোনোভাবেই গণমাধ্যমের মুখোমুখি হতে চাচ্ছে না।

আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশনে দায়িত্বহীনতা ধ্বংসাত্মক পরিণাম বয়ে আনতে পারে। তাই সতর্কতার সঙ্গে সুচিন্তিতভাবে এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। কারণ এক্ষেত্রে কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবার ও বন্ধুরাই শুধু নন, ঘটনা সম্পর্কে যারা জানতে পেরেছেন, সংবাদ পরিবেশনে ত্রুটি তাদেরও প্রভাবিত করতে পারে। আর এ বিষয়টি কখনোই খাটো করে দেখা উচিত নয়। এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব যাতে এড়ানো যায়, সে কারণে কয়েকটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম অব দি ওশান (আইপিএসও)-এর অনুযোগ কমিটির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড বেস্ট সম্প্রতি এক প্রেস গেজেটে গণমাধ্যমে আত্মহত্যার সংবাদ কভার করার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনার কথা তুলে ধরেন, যা যুক্তরাজ্যের সামারিটানস মিডিয়া অফিস রেফারেন্স হিসেবে তুলে ধরে। আত্মহত্যার দায়িত্বহীন রিপোর্ট সমাজে আত্মহত্যা অনুকরণ (imitative) বা একই আচরণ নকলের (copycat) দিকে ধাবিত করে। সেসব ব্যক্তি, যাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে এবং তরুণরা আত্মহত্যার মেথডগুলো জেনে যায়, তাহলে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে যাবে। আবার যেসব ব্যক্তি আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পায় না, এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও এ ধরনের তথ্য আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করে। অপরদিকে আত্মহত্যার ইতিবাচক প্রতিবেদন করায় গণমাধ্যমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করে কয়েক বছরব্যাপী এর গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে। এ ধরনের ইতিবাচক প্রতিবেদন আত্মহত্যাপ্রবণ মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তকে সহযোগিতা প্রত্যাশার উৎসাহিত করে। সংবেদনশীল কাভারেজ আত্মহত্যার অনুভূতি সংক্রান্ত ট্যাবুও কমিয়ে আনে এবং রীতিকে চ্যালেঞ্জ করে।

এ কারণে সামারিটানস 'আত্মহত্যার প্রতিবেদনের দিকনির্দেশনা' প্রকাশ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা তুলে ধরায় সামারিটানসের এ নির্দেশনাটি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গণমাধ্যমগুলো কাজ করে যাচ্ছে। সামারিটানসের গবেষণায় শব্দ, বাক্য, ছবি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। কোন প্রেক্ষাপটে ও কী কারণে খবরটি পরিবেশন করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে ধীরস্থিরভাবে চিন্তাভাবনা করার কথা স্মরণ রাখার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এ নির্দেশনায়।

এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব যাতে এড়ানো যায়, সে কারণে কয়েকটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

১. ধীরস্থিরভাবে শব্দ, বাক্য, ছবি ব্যবহার করতে হবে এবং কোন প্রেক্ষাপটে ও কী কারণে খবরটি পরিবেশন করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে ধীরস্থিরভাবে চিন্তাভাবনা করার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই এসব দিকনির্দেশনা। নাটকীয় হেডলাইন এড়িয়ে যেতে হবে।
২. আত্মহত্যার পদ্ধতি ও কলাকৌশলগত খুঁটিনাটি এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন– কী ধরনের দড়ি ব্যবহার করেছিল বা বেশি ডোজে ওষুধ খেয়েছিল। কী ধরনের ওষুধ খেয়েছিল। দ্রুত মৃত্যু হয় এমন কোনো পদ্ধতি বা বেদনাবিহীন ছিল কিনা– বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন– 'আত্মহত্যা এক ধরনের হুমকি বা মহামারি– এ ধরনের হেডলাইন বর্জন করতে হবে।
৩. যেসব জায়গায় গেলে আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিরা সহযোগিতা পেতে পারে, সেসব জায়গা উল্লেখ করতে হবে।
৪. সতর্ক থাকতে হবে, যে কোনোভাবে সামাজিক গণমাধ্যম যাতে আত্মহত্যার ঘটনাটিকে প্রশংসনীয়ভাবে তুলে না ধরে।
৫. নাটকীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ ভিডিও ও ছবি ব্যবহার থেকে এবং সুইসাইড নোট তুলে ধরা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৬. নেতিবাচক কাভারেজ তরুণ বয়সিদের ওপর বিরূপ বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। মৃতের ছবি ছাপনো বা বারবার ধারাবাহিকভাবে ছাপানোর প্রয়োজন নেই।
৭. এ ধরনের সংবাদকে অযৌক্তিক প্রাধান্য দিয়ে পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা যাবে না।
৮. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে হবে। এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে, ক্ষতিগ্রস্তরা অন্য দশজনের চেয়ে বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ।
৯. আত্মহত্যার অব্যবহিত কারণ সম্পর্কে ধারণা বা জল্পনা থেকে বিরত থাকতে হবে।
১০. পরিসংখ্যান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক, বাসস

গণমাধ্যম বিষয়ক আপনার লেখাটি নিরীক্ষার পাতায় মুদ্রণ করতে চাই। এর জন্য উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে। লেখাটি নিম্নঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

প্রসঙ্গ
সংবাদমাধ্যমের
মিশন ও ভিশন

শেখর ত্রিপাঠি

সংবাদপত্র প্রারম্ভিক পর্বে সম্পূর্ণ সেবামূলক মনোভাব নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। কতিপয় সমাজ সচেতন, দেশপ্রেমিক, উদারনৈতিক ও সর্বোপরি দূরদর্শী মানবহিতৈষী কর্তৃক এর সূচনা। আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় তা অতিমাত্রায় বাণিজ্যমুখী হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার অভিন্ন এক প্রায়োগিক কৌশল অবলম্বনের সুবাদে একশ্রেণির ব্যবসায়ী সংবাদপত্রকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে শুধুমাত্র তাদেরই আপন স্বার্থ সমুন্নত রাখার চালাচ্ছে। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রয়াস ধারায় এই শিল্পটিও বাদ যাবে কেন? স্বাধীনতাপরবর্তী আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তাতে এই মহান পেশা ও মানবতাবাদের দর্পণটিও যে ইতোমধ্যেই ক্ষতবিক্ষত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

> *কেননা তৎকালীন সাংবাদিকতা পেশা যেমনি ছিল চরম ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি ছিল পরিপূর্ণ সেবামূলক মনোবৃত্তির ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত ও অনুরণিত। নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে বা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার বিন্দুমাত্র প্রয়াসও তৎকালীন সাংবাদিক সমাজে ছিল না*

মাত্র কয়েক দশক আগেও সংবাদপত্র তার আদর্শিক বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত ও অনুরণিত করার ক্ষমতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ও সক্ষম হয়েছিল তেমনত মানুষদের প্রচেষ্টা ও সাধনায়। কারণ, ওই সমস্ত সংবাদপত্র সম্পাদক ও সেবীরা ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমাজের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে সংবাদপত্রের মৌলিকত্ব সমুন্নত রাখতে চরম ও পরম ত্যাগ স্বীকারেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রক্তচক্ষুকে অবহেলা করে তারা অন্যতম এই মহান পেশাটির গুণগত মান ও লক্ষ্যকে 'আলোকবর্তিকা' হিসেবে নিজেদের মধ্যে ধারণ ও বরণ করে এর জয়যাত্রাকে এগিয়ে নিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও এই পেশার মূলমন্ত্র তথা আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে বিন্দুমাত্রও প্রয়াস চালাননি যা নিঃসন্দেহে আমাদেরকেও ওই পথে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা জোগাতে সহায়ক (auxiliary)। কিন্তু মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ও দুনিয়াজুড়ে একশ্রেণির বলদর্পী শ্রেণির

সগর্ব পদচারণা তাদের এই সুমহান প্রচেষ্টা, আদর্শ, ত্যাগ ও সর্বোপরি বিশ্ব মানবতাবোধের পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসকে এক 'দুঃস্বপ্নে' (nightmare) পরিণত করতে চায়! কিন্তু আমাদেরকে এই জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই মহান পেশার মূল লক্ষ্য ও মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে।

মাত্র কিছুকাল আগেও সংবাদপত্র জগতে যাঁরা পদার্পণ করতেন তাঁরা নিঃসন্দেহে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ তথা পরিপূর্ণ সমাজহিতৈষী-সকল প্রকার ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সমাজের সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও বৈষম্য এই 'দর্পণে' প্রতিফলিত করার সুদৃঢ় অঙ্গীকারের মাধ্যমে– যা এগিয়ে চলবে তাদের ক্ষুরধার লেখনীর সুবাদে সকল প্রকার রক্তচক্ষু, নিপীড়নের প্রয়াসকে থোড়াই কেয়ার করে। রুটি-রুজির মাধ্যম হিসেবে এটিকে পেশা হিসেবে নিলেও ব্যক্তিস্বার্থকে নয়, পেশাগত স্বার্থকেই দেয়া হতো সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। চট্টগ্রামের সাংবাদিকতায় প্রাচীনতম ইংরেজি দৈনিক পিপলস ভিউ'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রথিতযশা সাংবাদিক মরহুম নুরুল ইসলাম তেমনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যার আলোকচ্ছটায় শুধু সাংবাদিকতা জগৎ নয়, আর্তমানবতাসহ মানবজীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রই উদ্ভাসিত হয়েছে।

সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পর জীবনযুদ্ধে তিনি অনেক আকর্ষণীয় পেশায় যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পরও সাংবাদিকতাকেই একমাত্র পেশা ও নেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

> *ইদানীং যে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উত্তাল ঢেউ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত হতে শুরু করেছে এর সুবাদে সংবাদপত্র শিল্পও অস্থিরতায় ভুগছে, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেশাদার ও স্বার্থান্বেষী মহলে সংবাদপত্রের মালিক হওয়ার প্রবণতা*

কেননা তৎকালীন সাংবাদিকতা পেশা যেমনি ছিল চরম ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি ছিল পরিপূর্ণ সেবামূলক মনোবৃত্তির ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত ও অনুরণিত। নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে বা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার বিন্দুমাত্র প্রয়াসও তৎকালীন সাংবাদিক সমাজে ছিল না অর্থাৎ যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ এই পেশাকে তাঁদের নিজের করে নিয়ে সমুখপানে এগিয়ে চলার প্রয়াস চালিয়েছেন, তাঁরা প্রকৃত অর্থেই মানুষকে ভালোবেসেছেন, সমাজকে ভালোবেসেছেন এবং এই লক্ষ্যে বিরাজিত সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন নির্ভীকচিত্তে সকল প্রকার ভয়ভীতি-লোভকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে। মরহুম নুরুল ইসলামের জীবদ্দশায় তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছিল প্রকৃত অর্থেই এই সামাজিক দর্পণ। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে ইংরেজি দৈনিক পিপলস ভিউ প্রকাশিত হয় যা মাত্র দু'বছরের মধ্যে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। কিয়ৎকালের মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণির সামাজিক দর্পণ হিসাবে শুধু চট্টগ্রাম বা সমগ্র দেশেই নয়, বিদেশেও এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। দেশব্যাপী সচেতন সমাজের ও বিদেশ থেকে অসংখ্য নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও ঈর্ষণীয় গ্রহণযোগ্যতার সুবাদে। ফলে ক্রমান্বয়ে তাঁর খ্যাতি শুধু একজন সফল সাংবাদিক হিসেবে নয়, প্রকৃত মানবতাবাদী হিসেবেও সমাজে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কেননা নিজস্ব বৈভব তথা পাওয়ার চাইতে সমাজ সেবাতেই তিনি মনোনিবেশ করেন, সাংবাদিকতার দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বে নিজেকে সমর্পণ করেও মূক ও বধিরদের কল্যাণে প্রয়াস চালানো নিঃসন্দেহে, তাঁর মানবপ্রেমকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

পাশাপাশি, সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে তাঁর ভূমিকা ছিল আপসহীন যদিও, তাঁর সেই সংগ্রামের কৌশল ছিল 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' এর ভিত্তিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটি অদৃশ্য দেয়াল ছিল, আছে এবং থাকবে। এই দেয়ালকে শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তুলে ফেলা তো যাবেই না বরং এমনকি টপকানোও যাবে না। তবুও এই দেয়ালের দুই প্রান্তে অবস্থান করে সবাইকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। তাই কোনো পক্ষেরই এমন কোনো অবস্থান গ্রহণ করা উচিত নয় যাতে করে পুরো অবকাঠামোটাই ভেঙে পড়ে, আর তা হলে তো উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কম বা বেশি। তাই তিনি এই শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বাস্তবতার নিরিখে একটি প্রায়োগিক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে স্ব-স্ব স্বার্থ সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করে গেছেন এবং এতে করেই একজন সফল ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হিসেবে এই শিক্ষা তিনি আমাদের মাঝে সঞ্চারিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

সংবাদপত্রকে সামাজিক ঢাল ও অর্থ উপার্জনের একচেটিয়া মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার এক ক্রমবর্ধমান প্রবণতা অবশ্যই যেমনি এই শিল্পের নৈতিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে, তেমনি যে শ্রেণি কর্তৃক এই প্রয়াস চালানো হচ্ছে, তারা যে নিঃসন্দেহে সমাজ ও পেশায় এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক তাও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হচ্ছে। আজকের সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমসমূহে যেভাবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাহারি বিজ্ঞাপনে ভরপুর করে দিচ্ছে তাতে সংবাদপত্রের নৈতিক লক্ষ্য তো বটেই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকেও উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এই সমস্ত সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমসমূহ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদপত্র(?) বলে পরিচিত হলেও চরিত্র ও অবয়বে বিজ্ঞাপনপত্র বলেই মনে হয় পাঠকদের কাছে। অথচ অর্থনৈতিক ব্যাপারটিকে উহ্য না করেও সংবাদপত্রের আদর্শ ও লক্ষ্যকে সমুন্নত রাখা অসম্ভব কিছু নয়, শুধু প্রয়োজন সেবামূলক মনোবৃত্তি ও সমাজের প্রতি অঙ্গীকার ও দায়িত্ববোধ। সংবাদপত্রকে সহজেই বিত্তবৈভবের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস চালানো যায় অন্তত আজকের এই নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে; কিন্তু এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যকে পদদলিত করে কোনোভাবেই কি এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে!

গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হিসেবে বাক্ ও প্রকাশের স্বাধীনতা যদি সুনিশ্চিত করতে হয় যদি গণমানুষের সামাজিক প্রেক্ষাপট কলমসৈনিকরা তাদের লেখনীতে তুলে ধরতে চায়, তাহলে সংবাদপত্রের মূলমন্ত্র ওই সেবামূলক মনোবৃত্তিকেই সমুন্নত রাখতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থের অপখেয়ালে সমাজের কোনো অংশের মানুষ এই পেশা ও মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার প্রয়াসী হলে গণতন্ত্র তো নয়ই, বরং এই শিল্পই তার স্বকীয়তা হারাতে বাধ্য। কাজেই অপেশাদার বা শুধু বৈষয়িক লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এই পেশাতে অনুপ্রবেশ ঘটলে পুরো শিল্পটিই একদিন মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। আমরা চাই সংবাদপত্র তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিরন্তন চলা অব্যাহত রাখুক। সংবাদপত্র তথা পুরো সংবাদ মাধ্যমই হয়ে উঠতে পারে প্রকৃত অর্থে এক পরিপূর্ণ 'সমাজ দর্পণ'।

ইদানীং যে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উত্তাল ঢেউ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত হতে শুরু করেছে এর সুবাদে সংবাদপত্র শিল্পও অস্থিরতায় ভুগছে, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেশাদার ও স্বার্থান্বেষী মহলে সংবাদপত্রের মালিক হওয়ার প্রবণতা, প্রতিষ্ঠানকে অপর্যাপ্ত লোকবল, বেতন বোর্ড রোয়েদাদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন, সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারীদের থোক বেতন এমনকি কথায় কথায় ছাঁটাই এবং সর্বোপরি অনিয়মিত প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন খেকো মনোবৃত্তি। এর ফলস্বরূপ এই শ্রেণির মানুষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে আঙুল ফুলে কলাগাছ হলেও, সংবাদকর্মী যাদের মেধা, শ্রম ও নিষ্ঠার বদৌলতে তাদের এই উন্নয়ন (?) তাদেরকে যেমন মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছে, তেমনি পুরো শিল্পটির মেরুমজ্জা গলাধঃকরণের মাধ্যমে তার প্রাণপ্রবাহকেই বিপন্ন করে তুলেছে। তাই অবিলম্বে এই মহান পেশা ও শিল্পকে স্বার্থান্ধতার জাঁতাকল থেকে মুক্তি দিয়ে এর সুরক্ষা নিশ্চিত করে সংবাদপত্রকে সত্যিকার অর্থেই এক সমাজ দর্পণ হিসেবে ভূমিকা পালনে প্রয়োজনীয় 'আবহ' বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক: যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, দৈনিক পিপলস ভিউ

নারী সাংবাদিকতা ও প্রতিবন্ধকতা

আফরোজা তালুকদার

বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকতার কথা বলার আগে এদেশে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। যে ঘটনাগুলো বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রাসঙ্গিকভাবেই নামগুলো পরিবর্তন করে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হলো।

ঘটনা-১: কল্পনা সাহা। অনেকটা শখ এবং কিছুটা বাড়তি আয়ের আশায় একটি জাতীয় দৈনিকে সাব-এডিটর হিসেবে কাজ নিয়েছেন। কাজের স্বার্থেই তাকে প্রায় সময় রাতে অফিস করতে হয়। বিষয়টি স্বামী মেনে নিতে পারতেন না। এজন্য দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ লেগেই থাকত। সর্বশেষ কল্পনা সাহা স্বামী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

> *নারীরা অনুসরণ করবে নূরজাহান বেগম, সেলিনা পারভীন ও লায়লা সামাদের মতো গুণী সাংবাদিকদের। প্রমাণ করবে এই মাধ্যমেও পুরুষের চেয়ে নারীর যোগ্যতা কম নয়।*

ঘটনা-২: সুলতানা রাজিয়া বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও স্বনামধন্য পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান যারা রেখেছেন, তাঁদেরকে সরকারের দেওয়া একটি সোনার ক্রেস্ট তৈরি করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বড়ো ধরনের অনিয়ম ফাঁস করে বাংলাদেশে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতা করতে তাঁর অফিস ও সচিবালয়ে বিভিন্ন প্রবিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়।

ঘটনা-৩: রোকেয়া বেগম বাংলাদেশের একটি সাধারণ সংবাদপত্রে কাজ করেন। কিন্তু শুধু নারী হওয়ায় সংবাদমাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। যেখানে তিনি কাজ করতে যান, বেশির ভাগ জায়গায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। নারী হওয়ায় নিজ বসের কাছেও তাকে মোকাবিলা করতে হয় নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ। শেষ অবধি তিনি এত অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, তাকে সাংবাদিকতা ছাড়তে হয়েছে।

ঘটনা-৪: সুমা চৌধুরী। বাংলাদেশের প্রথম সারির একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রধান হিসেবে কর্মরত। তিনি সব সময় সমস্যাকে সমস্যা মনে না করে শুধু কাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এখন নিজেকে এত বড়ো ভাবছেন যে, ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। একজন নারী হয়েও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন একটি টেলিভিশন চ্যানেল। তবে তিনিও অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা পার করে আজ এ অবস্থানে এসেছেন।

সাংবাদিকতায় নারীর অবস্থান

সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশার নাম। ঝুঁকিপূর্ণ পেশাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। পুরুষের পাশাপাশি এ পেশায় নারীরাও এগিয়ে চলছেন সমান তালে। প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক উভয় মাধ্যমেই তারা পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সংবাদ উপস্থাপক, বিশ্লেষক, রিপোর্টার, সঞ্চালনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন তাঁরা। পত্রিকা, টেলিভিশন, এফএম রেডিও এবং অনলাইন মিডিয়াগুলোয় নারীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে চলছেন। প্রধানমন্ত্রী বিট, পার্লামেন্ট বিট, ক্রাইম বিট ও খেলাধুলা বিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নারীরা সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করছেন। ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখাচ্ছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট কমিউনিকেশন ১৯৯৮ সালে ২১টি দৈনিক, তিনটি ম্যাগাজিন এবং পাঁচটি সংবাদ সংস্থার ৬৯ নারী সাংবাদিকের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, সব সংবাদমাধ্যমে ৭ শতাংশ সংবাদকর্মী নারী। তবে এ সংখ্যা আগে আরো কম ছিল। বর্তমানে সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে।

২০১৩ সালের ১৪-১৬ মে পিআইবি ও নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী ৭০ জন নারী সাংবাদিক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। যারা শুধু সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বার্তা সম্পাদক শাহনাজ মুন্নী বলেন, 'বাংলাদেশের নারীরা সাংবাদিকতায় আগের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে। এখন সব প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করছে। তবে অনুপাতটা অসম। নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম। অগ্রগতি হলো, আগে সাংবাদিকতায় নারীরা আসতে পারতেন না, ১০-১৫ বছর নারীরা এ পেশায় আসছে।

তাই যেভাবে নারীরা সাংবাদিকতায় আসতে শুরু করেছেন, সব প্রতিকূলতাকে পদদলিত করে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। আগামী দিনে সংবাদমাধ্যমের শীর্ষ পদগুলোয় নারীর সংখ্যা বাড়বে, এতে সন্দেহ নেই। এমনকি সাংবাদিকদের সংগঠনগুলোয় নারীর পদচারণ বাড়বে। নারীরা অনুসরণ করবে নূরজাহান বেগম, সেলিনা পারভীন ও লায়লা সামাদের মতো গুণী সাংবাদিকদের। প্রমাণ করবে এই মাধ্যমেও পুরুষের চেয়ে নারীর যোগ্যতা কম নয়।

সাংবাদিকতায় বাঙালি নারীর পদচারণ

সাংবাদিকতায় বাঙালি নারীর পদচারণ ব্রিটিশ আমল থেকে। পাক্ষিক সাময়িকী 'বঙ্গমহিলা' সম্পাদনের মাধ্যমে নারী সাংবাদিকদের আগমন ঘটে। মোক্ষম দায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালের ১৪ এপ্রিল। প্রথম মাসিক জেন্ডারভিত্তিক ম্যাগাজিন 'অনাথিনী' নারীদের দ্বারা প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের জুলাইয়ে। নারী কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'বঙ্গবাসিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। মুসলিম নারী বেগম সুফিয়া খাতুন সম্পাদিত ম্যাগাজিন 'অন্বেষা' প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। বিভাবতী সেন কর্তৃক সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পাপিয়া' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে, যা পরবর্তী সময়ে ১৯২৮ সালে মাসিক ম্যাগাজিনে রূপান্তরিত হয়। লীলাবতী নাগ সম্পাদিত সচিত্র মাসিক 'জয়শ্রী' ১৯৩১ সালের এপ্রিলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। পূর্ব বাংলার প্রথম যে সাময়িকী প্রকাশিত হয়, তার নাম ছিল 'বঙ্গনারী'। সাপ্তাহিক 'বেগম' প্রত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই। এ পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশক ছিলেন সুফিয়া কামাল। শুরুতে নূরজাহান বেগম ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। পরবর্তী সময়ে তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং আমৃত্যু বেগম পত্রিকাটির হাল ধরে রাখেন। মূলত বেগম পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকতায় নারী জাগরণের সূত্রপাত ঘটে এবং তিনি অসংখ্য নারী লেখক ও সাংবাদিক তৈরি করেন। তিনি বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ, এক কিংবদন্তি। এছাড়া রাজিয়া খাতুন, শামসুন নাহার, হোসনে আরা, রিজিয়া বেগম, আনোয়ারা বেগম, সুপ্রভা দেবী, কল্যাণী রায় প্রমুখ নারী সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। যদিও তা খুব ধীরগতিতে। ষাট, সত্তর ও আশির দশকে নারী সাংবাদিকদের মধ্যে অন্যতম যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন লায়লা সামাদ, জাহানারা আরজু, মাসুদা চৌধুরী, সেলিনা পারভিন, গুলশান আরা, মাসুমা খানম, ঊর্মি রহমান প্রমুখ। সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁরা। এরপর 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার 'মহিলা অঙ্গন' ফিচার পাতার সম্পাদক আখতারুন্নাহার বেবী নারীবাদকে তাঁর লেখায় প্রগতিশীলতার সঙ্গে স্থান দিয়েছেন। এছাড়া নাদিরা মজুমদার বাংলাদেশের প্রথম ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার হিসেবে পরিচিত। তিনি সাপ্তাহিক 'রোববার'-এ কাজ করেছেন। মুন্নী সাহা এটিএন নিউজ টেলিভিশনের সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফরিদা ইয়াসমিন বর্তমানে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শাহানাজ মুন্নী চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত আছেন। সামিয়া জামান, সামিয়া রহমান, ফারজানা রুপা ও রোজিনা ইসলামের মতো নারী সাংবাদিকরা সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে নাদিরা কিরণ, সাজু রহমান, ঝর্না মনি, রাবেয়া বেবী, তাসকিনা ইয়াসমিন, সেবিকা দেবনাথ, নাজনীন আখতার, নাজনীন বেগম, দিপা ঘোষ, জয়িতা রায়সহ অসংখ্য নারী সাংবাদিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতায় নারীর প্রতিকূলতা

সিনিয়র সাংবাদিক ও ইংরেজি দৈনিক নিউজ টুডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেন, নারীদের এগিয়ে আসার পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি। একজন নিউজ এডিটর যদি মহিলা হন, তাহলে তাকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটা এখনো মেয়েদের সপক্ষে নয়।

মেয়েদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব আছে, এটা আমি বলব না। পরিবেশের কারণে তারা এগিয়ে আসতে পারছে না। দায়িত্ব তাঁরা নেয়ও না, মালিক তাদের দিতেও চায় না। এ বক্তব্য থেকে আমরা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারি, বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকদের অবস্থান কতটুকু। বাংলাদেশে এখনো নারীদের পুরুষের সমচোখে দেখা হয় না। একজন নারী ঘরের বাইরে গিয়ে যে কোনো সময়, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো পরিবেশে, যে কোনো কাজ করবে, তা এ দেশের সিংহভাগ পুরুষ মেনে নেয় না। যেসব মেয়ে বাইরে গিয়ে কাজ করে, তাঁরা ভলো মেয়ে নয় বলে মন্তব্য করে থাকে এদেশের কিছু স্বার্থান্বেষী পুরুষ সমাজ। অনেক উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র, যারা নিজেকে সমাজ গড়ার কারিগর পরিচয় দিয়ে থাকে এবং অনেক সময় তাঁরা দেশের উচ্চতম পর্যায়ে কাজ করে থাকে, তাঁরা নারী সাংবাদিকদের সাহসিকতার প্রশংসা না করে অনেক সময় নেতিবাচক মন্তব্য করে থাকে। এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরীন বলেন, সাংবাদিকতাকে নারীর পেশা বলে মনে করা হয় না। এমন মনোভাব আমি অনেক পুরুষ সাংবাদিকের মধ্যেও দেখেছি।

তাই বর্তমানে বাংলাদেশে সাংবাদিকতায় পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম। গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্ট নামক একটি সংস্থার পর্যবেক্ষণের বরাত দিয়ে ড. নাসরীন আরো বলেন, দশ বছরে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়েনি বরং তুলনামূলকভাবে কমেছে।

বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পিআইডি গাইড নামে যে টেলিফোন নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ২০০টি ইংরেজি, বাংলা ও অনলাইন পত্রিকার মধ্যে নারী সম্পাদক রয়েছেন মাত্র ছয়জন। তাঁরা সবাই সম্পাদক হয়েছেন মালিকানা সূত্রে, সাংবাদিকতা করার সূত্রে নয়।

নারীরা প্রধান প্রতিবেদক ও বার্তা সম্পাদক পদে কাজ করছেন যে কটি পত্রিকায়, তার সবকটি নামসর্বস্ব। আর তালিকাভুক্ত ২৫টি টেলিভিশনের মধ্যে নারী সিইও রয়েছেন একটিতে এবং বার্তা সম্পাদক রয়েছেন একটিতে।

আমাদের সমাজে একজন নারীর কোনো নিরাপত্তা নেই। পুরুষশাষিত এ সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নারীদের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়। নারীদের করতে হয় বেঁচে থাকার লড়াই, টিকে থাকার লড়াই।

অনেক সময় পরিবার থেকেও তাদের সন্তানদের সাংবাদিক হতে নিরুৎসাহিত করা হয়। বাধা দেয়া হয় তাঁদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। এ সম্পর্কে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বার্তা সম্পাদক শাহানাজ মুন্নী বলেন, সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ পেশায় নারীদের অনেক প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়। সামাজিক ও পারিবারিক দুইভাবে প্রতিবন্ধকতা আসে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কিছুটা কমেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাবে নারীরা এখনো প্রতিবন্ধকতার শিকার হন।

তবুও হাজার প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। সাহসিকতার সঙ্গে পালন করছেন তাঁদের দায়িত্ব।

লেখক: সাংবাদিক

গণমাধ্যম সংবাদ

পিআইবি মিলনায়তনে পত্রিকা ও টেলিভিশনের সম্পাদক, মালিক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে সভা শেষে তাদের প্রশ্নের জবাব দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, পাশে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম

সম্পাদক ও মালিকদের নিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভা

তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত পত্রিকা ও টেলিভিশনের সম্পাদক, মালিক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের নিয়ে আলোচনাসভা ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম এবং ভারপ্রাপ্ত তথ্য সচিব নাসির উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান প্রধান পত্রিকা, সংবাদ সংস্থা, টেলিভিশন ও রেডিওর সম্পাদক, মালিক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'গণমাধ্যমের সঙ্গে সরকারের হয়তো কিছুটা দূরত্ব হয়েছে, এটা কমাতে হবে। কমানো সম্ভব। গণমাধ্যম সরকারের শত্রু বা প্রতিপক্ষ নয়। গণমাধ্যমের প্রতি আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই।'

তিনি বলেন, 'আমরা অভ্রান্ত নই। ভুল করতে পারি। ভুল সংশোধনও করতে পারি। আমরা অভিযোগ তখনই করি, যখন সত্যকে ভুল এবং ভুলকে সত্য বলার প্রবণতা দেখি।'

টেকনাফ ও ঘাটাইলের সংসদ সদস্য, শাহজাদপুরের মেয়র, বগুড়ার তুফান সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখ করে সেতুমন্ত্রী বলেন, 'দলীয় অনেক নেতা অপরাধ করে পার পাননি। অপরাধী কেউ রেহাই পাবেনও না। আমাদের মধ্যে সংশোধনের চেষ্টাও আছে। কিন্তু এজন্য কোনো প্রশংসা পাই না। আপনারা যদি ঢালাওভাবে আক্রমণাত্মক জার্নালিজম করেন, তাহলে কষ্ট পাই।'

আওয়ামী লীগ ২১ বছর ক্ষমতায় ছিল না উল্লেখ করে সেতুমন্ত্রী বলেন, 'দেশে পাকিস্তানি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখান থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। এরশাদের সঙ্গে জোট করার সমালোচনা করা হয়। এটা একটা কৌশলগত জোট।'

সভায় তথ্যমন্ত্রী দেশে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রেডিওর অভূতপূর্ব প্রসারের চিত্র তুলে ধরে বলেন, গণমাধ্যম সক্রিয় থাকা উন্নয়নের জন্য জরুরি।

সম্পাদক ও মালিকদের পক্ষ থেকে অনেকেই বক্তব্য দেন। তাঁরা বলেন, গণমাধ্যমের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। মান বাড়েনি। গণমাধ্যমের অনেক সমস্যা রয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সমালোচনা করে তাঁরা বলেন, গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার জন্য এ আইন করা হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে আরো আলোচনা হওয়া দরকার।

সূত্র: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, প্রথম আলো

সাংবাদিকতায় স্বাধীনতা পুরস্কার পেলেন শাইখ সিরাজ

নিরীক্ষা প্রতিবেদক: মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, উন্নয়নসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এ বছর ১৮ জনকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এই বেসামরিক সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। কৃষি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শাইখ সিরাজকে এ বছর স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়। ২৫ মার্চ ২০১৮ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'স্বাধীনতা পদক-২০১৮' প্রদান করা হয়। স্বাধীনতা পদক বিজয়ী প্রত্যেকে এবং মরণোত্তর পদক বিজয়ীদের পক্ষে তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং পরিবারের সদস্যরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পদক গ্রহণ করেন। পুরস্কার হিসেবে ৩ লাখ টাকার চেক, ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের একটি পদক ও সনদ দেওয়া হয়।

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বাংলাদেশ একদিন জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবেই গড়ে উঠবে এবং বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে। কারো কাছে হাত পেতে নয়, আমাদের যতটুকু সম্পদ, তা দিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে যাব। এ দেশকে আমরা আরো সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যাব।' অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানা এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিআরইউর আলোচনাসভায় স্পিকার

নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল নজির গণমাধ্যমে তাঁদের উপস্থিতি

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, এ দেশের নারীরা নির্ভীকতা, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকরা আরো এগিয়ে। নারী সাংবাদিকদের দৃশ্যমান উপস্থিতি প্রমাণ করে, বাংলাদেশ এখন নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত 'গণমাধ্যমে নারী ও কর্মপরিবেশ' শীর্ষক আলোচনাসভা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. শিরীন শারমিন এমপি এসব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা পেশায় বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন ও ডিআরইউর সাবেক সহ-সভাপতি মাহমুদা চৌধুরীকে সম্মাননা জানানো হয়। ডিআরইউ সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শুকুর আলী শুভ, নারীবিষয়ক সম্পাদক ঝর্ণা মনি, নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির প্রধান বার্তা সম্পাদক শাহনাজ মুন্নী, ডিইউজের কোষাধ্যক্ষ উম্মুল ওয়ারা সুইটি, নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির আঙ্গুর নাহার মন্টি, নাগরিক টিভির শাহনাজ শারমীন, এটিএন বাংলার নাদিরা কিরণ, বাসসের শাহানা শিউলি, সুমি খান, জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্পিকার বলেন, কর্মস্থলে প্রতিকূল পরিবেশ থাকবে। তারপরও নারীকে তাদের অবস্থান থেকে সরে আসা চলবে না। নারীদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হতে হবে, সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং এই এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, সাংবাদিকতা একটি কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং পেশা। এ পেশায় টিকে থাকতে তাদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়। সেজন্য নারীদের জন্য উত্তম কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আসীন করতে হবে; যাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমসুযোগ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়।

সূত্র: ৭ মার্চ ২০১৮, কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর প্রেস কাউন্সিল কার্যালয়ে কেক কাটেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, বিচারের আগে 'মিডিয়া ট্রায়াল' যেমন খারাপ কাজ, তেমনি বিচারের পর অপরাধীকে মহান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাও খারাপ। অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি তৈরি গণমাধ্যমের কাজ নয়।

দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস পালন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর তোপখানা রোডে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রথমবার প্রেস কাউন্সিল পদক ঘোষণা করা হয়।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দণ্ডিত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তথ্যমন্ত্রী বলেন, মুখ দেখে, দল দেখে আদালত চলে না। দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবে বিচারের আগে কারো 'মিডিয়া ট্রায়াল' হওয়া খারাপ কাজ। এতে একজন নিরপরাধীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে। তেমনি বিচারের পর অপরাধীকে মহান বানানোও খারাপ কাজ। অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা তৈরি গণমাধ্যমের কাজ নয়।

প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। সঞ্চালনা করেন কাউন্সিলের সচিব (যুগ্ম সচিব) শ্যামল চন্দ্র কর্মকার। এর আগে প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে অতিথিরা কেক কেটে দিবসের কার্যক্রম শুরু করেন। অতিথিদের বক্তব্য শেষে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদকপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। এবার আজীবন সম্মাননা পদক পেয়েছেন সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবদুল গাফ?ফার চৌধুরী, প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা পদক পেয়েছেন দৈনিক সংবাদ, গ্রামীণ সাংবাদিকতায় সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি রাজীব নূর, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় জনকণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার রাজন ভট্টাচার্য, নারী সাংবাদিকতায় দৈনিক বরিশাল সময়ের প্রধান প্রতিবেদক মর্জিনা বেগম ও আলোকচিত্রে দৈনিক আমাদের সময়ের নিজস্ব আলোকচিত্রী সাংবাদিক আল আমিন লিয়ন।

সূত্র: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, সমকাল

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান

দুর্নীতি কমলে দেশের আরো উন্নতি সম্ভব। ব্যাংক কেলেঙ্কারিসহ নানা ক্ষেত্রের দুর্নীতি ছাপিয়ে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান।

দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে ২৮ মার্চ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান হয়।

কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন দুদক কমিশনার এ এফ এম আমিনুল ইসলাম, মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড বিচারকমণ্ডলীর সদস্য একুশে টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী ও প্রধান সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার বিশেষ কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দুটি ক্যাটাগরিতে বিজয়ী ছয় সাংবাদিকের নাম ঘোষণা করেন মনজুরুল আহসান বুলবুল।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ছয় বিজয়ী সাংবাদিক অর্থ প্রতিমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে দুদকের মনোগ্রাম সংবলিত ক্রেস্ট ও অর্থ গ্রহণ করেন।

এর মধ্যে প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে রয়েছেন প্রথমস্থান অধিকারী দৈনিক সমকালের স্টাফ রিপোর্টার আবু সালেহ রনি, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার নেছারুল হক খোকন ও তৃতীয় স্থান অধিকারী জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার বিভাষ বাড়ৈ। ইলেকট্রনিক ক্যাটাগরিতে বিজয়ী তিনজনের মধ্যে রয়েছেন– প্রথমস্থান অধিকারী এটিএন বাংলার স্টাফ রিপোর্টার মাহবুব কবির চপল, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মাছরাঙা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি মো. বদরুদ্দোজা বাবু ও তৃতীয় স্থান অধিকারী এনটিভির সিনিয়র করেসপনডেন্ট এ এস এম জহিরুল ইসলাম।

সূত্র: ২৯ মার্চ ২০১৮, সমকাল

দুই পথিকৃৎ সাংবাদিককে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মাননা

নারীর অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে দুই পথিকৃৎ সাংবাদিককে সম্মাননা প্রদান করেছে জাতীয় প্রেস ক্লাব। তাঁরা হলেন– সাঈদা খানম ও তাসমিমা হোসেন। ১৯৫৬ সালে বেগম পত্রিকায় আলোকচিত্র সাংবাদিকতা শুরু করে দেশে প্রথম নারী ফটো-সাংবাদিকতায় নাম লেখান সাঈদা খানম। তুলেছেন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি। পেয়েছেন দেশ-বিদেশের অনেক সম্মাননা। তাঁর অনুপ্রেরণায় আজ অনেক নারী পা দিয়েছেন ফটো-সাংবাদিকতায় বা ক্যামেরা পারসন হিসেবে। অন্যদিকে তাসমিমা হোসেন নিজ পরিচয় উদ্ভাসিত

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্তরা

দেশের প্রথম নারী ফটো সাংবাদিক সাঈদা খানমের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন

এক নারী। পাক্ষিক অনন্যা পত্রিকার সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। 'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার' ও 'অনন্যা শীর্ষদশ' নামে দুটি পুরস্কার দিয়ে তিনি নারীদের এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। গুণী আর শীর্ষ নারীদের সম্মানিত করছেন দীর্ঘদিন ধরে।

৮ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে তাদের মধ্যে একজনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাঈদা খানম সম্মাননা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে 'নারীর অগ্রগতিতে গণমাধ্যম' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সাংবাদিক দিল মনোয়ারা মনু। আরো বক্তব্য দেন প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, দৈনিক মানবজমিনের সম্পাদক মাহবুবা চৌধুরী ও নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু।

সূত্র: ৯ মার্চ ২০১৮, ইত্তেফাক

একুশে পদকপ্রাপ্ত নিখিল সেন সংবর্ধিত

একুশে পদকপ্রাপ্ত বরিশালের প্রবীণ সংস্কৃতিজন ও সাংবাদিক নিখিল সেনকে সংবর্ধনা দিয়েছে বরিশাল প্রেস ক্লাব। ৯ মার্চ প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নিখিল সেন যে চেতনা এবং আদর্শে আলোকিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেয়েছেন, সে আলোয় বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে আলোকিত হতে হবে। শুরুতে প্রেস ক্লাব নেতারা ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করেন পদকপ্রাপ্ত গুণিজন নিখিল সেনকে।

আলোচনায় অংশ নেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম ইমামুল হক, সংসদ সদস্য তালুকদার মো. ইউনুস ও শেখ মো. টিপু সুলতান, বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র আহসান হাবিব কামাল, জেলা প্রশাসক মো. হাবিবুর রহমান, ভাষাসংগ্রামী ও মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ হোসেন কালু, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম জাহাঙ্গীর, সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সভাপতি এস এম ইকবাল, মুক্তিযোদ্ধা মোখলেসুর রহমান, জেলা গণফোরামের সভাপতি হিরণ কুমার দাশ মিঠু, জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হাই মাহবুব, অধ্যক্ষ মোতালেব হোসেন হাওলাদার, ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

সূত্র: ১১ মার্চ ২০১৮, সমকাল

ল' রিপোর্টার্স ফোরাম নির্বাচন
সাঈদ সভাপতি জাবেদ সম্পাদক

ল' রিপোর্টার্স ফোরামের (এলআরএফ) নির্বাচনে সভাপতি পদে বাংলাদেশের খবর পত্রিকার প্রধান প্রতিবেদক সাঈদ আহমেদ খান ও সাধারণ সম্পাদক পদে এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান জাবেদ নির্বাচিত হয়েছেন। ৯ মার্চ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের দক্ষিণ হলে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন হলেও অন্য পদগুলোয় একক প্রার্থী থাকায় তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

কমিটির অন্যান্য পদে রয়েছেন– সহ-সভাপতি হীরা তালুকদার, যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক মনজুর হোসাইন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তানভীর আহমেদ, প্রশিক্ষণ ও কল্যাণ সম্পাদক মিজান আহমেদ এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে এনামুল হক এনাম, মালেক মল্লিক, এস এম নুর মোহাম্মদ ও মোসাদ্দেক আহমদ বশির।

সূত্র: ১০ মার্চ ২০১৮, সমকাল

বাকৃবি সাংবাদিক সমিতির নতুন কমিটি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (বাকৃবিসাস) ২০১৮ সালের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ১৫ জানুয়ারি গঠিত হয়েছে।

এতে সভাপতি পদে প্রথম আলোর শাহীদুজ্জামান সাগর এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ইত্তেফাকের নাজিব মুবিন নির্বাচিত হয়েছেন। সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– সহ-সভাপতি সাংবাদিক মো. ইউসুফ আলী, যুগ্ম সম্পাদক মো. মুসফিকুর রহমান সিফাত, সাংগঠনিক সম্পাদক আউয়াল মিয়া, কোষাধ্যক্ষ নাবিল তাহমিদ রুশদ, দপ্তর সম্পাদক মো. শাহীন সরদার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবুল বাশার মিরাজ, তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়ার আমিন এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাহিদ হাসান। কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন সাংবাদিক মোফাজ্জল হোসেন মায়া, রাকিবুল হাসান এবং আশিকুর রহমান। এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে এস এম আশিফুল ইসলাম এবং আহাদ আলম শিহাব নির্বাচিত হয়েছেন।

সূত্র: ১৬ জানুয়ারি ২০১৮, ইত্তেফাক

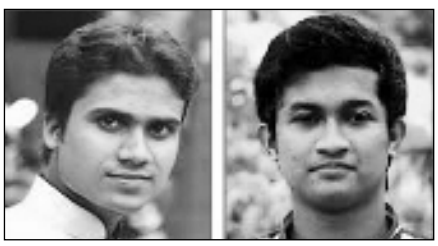

জাবি সাংবাদিক সমিতি নির্বাচন
হিমেল সভাপতি নিলয় সম্পাদক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (জাবিসাস) ২০১৮ সেশনের কার্যকরী পরিষদের সভাপতি পদে নূর আলম হিমেল ও সাধারণ

সম্পাদক পদে আবদুল্লাহ আল মামুন নিলয় নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা যথাক্রমে বাংলানিউজ২৪ডটকম ও ইত্তেফাকের প্রতিনিধি।

১১ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক বশির আহমেদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন।

কার্যকরী পরিষদে সহ-সভাপতি দি ইনডিপেনডেন্ট প্রতিনিধি প্লাবন তারিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে দ্য ডেইলি স্টারের আসাদুজ্জামান আসাদ, কোষাধ্যক্ষ পদে প্রথম প্রহর প্রতিনিধি তৌকির রহমান, দপ্তর ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে দৈনিক আমাদের সময় প্রতিনিধি এসএম আলমগীর মিজান নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে প্রাইম নিউজের সুমি আক্তার, দৈনিক মানবজমিনের রাহুল এম ইউসুফ ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের শরিফুল ইসলাম সীমান্ত নির্বাচিত হয়েছেন।

সূত্র: ১২ জানুয়ারি ২০১৮, সমকাল

৯০তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ড

নকল ছবি, নকল ছবি বলে চারদিকে আওয়াজ উঠেছিল। একবার শোনা গেল ছবিটি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত পল জিনডেলের লেখা নাটক 'লেট দ্য হেয়ার ইউ হুইসপার'-এর গল্প চুরি করে তৈরি। আবার অভিযোগ ওঠে এটা নাকি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি 'দ্য স্পেস বিটুইন আস'-এর নকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবী আর জলদানবের প্রেম সব অভিযোগ-অপবাদকে ছাপিয়ে গেল। দ্য শেপ অব ওয়াটার ছবিটি জিতে নিল অস্কার। এ বছর সর্বোচ্চ চারটি অস্কার গেছে এই ছবির ঘরে।

৫ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে শুরু হয় ৯০তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। এতে সেরা ছবি, সেরা নির্মাতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোয় জয়ী হয়েছে দ্য শেপ অব ওয়াটার। এ অদ্ভুত প্রেমকাহিনীকে কঠিন টক্কর দিয়েছে ক্রিস্টোফার নোলানের ডানকার্ড ছবিটি। এ ছবি জিতেছে তিনটি অস্কার। তবে তিনটিই সম্পাদনা, শব্দমিশ্রণ ও শব্দ সম্পাদনার মতো কারিগরি বিভাগে।

বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত ছবি থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং, মিসৌরি দুটি অস্কার জিতেছে। বোদ্ধামহলে এখন এ নিয়ে আক্ষেপের শেষ নেই। ধারণা করা হচ্ছিল, বিচারপতিহীনতার সমাজে সন্তানহারা একক মায়ের অভিনব প্রতিবাদ কৌশল নিয়ে তৈরি এ ছবিটি আরো অস্কার এ বছর ঘরে তুলবে। কিন্তু তা আদতে হয়নি। সাতটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে এ ছবির ঘরে গেছে সেরা অভিনেত্রী (ফ্রান্সেস ম্যাকডরম্যান্ড) ও পার্শ্বচরিত্রে সেরা অভিনেতার (স্যাম রকওয়েল) পুরস্কার দুটি।

তবে দুটি অস্কার জিতেও অনেক তুষ্ট থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং, মিসৌরির শিল্পী ও কুশলীরা। কারণ তাদের অবস্থাটা অন্তত মাডবাউন্ড, লেডি বার্ড কিংবা দ্য পোস্টের মতো হয়নি। এ তিনটি ছবি অস্কারে কোনো আলোই ছড়াতে পারেনি। অনেক আলোচনা থাকলেও ছবিগুলো একটি অস্কারও জেতেনি।

ব্রেড রানার ২০৪৯, কোকো ও ডার্কেস্ট আওয়ারও থ্রি বিলবোর্ডর এবিং, মিসৌরির মতো দুটি করে অস্কার জিতেছে।

সেরা পরিচালক বিভাগে দ্য শেপ অব ওয়াটার ছবির জন্য অস্কার জিতেছেন গিয়েরমো দেল তোরো। মেক্সিকান এই নির্মাতা ও তার সৃষ্টির জয়জয়কার হওয়ায় মেক্সিকোতে উল্লাস চলে। অন্যদিকে ব্রিটেনবাসীও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্রিটিশ অভিনেতা গ্যারি ওল্ডম্যানকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। সেরা অভিনেতার অস্কার জিতেছেন গ্যারি ডার্কেস্ট আওয়ার ছবিতে উইনস্টন চার্চিলের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য।

গেট আউট ছবিটি মাত্র একটি অস্কার জিতেছে। তবে সেটা দিয়েই ইতিহাস গড়েছে ছবিটি। এর পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার জর্ডান পিলে সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য বিভাগে পেয়েছেন অস্কার। এর মধ্য দিয়ে তিনি এই মৌলিক চিত্রনাট্য বিভাগে জয়ী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যকারের রেকর্ডটি গড়েছেন।

বছরের অন্যান্য পুরস্কার অনুষ্ঠানের পাঁচ থেকে বেরিয়ে এসেছে অস্কার। এ বছরের গোল্ডেন গ্লোব, বাফটা কিংবা হ্যামিতে যেমন বিজয়ীদের চেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিল পোশাক-প্রতিবাদ-পিন, অস্কার সেই ধারাকে বদলেছে। প্রতিবারের মতো বিজয়ীরাই ছিল এ আসরের মূল আকর্ষণ: রঙিন পোশাক পরা তারকারা যৌন হয়রানি, নারী-পুরুষের ক্ষমতায়ন, বর্ণবৈষম্য আর যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র আইন কঠোর করা নিয়েও কথা বলেছেন ঠিকই, তবে তা অস্কারের আমেজকে ভিন্ন পথে যেতে দেয়নি। পরিমিত প্রতিবাদের পাশাপাশি বিজয়ের উল্লাস চলেছে সমানতালে।

বিজয়ীদের তালিকা

১. সেরা ছবি: দ্য শেপ অব ওয়াটার
২. সেরা পরিচালক: গিয়েরমো দেল তোরো
৩. সেরা অভিনেতা: গ্যারি ওল্ডম্যান (ডার্কেস্ট আওয়ার)
৪. সেরা অভিনেত্রী: ফ্রান্সিস ম্যাকডোম্যান্ড (থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং, মিসৌরি)
৫. সেরা পার্শ্ব-অভিনেতা: স্যাম রকওয়েল (থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং, মিসৌরি)
৬. সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: অ্যালিসন জ্যানি (আই, টনিয়া)
৭. সেরা চিত্রনাট্য: গেট আউট
৮. অ্যাডাপটেড স্ক্রিপ্টে: কল মি বাই ইয়োর নেম
৯. বিদেশি ভাষার সেরা ছবি: আ ফ্যান্টাস্টিক ওমেন
১০. সেরা অ্যানিমেটেড ছবি: কোকো
১১. ভিজুয়াল ইফেক্টস: ব্লেড রানার ২০৪৯
১২. সেরা ছবি সম্পাদনা: ডানকার্ক
১৩. সেরা অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম: ডিয়ার বাস্কেটবল
১৪. সেরা লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম:দ্য সাইলেন্ট চাইল্ড
১৫. সেরা ডকুমেন্টরি শর্ট: হেভেন ইজ অ্যা ট্রাফিক জ্যাম অন দ্য ৪০৫।
১৬. সেরা স্কোর: দ্য শেপ অব ওয়াটার
১৭. সেরা গান: রিমেম্বার মি (কোকো)
১৮. সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন: দ্য শেপ অব ওয়াটার
১৯. সেরা সিনেমাটোগ্রাফি: ব্লেড রানার ২০৪৯
২০. সেরা কস্টিউম ডিজাইন: প্যানটম থ্রেড
২১. সেরা মেকাপ অ্যান্ড হেয়ার স্টাইলিং: ডার্কেস্ট আওয়ার
২২. সেরা ডকুমেন্টরি ফিচার: ইকারাস
২৩. সেরা শব্দ সম্পাদনা: ডানকার্ক
২৪. সেরা সাউন্ড মিক্সিং: ডানকার্ক

সূত্র: ৬ মার্চ ২০১৮, প্রথম আলো

বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিলেন ব্রিটিশ নারী সাংবাদিক

বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিলেন ব্রিটেনের নারী সাংবাদিক বেকি হোর্সব্রাগ। ২৮ জানুয়ারি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপ থেকে সেন্টমার্টিন দ্বীপের মধ্যবর্তী ১৬ দশমিক ১ কিলোমিটার সাগর পাড়ি দেন। ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই চ্যানেল পাড়ি দিলেন।

সকাল ৯টা ২০ মিনিটে প্রথম এভারেস্টজয়ী বাংলাদেশি মুসা ইব্রাহীমের নেতৃত্বে টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে সাঁতার শুরু করেন হোর্সব্রাগ। তিনজনের দলে আরো ছিলেন ওয়াসিউর রহমান। তবে কিছুদূর সাঁতরে মাছের আঘাতে মাঝপথে সাঁতার বন্ধ করে দেন মুসা ও ওয়াসিউর। মুসা ইব্রাহীম সমকালকে জানান, এক ঘণ্টা সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হঠাৎ করে পায়ে মাছের আঘাতে আহত হন। তাই সাঁতার শেষ করতে পারেননি। চার ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সাঁতরে বেকি হোর্সব্রাগ সেন্টমার্টিন উপকূলে গিয়ে পৌঁছান।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি সুইমিং ইনস্ট্রাক্টর হিসেবেও কাজ করেন বেকি হোর্সব্রাগ। মার্কিন বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে (এপি) সাংবাদিকতা করছেন তিনি। বেসরকারি সংস্থা 'সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ'-এর জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য তিনি সাঁতরে বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন। সেন্টমার্টিন পৌঁছে প্রতিক্রিয়ায় বেকি হোর্সব্রাগ বলেন, বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিয়ে খুবই খুশি লাগছে। *সূত্র: ২৯ জানুয়ারি ২০১৮, সমকাল*

বেতনবৈষম্যের প্রতিবাদে বিবিসি'র নারী সাংবাদিকের পদত্যাগ

বেতনবৈষম্যের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন বিবিসি চীনের সম্পাদক ক্যারি গ্রাসিয়া। পদত্যাগের পর তিনি মন্তব্য করেন, 'বেআইনি বেতনবৈষম্যের' সঙ্গে তিনি 'আপস' করতে পারেননি বলে পদত্যাগ করেছেন।

৩০ বছর ধরে বিবিসিতে কর্মরত ক্যারি। ৮ই জানুয়ারি ক্যারি বলেন, বিবিসির আন্তর্জাতিক সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত পুরুষ সম্পাদকদের তুলনায় তিনি বছরে ১ লাখ ৩৫ হাজার পাউন্ড (দেড় কোটি টাকা) কম বেতন পান।

সূত্র: ১১ জানুয়ারি ২০১৮, প্রথম আলো

১৯ বছর পর জেল থেকে মুক্তি পেলেন উজবেক সাংবাদিক

বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর উজবেকিস্তানে এক সাংবাদিক মুক্তি পেয়েছেন বলে ২রা মার্চ জানা গেছে। ১৯ বছর ধরে কারারুদ্ধ ওই সাংবাদিকের নাম ইউসুফ রুজিমুরাদভ। তিনি রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ১৯৯৯ সালে কারাবন্দি হয়েছিলেন। ২০১৪ সালে তাঁর মুক্তির কথা থাকলেও সাজা বাড়ানো হয়।

দেশটির রাজধানী তাসখন্দভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ইজগুলিক জানিয়েছে, ইউসুফ ২২ ফেব্রুয়ারি তাসখন্দের অদূরে চিরচিক শহরের জেল থেকে মুক্ত পেয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার যে অভিযোগ আনা হয়, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বরাবরই দাবি করে এসেছেন রুজিমুরাদভ।

সাংবাদিকদের সুরক্ষাবিষয়ক সংগঠন দ্য কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) টুইট বার্তায় বলেছে, ইউসুফের কারাবরণের সময়কাল বিশ্বের অন্য যে কোনো সাংবাদিকের কারাবাসের সময়কে অতিক্রম করেছে। আরেকটি সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসও একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে।

দেশটির আরেক বিশিষ্ট সাংবাদিক মুহাম্মদ বেকজানভ ১৮ বছর জেল খেটে গত বছর মুক্তি পান। তাঁরা দুজনই দেশটির বিরোধী দ্য আর্ক ডেমোক্রেটিক পার্টির পত্রিকা 'আর্ক'-এ কাজ করতেন, যেটি নিষিদ্ধ করেছে সরকার। এই দুজনকে ১৯৯৯ সালে উজবেকিস্তানে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এর আগে তাঁদের ইউক্রেনে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সময় ক্ষমতায় ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইসলাম কারিমভ। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে তিনি উজবেকিস্তানে ২৭ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ২০১৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ডজনখানেক সাংবাদিক মুক্ত হয়েছেন। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গঠিত এ রাষ্ট্রটি কারিমভের আমলে চরম দমনপীড়ন চালায়। দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট শাভখত মিরজিওয়েভ সাবেক প্রেসিডেন্ট কারিমভের কঠোর নীতি থেকে সরে এসেছেন। এর আগে ১৩ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাভখত।

সূত্র: ৪ মার্চ ২০১৮, কালের কণ্ঠ

তুরস্কে ৬ সাংবাদিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

তুরস্কে ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছয় সাংবাদিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা তুরস্কের ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লাহ গুলেনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হন। তবে তাঁরা সবাই এ অভিযোগ অস্বীকার করেন।

কারাদণ্ড পাওয়া ছয় সাংবাদিক হলেন– নাজলি ইলচাক, আহমেত আলতান, মেহমেত আলতান, ফেভজি ইয়াজিকি, ইয়াকুপ সিমসেক ও সুকরু তুগরুল ওজসেনগুল। কুরস্কের জনপ্রিয় সাংবাদিক এবং লেখক আলতান ভাইদের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ১৫ জুলাই অভ্যুত্থান চেষ্টার আগের দিন সন্ধ্যায় টেলিভিশনে একটি টকশোয় সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের বিষয়ে 'কোড মেসেজ' দেওয়ার অভিযোগ করা হয়। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পরপরই তাদের আটক করা হয়। এর আগে তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালত গত মাসে মেহমেত আলতানকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদালত সে সময় বলেছিলেন, তাকে আটক রাখার মধ্য দিয়ে দেশের সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে।

জাতিসংঘ, ওএসসিই এবং কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন এ রায়ের তীব্র সমালোচনা করে। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই) এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে তুর্কি সরকার এই ছয়জনসহ ৭৩ সাংবাদিককে আটক করেছে।

সূত্র: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, সমকাল

মেক্সিকোতে সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

মেক্সিকোর গোলযোগপূর্ণ ভেরাক্রুজ রাজ্যে ২১ মার্চ এক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের একটি রক্ষা কমিটি এ কথা জানিয়েছে। রাজ্যটিতে প্রায়ই মাদক সংক্রান্ত সহিংসতা ঘটে।

সাংবাদিকদের সহায়তা ও রক্ষাকারী সংস্থা স্টেট কমিশন জানায়, লিওবার্ডো ভ্যাজকুয়েজ আতজিন নামের ওই সাংবাদিককে পূর্বাঞ্চলীয় ভেরাক্রুজ রাজ্যে তাঁর বাড়ির বাইরে গুলি করে হত্যা করা হয়।

কমিটির সভাপতি অ্যানা লরা পেরেজ বলেন, ভ্যাজকুয়েজ আতজিনকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার কোনো খবর তাঁরা পাননি।

আতজিনের সহকর্মীরা জানান, অপরাধীরা প্রায়ই তাকে হুমকি দিত। আতজিন গত বছরের শেষ পর্যন্ত পোজারিকা শহরে ওপিনিয়ন পত্রিকায় কাজ করতেন।

সূত্র: ২৩ মার্চ ২০১৮, সমকাল

লক্ষ্মীপুরে হামলায় আহত সাংবাদিক মারা গেছেন

লক্ষ্মীপুরে জমি নিয়ে বিরোধে হামলায় আহত সাংবাদিক শাহ মনির পলাশ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। সদর উপজেলার পার্বতীনগর ইউনিয়নে মাছিমনগরে হামলার শিকার হন পলাশ। পলাশ মাছিমনগরের আবদুল মন্নানের ছেলে। তিনি দৈনিক রূপবাণী পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এবং লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের স্নাতক ফলপ্রার্থী ছিলেন। এ ঘটনায় এলাকাবাসী খুনিদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। স্থানীয় সাংবাদিকরাও একই দাবি জানিয়েছেন।

নিহত পলাশের বাবা আবদুল মন্নান ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৪ ফেব্রুয়ারি মাছিমনগর এলাকায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আখতারুজ্জামানের দুই ছেলে ইউছুপ ও আবু ছাইদ আবদুল মন্নানকে মারধর করে। এ সময় বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে হামলার শিকার হন পলাশ। তাঁকে কাঠ দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে মাথা ও বুক থেঁতলে দেওয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তির পর অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সূত্র: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, সমকাল

মর্গে ছবি তুলে বেরিয়েই ফটো-সাংবাদিকের মৃত্যু

যশোর সদর ও ঝিকরগাছা উপজেলা থেকে গুলিবিদ্ধ চারজনের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। নিহত ব্যক্তিদের ডাকাত বলে পুলিশ দাবি করে। এ চারজনের লাশ ও আত্মহত্যা করা এক গৃহবধূর লাশের ছবি তুলে মর্গ থেকে বেরিয়েই মারা যান স্থানীয় দৈনিকের এক ফটো-সাংবাদিক।

গুলিবিদ্ধ ওই চার লাশ ও আত্মহত্যা করা গৃহবধূর লাশের ছবি তুলতে হাসপাতাল মর্গে গিয়েছিলেন যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক সমাজের কাগজের ফটো-সাংবাদিক রবিউল ইসলাম মিঠু (৫০)। ছবি তুলে মর্গ থেকে বেরিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি, পরে ২০ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। মর্গ থেকে মৃতদেহের ছবি তুলে বাইরে বেরিয়েই পড়ে যান মিঠু। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। রবিউল ইসলাম মিঠু যশোর শহরের ঘোপ সেন্ট্রাল রোড বাইলেনের বাসিন্দা। তাঁর বাবা মৃত ইব্রাহিম মোল্লা।

সূত্র: ২১ জানুয়ারি ২০১৮, কালের কণ্ঠ

শোক সংবাদ

শেখ রকিব উদ্দিন

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও ইউএনবির সাবেক বিশেষ সংবাদদাতা শেখ রকিব উদ্দিন (৮৫) আর নেই। ৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টারে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

জাতীয় প্রেস ক্লাব ও এলিফ্যান্ট রোড কোয়ার্টার মসজিদে জানাজার পর তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। শেখ রকিব উদ্দিন সর্বশেষ ইংরেজি দৈনিক ডেইলি ইনডিপেনডেন্টে কর্মরত ছিলেন। অধুনালুপ্ত দৈনিক আজাদের চিফ রিপোর্টার ছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

সিরাজ হায়দার

মঞ্চ, টিভি, চলচ্চিত্রাভিনেতা ও পরিচালক সিরাজ হায়দার (৭১) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ১১ জানুয়ারি রাজধানীর কল্যাণপুরে নিজ বাসায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন ছেলে লেলিন হায়দার।

সিরাজ হায়দারদের গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের মিরকাদিমে। সেখানকার পারিবারিক কবরস্থানে জানাজা শেষে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। সিরাজ হায়দারের দীর্ঘদিনের কর্মস্থল এফডিসিতে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬২ সালে 'টিপু সুলতান' নাটকের মাধ্যমে সিরাজ হায়দারের অভিনয় শুরু। অভিনয় ছাড়াও মাত্র ১৯ বছর বয়সে মঞ্চনাটক নির্দেশনা দেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের পর পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুনের 'জল্লাদের দরবার' ছবিতে সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র 'সুখের সংসার'। নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত এ চলচ্চিত্রে খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। ৫৫ বছরের অভিনয় জীবনে তিনি তিন শতাধিক চলচ্চিত্র ও অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেন। এছাড়া 'আদম ব্যাপারী' ও 'সুখ' নামে দুটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন তিনি। সিরাজ হায়দারের স্ত্রী মিনা হায়দারও একজন অভিনেত্রী। তাঁদের ছেলে লেনিন হায়দার একজন নাট্যনির্মাতা।

হাসানুজ্জামান খান

প্রবীণ সাংবাদিক হাসানুজ্জামান খান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ৭ জানুয়ারি রাজধানীর মিরপুরে সাংবাদিক কলোনির নিজ বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

হাসানুজ্জামান খান সর্বশেষ ডেইলি ইনডিপেনডেন্টের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে মিরপুরের কালশী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ইংরেজি দৈনিক নিউ নেশনের যাত্রালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক পদেও ছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর পাকিস্তান আমলে দ্য পিপলস পত্রিকা দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন হাসানুজ্জামান। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি দ্য মর্নিং সান, বাংলাদেশ টাইমসসহ বিভিন্ন ইংরেজি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করেছেন।

আনিসুজ্জামান নান্নু

প্রবীণ সাংবাদিক আনিসুজ্জামান নান্নু ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। আনিসুজ্জামান নান্নু দীর্ঘ চার দশকে দৈনিক বার্তা, দৈনিক জনতা, দৈনিক খবর, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক আমার দেশসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সিনিয়র সাব-এডিটর ও শিফট ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেছেন। সিদ্ধেশ্বরী জামে মসজিদে জানাজার পর তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আমান উল্লাহ খান

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আঞ্চলিক পত্রিকা দৈনিক বাংলাদেশের সম্পাদক, আমান উল্লাহ খান ১৫ই মার্চ বগুড়ায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ১৬ মার্চ জয়লা জুয়ান ডিগ্রি কলেজ মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

আমান উল্লাহ খান ১৯৪১ সালে শেরপুর উপজেলার জয়লা জুয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি বগুড়া থেকে দেশের প্রথম আঞ্চলিক দৈনিক বাংলাদেশ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বগুড়া-৫ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। এছাড়া ১৯৬৯-১৯৭৪ পর্যন্ত বগুড়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন তিনি।

রহমান জাহাঙ্গীর

ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের এডিটোরিয়াল কনসালটেন্ট ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য রহমান জাহাঙ্গীর (৬৯) ২৬ মার্চ রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

রহমান জাহাঙ্গীর অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ অবজারভারের সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরে তিনি ইনডিপেনডেন্ট, ডেইলি স্টার, নিউজ টুডেসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে এবং কলাবাগানের লেক সার্কাসে তেঁতুলতলা জামে মসজিদে রহমান জাহাঙ্গীরের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ মার্চ তৃতীয় জানাজা শেষে তাঁকে চাঁদপুরের মতলবে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

কালাম বিশ্বাস

মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিক মো. আবুল কালাম বিশ্বাস (৪৩) ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাব চত্বরে তাঁর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সাংবাদিকরা। সেখানে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব শহরের বেউথা কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

জুটন চৌধুরী

জাতীয় প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সদস্য জুটন চৌধুরী (৪৮) ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নিজ বাসায় পরলোকগমন করেন।

জুট চৌধুরীর মরদেহ প্রথমে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এফডিসিতে) নেওয়া হয়। সেখানে চলচ্চিত্র সাংবাদিক এবং শিল্পী ও কলাকুশলীরা তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানানোর জন্য জাতীয় প্রেস ক্লাবে কিছুক্ষণ রাখার পর মরদেহ রায়েরবাগ শ্মশানে নিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

পেশাদার সাংবাদিকরা চাকরি নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট শীর্ষক গবেষণাকর্মের ফলাফল উপস্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরীসহ অন্যান্য অতিথি

‘পেশাদার সাংবাদিকরা চাকরি নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট’ শীর্ষক গবেষণাকর্মের ফল নিয়ে আলোচনা

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত ‘পেশাদার সাংবাদিকরা চাকরি নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট’ শীর্ষক গবেষণাকর্মের ফল নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান ৪ জানুয়ারি ২০১৮ পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী। পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং একই বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত। স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। গবেষণাটি সম্পাদন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল আলম চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুদ্দুস আফ্রাদ, নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুল আরা হক নিলু, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব ওমর ফারুক, আমাদের অর্থনীতি’র সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান, পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য অমিয় ঘটক পুলক প্রমুখ।

গবেষণা মাধ্যমটিতে বলা হয়, ৩১ দশমিক ৪৪ ভাগ সাংবাদিক মনে করেন, তাঁরা যে বেতন পাচ্ছেন, তা দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন। ২৯ দশমিক ৬৪ ভাগ সাংবাদিক মনে করেন, তাঁরা যোগ্যতার তুলনায় বেতন কম পাচ্ছেন। এতে আরও বলা হয়, ৩৬ ভাগ সাংবাদিক মনে করেন, তাঁদের অফিসের কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক। ২৬ ভাগ মনে করেন, অফিসে উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান। বাংলা সংবাদপত্র এবং সংস্থার কোনো সাংবাদিকই মনে করেন না যে, তাঁদের অফিসে পরিবেশ অনুপযোগী। অফিসের পরিবেশ নিয়ে অসন্তুষ্টি শুধু টেলিভিশন সাংবাদিকদের মধ্যে বিদ্যমান। ৬৫ ভাগ সাংবাদিক মনে করেন, অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সুনির্দিষ্ট কর্মচাপ স্পষ্ট। অর্ধেকেরও বেশি সাংবাদিক মনে করেন, তাঁরা পরিবারকে যে সময় দেন, তা অপর্যাপ্ত।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইকবাল সোবহান চৌধুরী ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিক ইউনিয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নীতি-নৈতিকতাবিবর্জিত সাংবাদিকতা গণতন্ত্রের বিকাশে অন্তরায়।

সভাপতির বক্তব্যে সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার বলেন, গণমাধ্যমের ওপর নানা ধরনের ভয়ভীতি থাকে। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা কখনো মাথা নত করেননি। গণমাধ্যমে সত্য কথা লিখতে হবে। সত্যই প্রথম, সত্যই শেষ। তিনি নবীন সাংবাদিকদের কর্মস্পৃহার প্রশংসা করেন।

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা ও চাকরির সন্তুষ্টি নিয়ে গবেষণাটি চমৎকার। তাদের সত্যের অন্বেষণ করতে হবে। সত্যের সৈনিক হিসেবে কাজ করবেন তাঁরা। তিনি দুঃখ করে বলেন, অনেক পত্রিকা মফস্বলের সাংবাদিকদের একটি কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বলে, বিজ্ঞাপন আনেন। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। সাংবাদিকতায় সবকিছু ছাপিয়ে নিরাপত্তার অভাবটাই বড়ো। চাকরির নিরাপত্তা ও জীবনের নিরাপত্তা। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে সরকার, সাংবাদিক মহল সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমাদের অর্থনীতি সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, সাংবাদিকতা পেশা অন্য আর ১০টি পেশার মতো নয়। এটি পেশা এবং নেশা। তিনি বলেন, এ পেশার মানোন্নয়ন ও সাংবাদিকের জীবনমানের উন্নয়ন একই সঙ্গে প্রয়োজন। দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক আবদুল কাইয়ুম বলেন, গণমাধ্যমে সঠিক ও সত্য সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। এতে সেই গণমাধ্যম বিশ্বাসযোগ্যতা ও পাঠকপ্রিয়তা পাবে। আর বস্তুনিষ্ঠতা ও পাঠকপ্রিয়তা পেলে সেই গণমাধ্যম অবশ্যই শিল্প হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সেখানে সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে কখনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

বরিশালে ১৩-১৫ জানুয়ারি অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

বরিশালে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত বরিশালের সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১৩-১৫ জানুয়ারি ২০১৮) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বরিশাল জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্য ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত মোট ৩৫ সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। সমাপন অনুষ্ঠানে বরিশালের এডিসি জেনারেল আবুল কালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

পিআইবিতে তৃণমূল সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) তৃণমূল সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য স্বপন সাহা। এবং সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে আগত প্রিন্ট মিডিয়ার ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকাস্থ শরীয়তপুর সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত ঢাকাস্থ শরীয়তপুর সাংবাদিক সমিতির সদস্য সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পিআইবিতে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শরীয়তপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক এমপি।

পিআইবি পরিচালক (প্রশাসন) মো. ইলিয়াস ভূঁইয়া অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশিক্ষণে ঢাকাস্থ শরীয়তপুর সাংবাদিক সমিতির ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পিআইবিতে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ী। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির ২৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মোংলায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

মোংলা প্রেস ক্লাবে পিআইবির আয়োজনে সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১২-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। মোংলা প্রেস ক্লাবে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) আনোয়ারা বেগম। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত ঢাকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক বর্তমানের উপদেষ্টা সম্পাদক ও পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য স্বপন সাহা। পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি ফারজানা রূপা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম। প্রশিক্ষণে ঢাকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ী

পিআইবি ও এমআরডির যৌথ উদ্যোগে সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠান শেষে ফটোসেশন

পিরোজপুরে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ

পিরোজপুর জেলায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের তিন দিনব্যাপী (২-৪ মার্চ ২০১৮) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২রা মার্চ পিরোজপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহম্মেদ। পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পিরোজপুর প্রেস ক্লাব সভাপতি শফিউল হক মিঠু, সাধারণ সম্পাদক ফসিউল ইসলাম বাচ্চু। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের পিরোজপুর উপপরিচালক (ডিডিএলজি) কাজী তোফায়েল হোসেন, জেলা তথ্য অফিসার মো. মহসীন হোসেন তালুকদার, পিরোজপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক গৌতম চৌধুরী প্রমুখ। প্রশিক্ষণে পিরোজপুরে কর্মরত বিভিন্ন টেলিভিশনসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

তালায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত সাতক্ষীরার তালা উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১২-১৪ মার্চ ২০১৮) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উত্তরণের মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোস্তফা লুতফুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম। প্রশিক্ষণে ৩৫ সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) ও বেসরকারি সংস্থা (এমআরডিআই)-এর যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (১৯-২১ মার্চ ২০১৮) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ মার্চ পিআইবিতে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন পিআইবির চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

সম্ভাব্য সাংবাদিকদের শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ

পিআইবিতে সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য দুই দিনব্যাপী (১৭-১৮ মার্চ ২০১৮) শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৮ মার্চ পিআইবি মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহম্মেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাসস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবুয়াল হোসেন। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

নেত্রকোনায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

নেত্রকোনা জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৮-৩০ মার্চ ২০১৮) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। নেত্রকোনা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক মঈনউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামলেন্দু পাল। প্রশিক্ষণে নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩৫ সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য শিশু ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট বিতরণ